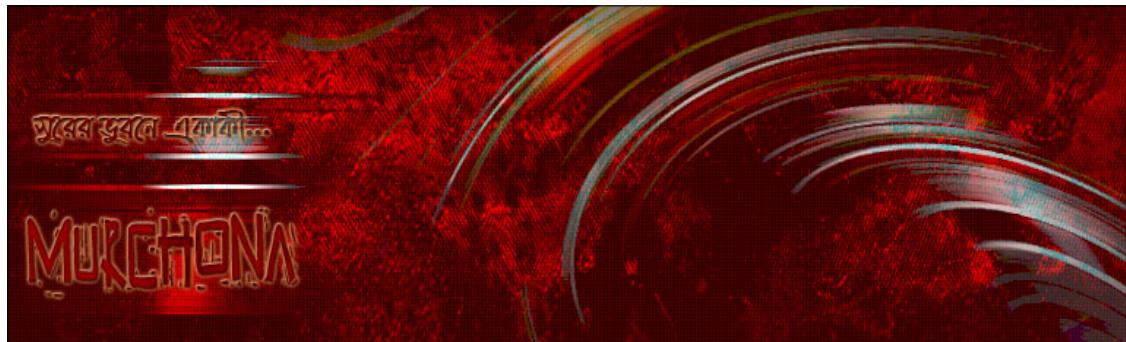


# Robinson Crusoe by Danial Difo



For More Books & Music Visit [www.MurchOna.com](http://www.MurchOna.com)

MurchOna Forum : <http://www.murchona.com/forum>

Suman\_ahm@yahoo.com

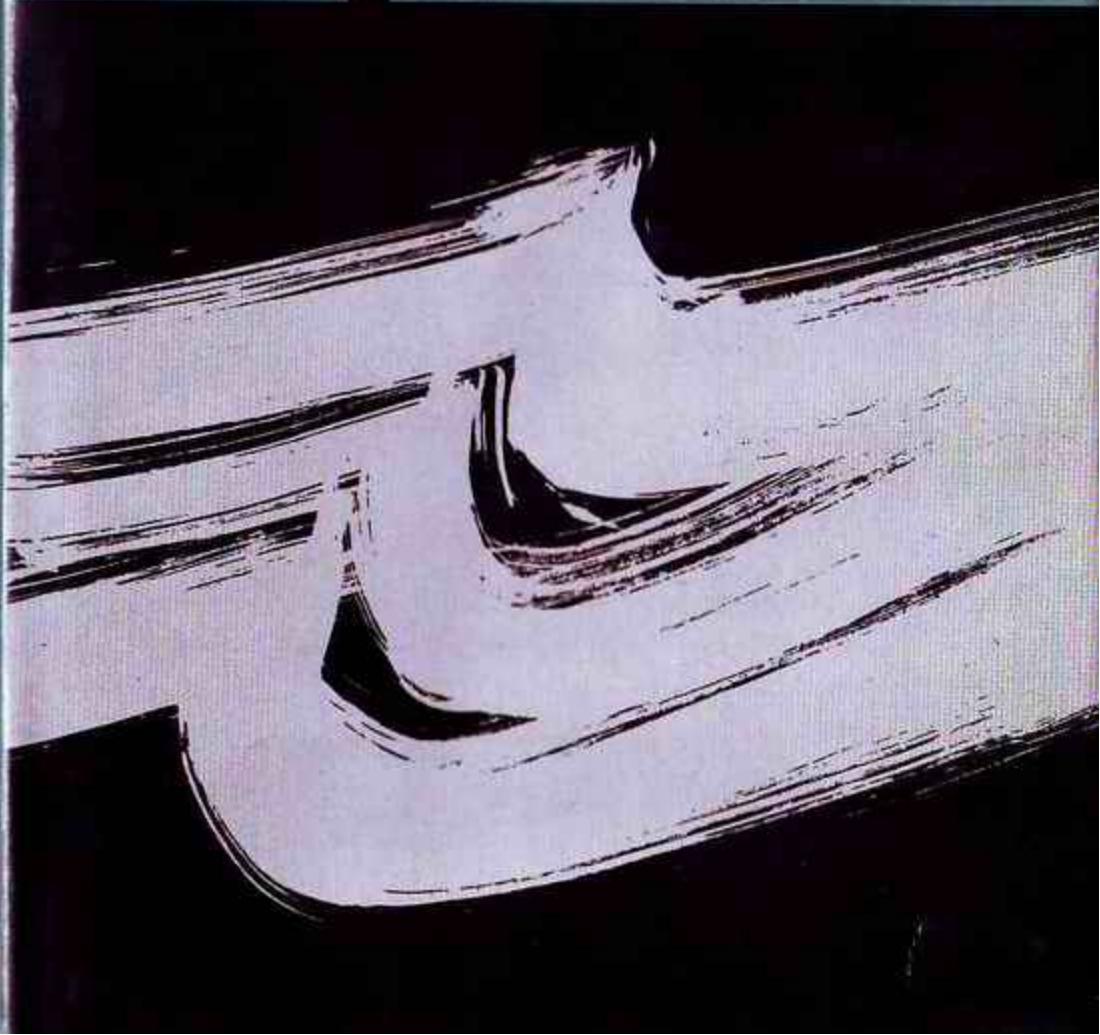
suman\_ahm@walla.com

s4suman@yahoo.com

কিশোর ক্লাসিক

# রবিনসন ক্রুসো

ড্যানিয়েল ডিফো



একটি দীপ, একজন মানুষ আর একরাশ  
গাছপালা পশ্চায়ী, চারধারে শব্দ জল  
আর জল। ভাগ্যাহত সেই মানুষটির নাম  
রবিনসন ত্রুসো। কথা বলার কোন মানুষ  
নেই, নেই কোন সঙ্গী কি সাথী। শব্দ  
কাকাতুয়া একটি, তার নাম পোল, সে  
ঘোরে ফেরে আর ডেকে বেড়ায়—রবিন  
ত্রুসো, রবিন ত্রুসো, তুমি কোথায়,  
কোথায় . . . ।

আঠাশ বছর এই বিজন দীপে বলতে  
গেলে একাকী কাটে মানুষটির। শেষের  
ক'বছর ফ্রাইডেকে পায় সাথী হিসেবে।  
সে চমকদার ঘটনা। নরখাদক বর্বরদের  
হাত থেকে তাকে রক্ষা করার আশ্র্য  
লোমহর্ষক সেই কাহিনী। আরো আশ্র্য,  
দীপ থেকে সভ্যজগতে ফিরে আসার  
ঘটনা। তারপর নতুন আরেক ঘাত্তা।  
অরণ্য। নেকড়ে। হাজার হাজার। ভয়াল  
ভয়ার্ত তাদের ডাক। তাদের থেকে  
আত্মরক্ষা—পাতায় পাতায় বিশ্বয়ের  
চমক।

আর সেই দীপ! সেখানে গড়ে উঠেছে  
এখন নতুন জনপদ। তারও বিচির  
কাহিনী নিয়ে ড্যানিয়েল ডিফোর এই  
বিশ্বয়কর চিরন্তন ক্লাসিক।

১৬৩২ সালে ইয়ার্কের এক বনেদী পরিবারে আমার জন্ম। এর মানে কিন্তু এইনয় আমরা বরাবরকার ইয়ার্কেরই বাসিন্দা। আমার বাবা আগে থাকতেন বিটেন। সেখান থেকে হুল—এ এসে সাময়িক আস্তানা গড়েন। ব্যবসা করতেন তখন। তাঁর থেকেই বিস্তর জমিজমা, অটেল পয়সা। হঠাতে কী খেয়াল হল—সব ছেড়েছুড়ে চলে এলেন ইয়ার্কে। থিভু হলেন। বিয়ে করলেন।

রবিনসন আমার মায়ের বৎশের পদবী। আমার মামাদেরও খুব নামডাক। তাঁরা অবিশ্য গায়েই থাকেন। তো মায়ের পদবীর সঙ্গে আমাদেরটা মিলিয়ে আমার নাম রাখা হল রবিনসন ক্রুংজেনার। সে বড় খটোমটো উচ্চারণ। ভাঙতে ভাঙতে লোকের মথফেরতা হল গিয়ে ক্রুসো। মোটামুটি পছন্দসই। উচ্চারণেও সুবিধে। আমরা এখন ক্রুসোই লিখি। সবাই। বলিও ক্রুসো। আমার বন্ধুরা আমাকে ঐ নামেই ডাকে।

আমার ওপরে দুই দাদা। তাদের মধ্যে একজন ফ্রান্ডার্স ইংরেজ পদাতিক বাহিনীর কর্নেল। সেনাপতি তখন সেই বিখ্যাত লকহার্ট। স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে ডানকার্কের কাছে কোনো এক স্থানে সে মারা যায়। এ হল সবার বড়। মেজ ভাইয়ের খবর আমি কিছু রাখি না। জানি না বলাই ভালো। ঠিক যেমন আমার বাবা মা জানেন না আমার খবর।

অতএব আমি যে পরিবারের তিন নস্তর বৎশর, এটা বোধহয় সকলেই অনুমান করতে পারেন। আর বলব কি ছোটোবেলা থেকেই আমার মাথায় যাবতীয় উন্টেট চিন্তা। আমার বাবা প্রাচীনপন্থী মানুষ। আমাকে পড়াশোনা যতটা শেখানো সম্ভব শিখিয়েছেন। প্রথমাবস্থায় বাড়িতে, পরে স্থানীয় অবৈতনিক বিদ্যালয়ে। শেষ অব্দি আইন নিয়ে আমি পড়াশুনা করি। কিন্তু পড়ায় যোটে মন লাগে না আমার। সমুদ্র আমাকে টানে, ডাকে। যেতে ইচ্ছে করে সমুদ্রে। সারাক্ষণ ঘনের আনাচে কানাচে তোলপাড় করে বেড়ায় ভাবনা। শেষে অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌছল, বাবার বিরুদ্ধতা পর্যন্ত করতে বাধ্য হলাম। মাকত অনুরোধ উপরোধ করলেন। বন্ধুরা কত বোঝাল। আমি নাছোড়। নিয়তির অলঙ্গ্য নির্দেশে আমি যেন মরিয়া। যেন যে কোনো দুঃখ বরণ করতেও আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই।

বাবাও বিস্তর উপদেশ দিলেন। ভারি বিচক্ষণ আর ভারি গন্তীর মানুষ। একদিন সকালে আমাকে নিজের কামরায় ডেকে পাঠালেন। নড়াচড়া তো করতে পারেন না, বাত যে ভীষণ। তা সে নানান যুক্তিক দিয়ে বোঝানোর পালা। বললেন, কী এমন কারণ থাকতে পারে তোমার ঘর বাড়ি ছেড়ে পৈতৃক নিবাস ছেড়ে বাইরে বেড়াতে যাবার? নয় বেড়নো হলেও বুঝতাম, এ তো নিরুদ্দেশ যাত্রার সামল। বিদেশে কে তোমাকে চিনবে? কে তোমাকে রেয়াত করবে? বরং থাক এখানে, ব্যবসা কর, সুখী হও। এই তো সার্থক জীবন। বাইরে গিয়ে নাম করবে, ধনবান হবে—এ অলীক কল্পনা। এতে ঝুকির ভাগটাই বেশি। সচরাচর এমন কেউ করে না। আর সেটা তোমার সাধ্যেরও বাইরে। বরং তোমাকে বলি কেন, আমাদের সবার। মধ্যবিস্ত ছাপোষা মানুষের ঔসব হুজুগ পোষায়?

আসলে বিচার করে দেখেছি, বাবা তার মধ্যবিত্ত অবস্থান নিয়ে যৎপরোনাস্তি সুর্খী। এতে দুঃখদুর্দশার আধিক্য কম, আবার সুখ সঙ্গেগ আড়ম্বরের ভাগটাও এমন কিছু যথেষ্ট নয়। কারুর চোখ টটোবার দীর্ঘাবিত হবার কোনো ব্যাপার নেই। এই জীবনই বাবার পরম প্রিয়। বললেনও সে কথা আমাকে।—দেখ, এই ভাবে জীবন যাপনের যে কত সুখ, তুমি বুঝবে না এখন, আমি বুঝি। এই অবস্থানটা সবার কাছেই লোভনীয়। রাজ্ঞা বাদশাহাও মাঝে মাঝে কাঁদুনি গায়। বলে, কী যে ঝকমারি করেছিলাম রাজবংশে জন্মে! এর চেয়ে সাধারণ বংশে জন্মালেই ভালো হত। জ্ঞানী-গুণী মানুষেরাও বিস্তর প্রশংস্তি গেয়ে গেছেন মধ্যবিত্ত জীবন সম্পর্কে। তাছাড়া প্রার্থনার মধ্যে তো আছেই—হে প্রভু আমাকে দারিদ্র্য দিও না, তা বলে ধনীও আমি হতে চাই না।

আমাকে বলেছিলেন কথাগুলো খতিয়ে দেখতে, বিচার বিবেচনা করে বুঝতে। তা সত্যি কি, আমার চোখে ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। জীবনের যা কিছু ঝড় ঝাপটা ভালো—মন্দ সব ভোগ করে একদম উচু আর একদম নিচুতলার মানুষ। আমাদের মতো মধ্যবিত্তের গায়ে তার আঁচটুকুও লাগে না। আমাদের সব কিছুই বাপা। সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভালো মন্দ হাসি কান্না—ভোগ করতে হয় সব, কিন্তু, হিসেব করে। তবু পাই যে এটা তো ঠিক। তাকে আশীর্বাদই বলতে পারি। এই যে মধ্যবিত্ত জীবন লাভ করেছি আমরা, এটা আশীর্বাদ ছাড়া কী। তোফাই তো আছি। ছিমছাম মস্ণ নীরব নিভৃত জীবন। কোনো হৈ চৈ-এর ব্যাপার নেই। ঝামেলাও বিশেষ নেই। এমন নয়। যে খুব একটা পরিশ্রমের দরকার হয়। আবার এমনও নয় যে মগজটাকে বেশি খাটাতে হয়। তেমন বিস্তুল চৈতন্য ভাবও কখনো আসে না। বা যেটুকু আসে তাতে আত্মার শাস্তি মনের সুখ এসবের কোনো ব্যত্যয় হয় না। এমন নয় যে হিংসায় আমরা জলে পুড়ে উঠি, আবার কোনো কিছু পাব বলে ভেতরে ভেতরে যে একটা তীব্র দাহ, তা-ও কখনো বোধ হয় না। বেশ দুলকি চালে চলা যাকে বলে। এই ভাবেই মেটামুটি স্বচ্ছন্দ গতিতে জীবন অতিবাহিত করা। তিঙ্গুতার ভাগ অনেক কম। স্বাচ্ছন্দই তুলনামূলকভাবে বেশি। মন্দ কী! এই তো বেশ। অভিজ্ঞতার ভাগের একটু একটু করে পূর্ণ হয়। প্রতিদিনকার সংস্কার বাড়ে। এই তো আমাদের মধ্যবিত্ত জীবন।

সে যাই হোক, বাবা আমাকে ভীষণ পীড়াপীড়ি করলেন। ভী-ষ-ণ। তবে খুবই মোলায়েম ভাবে, তাতে আন্তরিকতার ভাগটাই বেশি। বললেন, আমি যেন আজকালকার উঠতি ছোকরাদের মতো আচরণ না করি, যেন নিজেকে অজানা ভবিষ্যতের হাতে ফেলে দিয়ে দুগতির ভাগীদার না হই। এই তো বেশ—এই মধ্যবিত্ত অবস্থান। কী দরকার একে হুট করে পালটে দেবার জন্যে দুঃসাহসে ভর করে ঝাপিয়ে পড়ার? তাছাড়া এমন তো নয়, কৃটি কুঁজির হঠাৎ খুবই দরকার হয়ে পড়েছে, তার জন্যে এই মুহূর্তে আমার কোনো কিছু না করলেই নয়। সে সব চিন্তা ভাবনা বাবারই, তা নিয়ে আমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। বরং এখানে থাকলেই বাবা আমাকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবেন। যদি সেই প্রতিষ্ঠায় আমি সুর্খী না হই, আমার মন না ওঠে, তবে ধরে নিতে হবে ভাগ্যটাই আমার মন। অথবা নিশ্চয়ই কোথাও কোনো কৃটি হয়েছে। সেটা তো জীবনেরই একটা নিয়ম বিশেষ। এর জন্যে আর অনুত্তাপ করে লাভ কী। তবে হাঁ, অনুত্তাপের যাতে কোনোকারণ না ঘটে সেটা তিনি জানপ্রাণ দিয়ে দেখবেন। তার জন্যে কাছে থাকাটা একান্ত দরকার। ভালোই হবে তাতে আমার। বাইরে গেলে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ—বাবা হয়ে কেমন করে যেতে অনুমতি তিনি দেন। সর্বশেষে আমার বড়

ভাইয়ের কথা বললেন। বড় ভাইকেও এই ভাবে বাবার নিষেধ করেছিলেন তিনি, অনিচ্ছিতের কোলে ঝাঁপ দিতে মানা করেছিলেন। বড় ভাই শোনে নি তাঁর কথা। জ্ঞার করে—একরকম সব কিছু অগ্রহ্য করেই গিয়ে ভিড়ল সৈন্যদলে। পরিণতি তো মত্তু। বাবার কথা অগ্রহ্য করলে ফল ভালো হয় না। বড় ভাইয়ের উদাহরণ যেন আমার কাছেও আদর্শ হয়। জ্ঞেনশুনে ভুল করলে ঈশ্বরের আশীর্বাদ মেলে না। সব অগ্রহ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়লে শেষ পস্তাতে হয়। তখন আর ফেরবার পথ থাকে না। এটাকে আমি যেন মনে রাখি, তুচ্ছ জ্ঞান করে উড়িয়ে না দিই।

সন্দুপদেশই বলা যায়। সাধুসন্তরা যে উপদেশ দেন অনেকটা সেই রকম। বড় ভাইয়ের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বাবার চোখে জমাটবাঁধা অঙ্গুও আমার নজরে পড়ল। ফৌটায় ফৌটায় গড়িয়ে পড়ছিল গাল রেঘে। আমাকে যখন বললেন পরে অনুশোচনা করতে হবে এবং তখন কেউ আসবে না আমাকে সাহায্য করতে—দেখি বাবা কাপছেন ধরথর করে, বুকটা যেন ভারী, যেন যে কোনো মুহূর্তে একটা বিপর্যয় ঘটে যেতে পাবে এবং ফলত বাবা আর কথা শেষ করতে পারলেন না।



তুমি বাবাকে বুঝিয়ে বল মাগো

বড় টাল খেলাম মনে, প্রচণ্ড একটা নাড়া। এটাই হয়ত স্বাভাবিক। মন থেকে ঝেড়ে ফেললাম বাইরে যাওয়ার সংকল্প। কী দরকার, এই তো বেশ! থাকি বাড়িতে বাবার চোখের গোড়ায়। বাবার কথা মতো জীবন যাপনের চেষ্টা করি। হায় রে হায়! সে আর কদিন। আবারও তো মনের মধ্যে ঘূরে ফিরে সেই তোলপাড়। মাত্র কয়েক সপ্তাহ পর থেকেই। ছটফট করে কেবল ভেতরটা। ভাবি কখন যাব বাইরে, কবে এই পরিবেশ ছেড়ে চম্পট দেব। তখন মাকে ফের বললাম। বুঝে শুনে। একদিন মা যুব হাসিখুশি, মেজাজ শরীফ, সেই দিন। বললাম দেখ মা, দুনিয়াকে দেখার ইচ্ছেটা এমনই প্রবল হয়ে চেপে বসেছে আমার মনে— আমি কিছুতে বাড়িতে মন বসাতে পারছি না। আমার মুহূর্তের জন্যেও মনে স্বন্তি নেই। ছটফট করে বেড়াই সারাক্ষণ। বাবাকে বল, যদি অনুমতি দেন তো ভালো, নইলে আমি পালাব। পালাবই। কেউ আমাকে কৃত্তে পারবে না। তুমি দেখে

নিষ্ঠে। তাছাড়া বাবা যে বলেছেন আমাকে থিতু হতে, কোনো কাজে ভিড়ে পড়তে চাই, কি কোনো উক্লিলের কেরানিগিরি করতে—সেটা এখন আর সন্তুষ্ট নয়। আঠার পেরিয়ে গেছি আমি! আগে হলে হত। এখন আর মন বসাতে পারব না। জ্ঞার করে ভিড়িয়ে দিলে সেবান থেকেও আমি পালাব। বরং বাবাকে বল, একবারের জন্যে অনুমতি দিন, মাত্র একবার, তারপর সম্মুদ্ধ্যাত্মা থেকে ফিরে আর আমি যেতে চাইব না। কোনোদিন না। তখন বাবা যা বলবেন আমি করব, সব মেনে নেব। তুমি একটু বুঝিয়ে বল মাগো।

মা বললেন, বলে কোনো লাভ নেই। কোনো কথা শুনবেন না। তাছাড়া তোরই বা আকেল কীরকম বল দেবি। এত উপদেশ দিলেন, এত কিছু বুঝালেন, তারপরও বলিস সম্মুদ্ধ্য যাবি? এতে আঘাত পাবেন মনে। তুই বুঝিস্ না? এই ভাবে অজানা অনিশ্চিতের উদ্দেশ্যে ঝাপিয়ে পড়ে যদি নিজের সর্বনাশ করতে চাস, কর তুই। আমার কিছু বলবার নেই। তবে একটা কথা জ্ঞেন রাখ। এতে তোর বাবার কি আমার—কারুরই মত নেই। থাকতে পারে না। ভাবিস্ নে, তোর বাবা যাতে আপন্তি করেছেন আমি তাতে হ্যাঁ বলব। আমাকে আর জোরাজুরি করিস্ না।

তবু শুনেছি, পরে মা বাবাকে সব নাকি বলেছিলেন। শুনে স্থির হয়ে বসেছিলেন বাবা খানিকক্ষণ। শেষে দীর্ঘস্থাস ছেড়ে বলেছিলেন, বাড়িতে থাকলেই ও সুখে থাকত। কোথায় যেতে কোথায় যাবে, দুঃখে কষ্টে তোলপাড় হবে—ছেলেমানুষ, বোঝে না কিছু। তুমি বলে দিও, আমার মত নেই।

এর ঠিক এক বছর পরে আমি বাড়ি থেকে পালালাম। এই এক বছরে বহু প্রস্তাব এসেছে আমার কাছে। ব্যবসায় যোগদানের প্রস্তাব, কোনো কাজে ভিড়ে পড়ার প্রস্তাব। আমি কানে তুলি নি। মা বাবা আরো অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। আমি শুনেও শুনি নি। শেষে হল—এ গিয়েছি একদিন, মাঝে মাঝেই আমি যেতাম বেড়াতে,—সত্য বলতে কি পালাবার ইচ্ছেও সেদিন ছিল না, হঠাৎ এক বন্ধুর সাথে দেখা। বলে, যাবি আমার সঙ্গে জাহাজে? আমাদের জাহাজ লড়ন যাবে। কী যে মনে হল আমার। বন্ধুর পেছন গিয়ে উঠে পড়লাম। ভাড়টাড়া তো লাগবে না। বন্ধুর আমি যে বন্ধু। মোলশ একান্ন সালের পয়লা সেপ্টেম্বর সেদিন। না হল বাপ-মার আশীর্বাদ নেওয়া, না হল ঈশ্বরের প্রার্থনা, এমনকি যে বাবা মাকে খবরটা জানাব সে সুযোগটুকুও হল না। ব্যবস্থা করে গেলাম। পরে জানতে পারবেন। জাহাজে আমি ভেসে পড়ারও অনেক পরে। খচখচ করছিল মন। না জানি এভাবে ভেসে পড়ার কত বিপদ, কত ভয়! পরমুহূর্তেই সামলে নিলাম। বিপদ আবার কীসের? আমি না জোয়ান মরদ! এসব নিয়ে মাথা ঘামায় তো বুড়োর দল! তো ছাড়ল জাহাজ। হাস্বার পেকুলাম। বলব কি, তারপর থেকেই শুরু হল বড়। আর ঢেউ। সে যে কী বিরাট, কী ভয়ঙ্কর! আমি তো এর আগে কখনো জাহাজে চাপি নি, ঢেউয়ের দুলুনিতে একটু পরেই শরীর খারাপ হল। খুব খারাপ। ভয় ভয়ও করছে। আর বুতুতুনি। কি জানি, এ যে কারুর মত না নিয়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদ না নিয়ে চড়ে বসলাম, এ হয়ত তারই প্রতিক্রিয়া। কত অপরাধই না জানি করেছি। বাবার চোখের জল, মার বারণ, অত উপদেশ পরামর্শ—সব অগ্রহ্য করলে কি বিপদ না হয়ে যায়! এ সেই বিপদ। বা বিপদের সূত্রপাত। জানি না ভবিষ্যতে আরো কত কী হবে। হয়ত অসীম দৃঢ়ব পাব।

ঝড় আরো বাড়ল। আর সমুদ্র—আগে তো আমি দেবি নি কোনোদিন—সে যা ঢেউ, যা উথাল-পাথাল। পরে অবিশ্যি এর চেয়ে আরো অনেক তোলপাড়নি দেবেছি, আরো উচু উচু ঢেউ। তখন আর আমার শরীর খারাপ হয় নি বা চমকও লাগে নি। কিন্তু সেবার সেই

যে প্রথম। কতটুকু জানি আমি সমুদ্র সম্বর্কে? ভয় তো লাগবেই। দূরস্ত সেই ভয়। এক একটা ঢেউ ওঠে আর ভাবি—এই বুঝি আসছে আমাদের শিলে খেতে। হয়ত এই বারই শেষ। জ্বাহাজ বারবার পড়ে ডেউয়ের মাথায় আছড়ে। মনে হয় এই হয়ত শেষবার, আর উঠব না কেউ কোনোদিন মাথা তুলে, তলিয়ে যাব সমুদ্রের গর্ভে। তখন কত দিব্যি কাটা, কত ঈশ্বরের নাম। বারবার বলি, হে ঈশ্বর এবারকার মতো আমাকে রক্ষা করো, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়ে দাও। আর কোনোদিন আসব না সমুদ্রে, চাই কি তোমাকে অনুরোধও করব না। আর ভাবি অনুত্তাপ হয় মনে। ছি ছি, বাবার উপদেশ অগ্রহ্য করেছি বলেই না আমার আজ এই হাল। আর কোনোদিন করব না একাজ। দিব্যি কাটছি। ঈশ্বরের নামে শপথ। কত বিচক্ষণ মানুষ আমার বাবা, দূরদৃষ্টি দিয়ে ঠিকই তো বুঝেছিলেন। এত বুঝাট কি আমাদের সহ্য হয়। এত হ্যাপা! সুখে স্বস্তিতে বাড়িতে কাটাব দিন, নাকি এসে পড়লাম এই ঝড়ের মধ্যে। দুর্ভোগের চরম। এ আমার পাপের ফল। এর জন্যে অনুত্তাপ করতে হবে। বাবার কাছে মার্জনা ভিক্ষা করতে হবে। নয়ত পাপ থেকে ত্রাপ নেই, শাস্তি নেই আমার।

অর্থাৎ যতক্ষণ ঝড় চলে, আমার মনের মধ্যেও এইসব ভাবনা পাক খেয়ে বেড়ায়। দূরের যেন ঘনিষ্ঠ নিবিড় সংযোগ। পরদিন অবিশ্য ঝড় আর নেই। সমুদ্র দর্পণের মতো শাস্তি। আমার ভাবনাও বলতে গেলে শাস্তি। তবু থম মারা একটা ভাব। যেন কিছুই ভালো লাগে না এরকম একটা মানসিকতা। একটু কাহিলও লাগছে। সে শুধু দিনমানে। সঙ্গে লাগতে বাতাস আর নেই। আমার কাহিল ভাবও নেই। বেশ লাগছে এখন। ক্রমে রাত গভীর হল। তারপর ফুটল ভোরের রোদ। সে যা মিটি! আর তেমনি ঝকঝকে সমুদ্র। যতদূর চোখ যায় শুধু জল আর জল। আর রোদ। আর ভুবনঙ্গোড়া আলো। অপূর্ব! যেন এমন ভাবে চোখ নিয়ে কোনোদিন আমি সমুদ্র দেবি নি।

রাতে ভালো সুম হয়েছে। মনে বেশ স্ফুরিত ভাব। তার উপর শাস্তি সমুদ্র। সময় কাটছে সুবেদী। এমন সময় বন্ধু এসে হাজির। আমার গলা জড়িয়ে ধরল। বলল, কীরে কাল তোর ভয় করছিল, তাই না? যখন হাওয়া উঠল? আর চারদিক তোলপাড়? বললাম, হাওয়া কী বলছিস, ঝড় বল। মারাত্মক ঝড়। বলল, তোর মুণ্ডু। একে বলে ঝড়? ঝড় তুই দেবিস নি। আমরা বিস্তর দেখেছি। তোর মাথা ঘুরে যাবে। অবিশ্য দোষ তোর নয়। এই প্রথম এলি সমুদ্রে। এখনো অনেক কিছু দেখাব বাকি। কী ঝকঝক করছে আজ চারধার দেখ। চল, ঘরে বসে না থেকে একটু হৈ হঞ্জা করি। আবহাওয়া ভালো থাকলে নাবিকেরা ঘরে বসে থাকে না।

তখন গেলাম শুর সাথে। দেখি একটা ঘরে বিস্তর নাবিক। খাওয়া দাওয়া হল। মদ খেলাম। নিজের ইচ্ছেয় নয়, দলে পড়ে। নেশা হল শুব। আমার অনুত্তাপ পরিতাপ বলতে এখন আর কিছু নেই। পুরানো কেনো কথা আর মাথায় নাড়া খায় না। এখন শুধু ভবিষ্যতের চিন্তা। অজ্ঞানা অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। তাই নিয়ে শুধু আশার পর আশার জাল বোনা। মোটমাটি সমুদ্র শাস্তি হবার সঙ্গে সঙ্গে আমিও সব দিক থেকে শাস্তি। এই সমুদ্র যে আমাকে গ্রাস করতে পারে ভুলেও এখন আর এ চিন্তা করতে পারছি না। সমুদ্র নিয়ে যত কিছু অতীতের ভাবনা আমার, মনের গোপন গহন আশা—সব একটু করে ফিরে আসছে। দিব্যি কেটেছি কত—সে সব আর মনে নেই। শপথের কথাও ভুলে গেছি। একদম ভুলে গেছি বললে অবিশ্য বেশি বলা হয়, আসলে সামান্যই মনে আছে। যৎসামান্য। তা-ও ক্ষপস্থায়ী। স্বপ্নে দেখা ছবির মতো। এই আসে। নতুন চিন্তার তাড়নায় এই আবার মুছে

যায়। তাছাড়া নতুন সঙ্গী জুটেছে বিস্তর। সব বিস্মরণ। সেদিনের সেই পান ভোজনের আসরে যোগদানের পর থেকে। তাদের পাঞ্চায় পড়ে নেশা যখন করি, তখন আর হঁশ থাকে না। যেন খেলা একটা। নতুন পরিবেশে পুরানো সব কিছুকে ভুলে যাবার উন্নাদ উন্দাম এক প্রচেষ্টা। তখন তো আর বুঝি নি এসব আগামী দিনের দুর্দশারই ইঙ্গিত। ঘনিয়ে আসছে বিপদ। সেটা যেহেতু আরো ভয়ঙ্কর আরো তীব্র, তাই প্রস্তুতি নেবার কাজ চলছে আমার ভেতরে ভেতরে। নিজের অজ্ঞানতেই আমি এইভাবে একটু একটু করে প্রস্তুত হচ্ছি।

ছদিনের দিন ইয়ারমাউথে পৌছে আমরা নোঙ্গর ফেললাম। সমুদ্র শান্ত। আবহাওয়া চমৎকার। শুধু বাতাস বইছে বিপরীত দিক থেকে এই যা অসুবিধে। জাহাজ নিয়ে এগোনো সমস্য। থাকতে হল একই ভাবে সাত আট দিন। শুয়ে বসে কাটানো যাকে বলে। আলস্যে গা এলিয়ে চুপচাপ বসে থাকা। ততদিন আরো জাহাজ এসে ডিড়েছে। বন্দর তো। নিউক্যাসল থেকে এসেছে অনেকগুলো। সবার একই হল। বাতাসের গতি না পালটালে কেউ আর রওনা দেবে না।

এদিকে আছি তো দিলখুশ। ভাবনা নেই চিন্তা নেই, ভয়ের তো লেশমাত্র নেই। কিন্তু সে আর কদিন। পাঁচ দিনের দিন থেকেই বাতাসের বেগ একটু একটু করে বাড়তে লাগল। তা বাড়ুক। আমাদের পরোয়া কীসের। প্রথম কথা রয়েছি বন্দরে, তার উপর নোঙ্গরও ভারী। মাটির সঙ্গে গাঁথা বলতে গেলে। কে সরাবে কে নড়াবে আমাদের ভিত থেকে? হায় হায়, সবই দেখি মিথ্যে। আট দিনের দিন থেকে সে যা বাতাস! যা তোড়! সকাল থেকেই এই হাল। মুহূর্তের মধ্যে জল ফুলে ফেঁপে এই এন্তোখানি উচু। ততক্ষণে পাল গোটানো শেষ। বাপটা আটকায় এমন আর কিছুই বলতে গেলে জাহাজের পাটাতনে নেই। নোঙ্গর নিয়েই যা ভয়। কাণ্ডেন বলল, বড় নোঙ্গর নামাও। তখন দুপুর। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নামানো হল জাহাজের সবচেয়ে ভারী নোঙ্গর। বাধুনির শেষ ইঞ্জিটুকু অন্দি ফতুর। সে যে কত নিচু কে জানে, তবুও দেখি সবার মধ্যে কেমন উসখুস ভাব।

আরো বেড়েছে বাতাস। হু হু হাওয়ার তোড়। তখন আর উসখুস ভাব নয়। তখন ভয় আর সন্দেহ সবার চোখে মুখে। সব চেয়ে অবাক লাগছে কাণ্ডেনকে দেখে। আমার কেবিনের পাশেই তার কেবিন। দেখি বারে বারে বাইরে যায় আর ভেতরে ঢোকে। কাজকর্ম তদারক করে আর বিড় বিড় করে ইঞ্চৰকে ডাকে—প্রভু, দয়া কর। বাঁচাও আমাদের। নইলে সব শেষ হয়ে যাবে। আমরা বাঁচব না। রক্ষা কর।

আর আমি? আমি যেন কেমন বোকা হয়ে গেছি। কী করব কী করা উচিত, কিছুই মাথায় ঢোকে না। শুধু চুপচাপ নিজের কেবিনে শুয়ে ভাবি উঠাল পাথাল। ভাবনার যেন থই মেলে না। সে যে কী বড় আমার মনের গহনে। তবু জোর করে শান্ত রেখেছি নিজেকে। মরবার ভয় আর নেই। সেটা প্রথম দিকে ছিল। এখন কেমন এক জবুথুবু ভাব। যেন নিষ্ক্রিয় নিষ্পত্তি নিরাসক কোনো মানুষ। আসলে করবার মতো যে আমার কিছু নেই। এই বাতাসের বিরুদ্ধে কী করতে পারে আমার মতো শুদ্ধতিশুদ্ধ একজন মানুষ?

তখন বাইরে এলাম।

বলব কি সে এক অস্তুত অতিপ্রাকৃত দৃশ্য। সমুদ্র না, যেন পাহাড়। সে রকমই উচু চেউ। ভীষণ গর্জন করে ভেঙে ভেঙে পড়েছে। ভয় করে সেই দিকে তাকাতে। আমাদের পাশেই অন্য দুটো জাহাজ বাঁধা ছিল। দেখি তাদের মাস্তুল ভাঙা। গড়াগড়ি খাচ্ছে পাটাতনের উপর। আমাদের জাহাজের এক মাঝি চিৎকার করে বলল, এক মাইল দূরে

বাঁধা ছিল আরেকটা জাহাজ, সেটা নাকি নোঙ্গৰ ছিড়ে কোথায় ভেসে গেছে। যে সব জাহাজে মাল বোঝাই তাদের তবু একটু যা নির্ভয়, হালকা শুলোরই মর্মান্তিক অবস্থা। ঠেলতে ঠেলতে বাতাস দূ-তিনটেকে নিয়ে এসেছে একদম আমাদের কাছের গোড়ায়। ঢেউয়ের দোলায় টালমাটাল তাদের হল।

সঙ্কের দিকে সারেং বলল, সামনের মাস্তুল রাখা এখন বিপজ্জনক। কেটে ফেলতে হবে। কাণ্ডেনের তাতে ভীষণ আপত্তি। তখন সারেং বলল, যদি থাকে তাহলে জাহাজ সামাল দেওয়া যাবে না। এবার বিবেচনা করে দেখুন। তখন রাজি হল কাণ্ডেন। মাস্তুল সমেত পাল তখন নামানো হল। কিন্তু তাতে করে পিছনের বড় মাস্তুল দেখি নড়বড় করে। তাতে নতুন বিপত্তি। তখন সেটাও খুলে শুইয়ে কেওয়া হল পাটাতনের একধারে। ব্যস, পাটাতন এখন পুরোপুরি ফাঁকা।

আমার অবস্থাটা ভবে দেখুন। এই আমি—কদিনই বা আছি জাহাজে। নাবিক ঠিকই, কিন্তু নতুন যে। ভয়ে তো বুক আমার সর্বদা ধুকপুক করে। কদিন আগে যে ঝড় দেখেছি, তা ভয়ের ঠিকই তবে এতটা নয়। এ অবস্থায় পড়তে হবে আগে কি জানতাম? হায় হায়, এখন তো জীবন রক্ষা করাই দায়। পুরনো চিঞ্চাগুলো আবার ঘনের আনাচে কানাচে পাকখেতে শুরু করেছে। নিজের উপর রাগ। আর কথা শুনি নি কারুর, অগ্রাহ্য করেছি বাবার আদেশ—সব নিয়ে ভারি তোলপাড় ঘনের ভেতরটায়। আসলে হুবহু যে কীরকম, আমি বলে বোঝাতে পারব না, ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নেই। সমানে ছুটে চলেছে ঝড়। ছোটেই বলব। রাগে দাপাদাপি করতে করতে ছুটে গেলে যেমন লাগে। সবাই দেখি ভয়ে তটস্থ। তবু জাহাজটা আমাদের ভালো সেই যা সাম্ভনা। কিন্তু মালে তো বোঝাই। যে কোনো মুহূর্তে গোস্তা খেয়ে পড়তে পারে সমুদ্রে। তলিয়ে যাবার সন্তানবন্ধন প্রচুর। তবে তলাবার যে কী অবস্থা সেটা এখনো আমি প্রত্যক্ষ করি নি। সেটা আমার একটা সাম্ভনা বলা যেতে পারে। তাই সে বিপদটা ওরা যেভাবে দেখছে, আমি ততটা নই। এদিকে বসে গেছে কাণ্ডেন আর সারেং প্রার্থনায়। প্রার্থনা ছাড়া এই মুহূর্তে করণীয়াই বা কী। দেখতে দেখতে রাত গভীর। কেমন মন মরা ভাব চারদিকে। এরই মধ্যে কে একজন চিংকার করে উঠল, জাহাজ নাকি ফুটো হয়ে গেছে। খোলে প্রায় চারফুট মতো জল। অমনি ছুট ছুট! জল পাম্প করে বের করে দিতে হবে। সে প্রায় যেখানে যে আছে সবাই। আমি এগোতে সাহস পেলাম না। মত্যুভয় একটু একটু করে চেপে বসছে আমার বুকের উপর। কেবিনেই বসা। পারি না এক পা নড়তে কি উঠতে। তখন একজন এল। বেদম ধরক লাগাল।—অপোগণ্ড, এখানে বসে আছে! যা গিয়ে হাত লাগা। তখন তাড়া খেয়ে উঠলাম। নিচে গেলাম। জল বের করার কাজে হাত লাগালাম। খাটলাম জান দিয়ে। কাণ্ডেন এসে বলল, এক কাজ কর, কামান গর্জে বিপদের কথা সবাইকে জানিয়ে দাও। আর দেরি করা ঠিক নয়। আমার তো হাত পা তখন কাঁপতে শুরু করেছে। সেই অবস্থায় আমিও প্রথনায় হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম। কারোর কি আর খেয়াল আছে আমার দিকে? নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত সবাই। নিজের প্রাণটা সবার কাছে অনেক বড়। এদিকে কাজ তো বন্ধ। তখন কার যেন নজর গেল। ছুটে এসে এক লাথিতে ছিটকে ফেলে দিল আমায় একধারে। তারপর আমি যা করছিলাম সেটা করতে লাগল। আমি একইভাবে পড়ে রইলাম।

আর রক্ষা নেই। এটা কেবল আমি নই সবাই জানে। জাহাজ আর বাঁচানো যাবে না। ঝড়-একটু কম। কিন্তু খোলে জলের আর কামাই নেই। যত তুলে ফেলে দেয় কিছুতেই

শেষ হয় না। এদিকে বন্দরও বেশ খানিকটা দূর। এই অবস্থায় কোনোক্ষমে শিয়ে যে সেবানে ভিড় তারও উপায় নেই। সাহায্যের আবেদন জানিয়ে ইতোমধ্যে পরপর কয়েকবার তোপ দাগা হয়েছে। একটু পরে দেখি ভাসতে ভাসতে চেউয়ের মাথায় তোলপাড় থেতে থেতে একখানা নৌকো নিয়ে কজন মাঝি হাজির। কাছেরই আর এক জাহাজ থেকে পাঠিয়েছে। তা সে কি আর পারে জাহাজের কাছ গোড়ায় ভিড়তে। চেউ যে ভীষণ। চেষ্টা করে প্রাপণ, চেউ সরিয়ে নিয়ে যায় আমাদের কাছ থেকে। সে এক যুদ্ধই বলা যেতে পারে। আমাদের জীবন রক্ষার জন্যে নৌকোর মাঝিদের ঘরণপণ যুদ্ধ। শেষে যখন আর কিছুতেই পারা যায় না, তখন জাহাজ থেকে কাছি ছুড়ে দেওয়া হল নৌকা লক্ষ্য করে। বহুকষ্টে ওরা তার নাগাল পেল। তারই সাহায্য নিয়ে নৌকো এনে লাগানো হল জাহাজের গায়ে। উঠলাম আমরা অনেকে। কিন্তু যাব কোথায়? সেটা একটা সমস্য। এই চেউ অগ্রহ্য করে বাতাসের বিপরীতে তাদের জাহাজে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। সেক্ষেত্রে একটাই করণীয়। যেন তেন্তে প্রকারে কূলের নিকটবর্তী হওয়া। সেটাই সাব্যস্ত হল। তখন টালমাটাল অবস্থায় নৌকো চলল উইটারটেন নেসের দিকে।

ফিনিট পনের পর আমাদের চোখের সামনে জাহাজ তলিয়ে গেল। একটু একটু করে ডোবা, এই আমি প্রথম দেখতে পেলাম। প্রথমটা খেয়াল করি নি। পরে নাবিকেরা বলতে নজর গেল। আমি তো থ। বড় কষ্ট লাগছিল দেখতে। আর তয়। যদি থাকতাম আমি জাহাজে! যদি নৌকোয় উঠতে না পারতাম। তবে কি এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার সুযোগ আমার হত।

এদিকে প্রাপণ চেষ্টা করছে মাঝির দল। যুদ্ধ যাকে বলে। চেউয়ের সঙ্গে, সমুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ। চেউ তো না যেন পাহাড়। মুহূর্মুহূর দমকে ভেসে উঠি এক একটা পাহাড়ের মাথায়, কূল দেখতে পাই। বেশি দূর নয়, কাছেই। মনে হয় আর একটু গেলেই পৌছে যাব। পারি না পৌছাতে। আর এক দমকে ফের পিছিয়ে পড়ি। একবার তো উইটারটেনের লাইট হাউস অব্দি দেখতে পেলাম। আর মানুষ। সে যে কত গুনে শেষ করা যায় না। ছেটাছুটি করছে হন্তে হয়ে। আমাদের হাতছানি দিয়ে উৎসাহ জানাচ্ছে। সাহায্য করতে চাইছে নানান ভাবে। সে যে কী অসহায় অবস্থা! সিধে তো পারি না যেতে, গতি এখন কোনাকুনি। তারপর আরো লড়াই, আরো যুদ্ধ, আরো সংগ্রাম। শেষে ডাঙায় শিয়ে ভিড়ল তরী। নিরাপদেই পৌছেছি বলা যায়। সুস্থ আমরা সকলে। এবং নিশ্চিন্ত। হাঁটতে হাঁটতে চললাম তখন ইয়ারমাউথের দিকে। সে অনেকেখানি পথ। তবে পৌছতে সবাই খাতির করল। ভালো জায়গা দিল থাকতে, খাবার দিল, টাকা দিল। দয়া আর কী সাজ্জনা। আমরা ডোবা জাহাজের নাবিক যে। আমাদের যে মন্দভাগ্য। বলল, আর সমুদ্রপথে নয়। স্থলপথে এই টাকা নিয়ে আপনারা হয় লড়ন নয় তো হুলে ফিরে যান।

সেই কথাই ভাবি। যদি ওদের কথা মতো হুলে ফিরে আসতাম, তারপর ঘরের ছেলে ফিরে যেতাম ঘরে, তবে এত কষ্ট কি দুর্দশা কিছুই হত না। সুরী হতাম নিজ পরিবেশে। বাবারও বড় আনন্দ হত। শুনেছেন তো জাহাজ ডুবির খবর। তারপর তো কদিন ধরে দুশ্চিন্তায় অস্থির। পরে অবিশ্য জানতে পেরেছেন আমি মরি নি, নিরাপদেই আছি।

সে যাই হোক, পারলাম না বাবাকে সুরী করতে বা নিজে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ছৌঁয়াচ পেতে। ভাগ্য যে আমার খারাপ। তাড়া করে বেড়ায় প্রতিমুহূর্তে। তাতে যুক্তি বেশির ভাগ সময়ই থাকে না। অথবা পারি না তাকে অবহেলা করতে কি এড়াতে। একে কী বলব আমি জানি না। তবে এটুকু বুঝি এরকম যাদের ক্ষেত্রে ঘটে, তারাই দ্রুত ধৰ্মসের দিকে

পা বাড়ায়। চোখ কান খোলা রেখে হিসেব করে পা ফেললেও তার থেকে নিষ্ঠার নেই পরিভ্রান্ত নেই। অন্তত প্রথম নির্দশন তো হাতে হাতেই পেলাম।

তা সেই যে আমার বঙ্গ—যে আর কি জাহাজে ডেকে নিয়েছিল আমায়, আমাদের কাপ্তনের ছেলে—ইদানিং দেবি কেমন যেন মনমরা ভাব, কেমন যেন ভীরু ভীরু। ইয়ারমাউথে আসার দুদিন পর তার সঙ্গে দেখা। এক জায়গায় তো সবাই থাকি না। একটু ছাড়া ছাড়া। এক একজন এক এক বাড়িতে। তো কথাবার্তা হল। কেমন যেন উৎসাহহীন। যেন ভারি নিঃসঙ্গ মানুষ। কথা বলার চেয়ে হ্যাঁ হ্যু করেই সংক্ষেপে বেশি জবাব দেয়। বাবার সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিল। বলল কে আমি, কোথা থেকে কীভাবে জাহাজে এসেছি। আরো যে সমুদ্রযাত্রার ইচ্ছে আমার সেটাও বলল। শুনে বাবার অর্ধাং কাপ্তনের চোখ মুখের সে যা হল। বললেন, শোনো ছোকরা, তোমার আর সমুদ্রযাত্রা না করাই ভালো। উচিতও নয়। নবিক হওয়া তোমাকে মানায় না। বললাম, কেন বলছেন একথা? আমাকে মানা করছেন, আপনি নিজেও কি আর সমুদ্রযাত্রায় যাবেন না?



...আমাকে যদি কেউ হাজার পাউড দিয়ে বলে উঠতে—আমি উঠব না—মরে গেলেও না

বললেন, আমার ব্যাপারটা আলাদা। সমুদ্রে যাওয়াই আমার পেশা। কিন্তু তুমি তো এই প্রথম। শুরুটা তোমার মন্দ। তুমি অপয়া। ভুলেও আর কখনো জাহাজে উঠবার নাম করো না। কক্খনো না। আর শুনে রাখ, তুমি যদি ফের জাহাজে ওঠ, সেই জাহাজে আমাকে যদি কেউ হাজার পাউড দিয়ে বলে উঠতে—আমি উঠব না। মরে গেলেও না।

অর্ধাং উচ্চেজ্জিত হয়েছেন ভীষণ এটা স্পষ্ট বোঝা যায়। সেটা স্বাভাবিক। কেননা ক্ষতির পরিমাণ প্রচুর। পারেন নি এ অবস্থায় মাথা ঠিক রেখে কথা বলতে। আমাকে মিথ্যে দোষারোপ করতে অপয়া বলতে বাধ্য হয়েছেন। সে মনোভাব আমি আর-পরিবর্তন করতে তৎপর হলাম না। মনের বাল মিটিয়ে তিনিও কিছুটা ধাতস্ত হলেন। আমাকে বললেন বাড়ি ফিরে যেতে। বাবার কথা মান্য করতে। বললেন, যেন মনে রাখি তার প্রতিটি নির্দেশ। ভুলেও যেন জাহাজে ওঠার নাম না করি। তবে আবারো দুর্ভোগ ভুগতে

হবে। আবারো অসীম লাঞ্ছনা গঞ্জনা আমার অদ্বৈত ভুটবে।

ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল তারপর। অত কথা যে বললেন আমি তো জ্বাব দিই নি তেমন। তাই কথার পিঠে কথা টানবার বা সেই প্রসঙ্গ নিয়ে পরে অন্য কথা বলবার অবকাশও হয়ে ওঠে নি। সেই শেষ দেখা। কোথায় তারা গেল জানি না। আমি লড়নের পথে রওনা হলাম। বলাবাহুল্য স্থলপথে। সঙ্গে টাকা তো রয়েছে। পথে যেতে যেতে চিন্তায় কেবল মন তোলপাড় হয়। কী করব এবার। কোথায় যাব!

বাড়ি যাওয়া অসম্ভব। লজ্জা খুব। পারি নি সমুদ্র প্রবাসে গিয়ে জীবনটাকে নতুন ভাবে সাজাতে। জ্বাহাজভুবির পর ফিরে আসছি দুর্দশা নিয়ে, দৃঢ় নিয়ে, লজ্জা নিয়ে। লোক হসাহসি তো এই নিয়ে খুব একচোট হবে। তাতে বাবা মাও লজ্জা পাবেন। আমার জ্বন্যে বাবা মা লজ্জা পাবেন! হসবেই সবাই, আমি জানি। মানুষের মুখ বক্ষ করব কীভাবে। দেখেছি যে বিস্তর মানুষ। বুঝেছি তাদের স্বভাব, অভ্যস। আমাকে দুয়ো দেবে বিশেষ করে আমার বয়েসী ছোকরার দল। ভাবি যে বেপরোয়া। কোন্টা ন্যায় কোন্টা অন্যায় বোঝে না। বুঝিয়ে দিলে অনুত্তাপ করতে জানে না। এটা বোকামিরই লক্ষণ। বোকামি করে তারা আর তাই দেখে লজ্জা পান আমার বাবা মায়ের মতো ভালোমানুষের দল।

এই সব চিন্তা মনের মধ্যে কেবলই পাক খেয়ে বেড়াতে লাগল। কী করব কিছু ঠিক করে উঠতে পারি না। বাড়ি যেতে একদম ইচ্ছে করে না। এটা একটা অস্তুত ব্যাপার। এদিকে প্রথম সমুদ্রযাত্রার সেই যে দুর্দশা, সেটাও এতদিনে একটু একটু করে কমতে শুরু করেছে। এখন আর নেই বললেই হয়। বরং আগেরটাকে আরেকবার যাচাই করতে নতুন করে ফের সমুদ্রে যাবার ইচ্ছাপ্রবল হয়ে চেপে বসেছে।

সেই ছিদ। আমি আবারো ভেতরে ভেতরে টের পাই। সেই বাবার আদেশ অগ্রহ্য করা গৌ। সমুদ্রযাত্রায় গিয়ে নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের গৌ। সব তুচ্ছ এর কাছে। বাবা-মা, তাদের শাসন, তাদের উপদেশ, আমার দুর্দশা—সব। অলীক অজ্ঞানাই মনকে যেন বড় বেশি টানে। ঝাপিয়ে পড়তে মন চায়। অজ্ঞানার অভিসারে। এখনো সেই টান। তারই তাড়নায় চেপে বসলাম ফের আফ্রিকাগামী এক জাহাজে। নাবিকেরা অবিশ্য আফ্রিকা বলে না, বলে গিনি। সমুদ্রে ফের জাহাজ ভাসল।

দুর্ভাগ্য এই, নিজেকে তখনো পারি নি পুরোপুরি নাবিক করে তুলতে। কাজকর্ম অবিশ্য অন্য সকলের চেয়ে অনেক বেশিই করি, তবু নাবিকের মতো অতটা খাটতে পারি না। এরই মধ্যে মাস্তলের কাজটা ভালো শিখেছি। হয়ত ভবিষ্যতে জ্বাহাজের সর্বাধ্যক্ষ অব্দি হতে পারব। কাপ্তেনও বনে যেতে পারি। কিংবা সারেং। শুধু নাবিকটা বাদ। ওটা আমার ধাতের বাইরে। মাস্তলের টঙ্গে চড়বার মধ্যে যেন অনেক বেশি রোমাঞ্চ, অনেক বেশি উৎসেজন। যেহেতু রোমাঞ্চ আমরা ভালো লাগে তাই এই কাজটাই আমার প্রিয়। নাবিকেরা, বলতে বাধা নেই আমাকে যেন একটু সমীহই করে। পোশাক-আশাকে ভদ্র, তার উপর টাকা পয়সাও পকেটে কিছু আছে। দুটোই ওদের এক্ষিয়ারের বাইরে। তাই খাতির পাই।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা জানিয়ে রাখি। লড়নে ধাকাকালীন বেশ কিছু ভালো মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। এমন সচরাচর হয় না। অস্তুত আমার মতো ছেলেদের ক্ষেত্রে তো নয়ই। বয়ে যাওয়া বলতে যা বোঝায় তা আমি নই। তবে অনেকটা তো সেরকমই। এ অবস্থায় ভালো সাথী সচরাচর তেমন জ্বেটে না। ভালো অর্ধে যেমন ধুন জ্বাহাজের এক কাপ্তেন। তিনি গিনিতে আগে একবার গিয়েছেন। এবং তার ধারণানুযায়ী

সফল সে যাত্রা। আবারও যাবেন। আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে তো খুবই খুশি। বিশেষ করে আমি যখন বললাম, দুনিয়াটাকে দেখবার জ্ঞানবার আমার খুব আগ্রহ, আমাকে বললেন, চল না আমার সাথে। কোনো খবচ তোমার লাগবে না। সঙ্গে বরং দু' একটা জিনিসও নিয়ে চল। ব্যবসা করার সুযোগ পেলে দু' চার পয়সা আমদানিও হয়ে যাবে। মোটমাট মদ কী।

মদ তো নয়ই। আমার পক্ষে বরং যথেষ্ট। লুকে নিলাম তার আহ্বান। মানুষটাকে বড় আপন বলে মনে হতে লাগল। সরল সাদাসিধে। সৎ। ভারি মিশুকে। কথা মতো সঙ্গে কিছু খেলনাও কিনে নিলাম। স্বীকার করতে অসুবিধে নেই, খেলনা বেচে সেবার বেশ কিছু অর্থের ঘালিক হতে পেরেছিলাম। পুঁজি মাত্র চল্লিশ পাউন্ড। সেটাও চেয়ে চিঙ্গে জোগাড় করা। লিখেছিলাম আত্মীয় স্বজ্ঞনদের কাছে চিঠি। তারা পাঠিয়ে দিয়েছেন। হয়ত তাদেরই কাছ থেকে বাবা আমার খাবরাখবর পেয়ে থাকবেন। মোটমাট সব দিক থেকেই নিশ্চিন্ত। এবং শুভও বটে। এয়াবৎ যত সমুদ্রযাত্রা আমি করেছি, যত অভিযান—এই একটিমাত্র যাত্রা সবাদিক থেকে চমৎকার। তার পুরো কৃতিত্ব অবশ্যই আমার সেই বক্তু কাণ্ডনের। সে ভালবাসার কথা আমি জীবনে ভুলব না। আমাকে ধরে ধরে আঙ্ক শেখালেন, সমুদ্রের নানান জ্ঞাতব্য—নাবিকদের ক্ষেত্রে যেগুলো অবশ্যই জ্ঞানবার প্রয়োজন আছে শেখালেন। এই যে বলে না হাত ধরে শেখানো—অনেকটা তাই। জ্ঞাহাজে কাজ করতে গেলে কী কী দিকে নজর রাখতে হয়, কেন কোন জিনিসটা ভালো করে দেখতে হয়—তাও কদিনের মধ্যেই শিখে ফেললাম। আমি যাকে বলে কৃতার্থ। পাকাপাকি নাবিক বনে গেলাম কদিনের মধ্যে। ব্যবসাদারও। ফেরবার সময় খেলনা বেচা লাভের টাকা দিয়ে নিয়ে এলাম পৌনে ছ পাউন্ড ওজনের স্বর্ণরেণু। সেটা লড়নে বিক্রী করে মোট আয় হল তিনশ। তখন একটা আশা একটা আত্মবিশ্বাস নিজের মনে জন্ম নিল।

তবে হ্যাঁ, একদম যে সুস্থ স্বাভাবিক চমৎকার ভাবে শেষ হয়েছে এই সমুদ্রযাত্রা সেটা বুক বাজিয়ে বলা যায় না। জ্বর হয়েছিল ভীষণ। বিশ্রী জ্বর। ঠাণ্ডা গরম আবহাওয়া থেকে উৎপন্নি। কদিন তো ঠায় পড়ে রইলাম বিছানায়, বিম মেরে, আর স্বপ্ন দেখি উষ্টু উষ্টু। এটা শুনি প্রথম দিকে সকলেরই হয়। বিশেষ করে এই অঞ্চলে আসা মাত্র।

বলতে দ্বিধা নেই, এখন আমি পুরোদস্ত্র ব্যবসাদার। অন্তত গিনিতে গিয়ে কীভাবে কী করব সব আমার কঠিন। ফের যাব গিনিতে। তবে দুর্ভাগ্য এই, আমার সেই বক্তুকে আর পাওয়া যাবে না। মারা গেছে সে হঠাৎ। সমুদ্রযাত্রা থেকে ফেরার কদিনের মধ্যে। বড় কষ্ট সেইজন্যে। কিন্তু উপায় নেই। মন আমার এখানে থিতু হতে চায় না। একদিন জ্ঞাহাজে উঠে বসলাম। সেই জ্ঞাহাজ। শুধু কাণ্ডন এবার আলাদা লোক। আগে যে জ্ঞাহাজের সারেং ছিল তারই হাতে এখন ন্যস্ত হয়েছে শুরুভার। অবিশ্য তার জন্যে আমার কোনো অসুবিধে নেই। সঙ্গে টাকাও প্রায় একশ পাউন্ড। দুশ গচ্ছিত রেখে এসেছি কাণ্ডনের স্ত্রীর কাছে। আমাকে ভীষণ ভালবাসেন, স্বামীর মতো তিনিও আমার মঙ্গল চান। কিন্তু হলে কী হয়, এই যে বলে কপাল। দুর্ভাগ্য যত রাজ্যের। এমন বিশ্রী অবস্থায় আমি জীবনে কখনো পড়ি নি। ভাবত্তেও পারি নি এতটা ঘটবে। গোড়া থেকেই বলি।

ক্যানারি দ্বীপপুঁজির দিকে চলেছে আমাদের জ্ঞাহাজ। একধারে আফ্রিকা, আর একধারে দ্বীপমালা। হাওয়া ভালো। সবই চমৎকার। হঠাৎ একদিন ভোরে দেখি শুর্কিদের একখানা দস্যু জ্ঞাহাজ। সালের দিক থেকে আসছে। অসীম শূর বেগ। যেন তাড়া করছে আমাদের। এ অবস্থায় চটপট পালানো ছাড়া তো উপায় নেই। দিলাম অমনি সবকটা পাল

তুলে। শব্দেরও পাল তোলা। পারি কি আমরা শব্দের সঙ্গে পাঞ্চা দিতে! একটু পরেই দেখি কাছেকাছি প্রায়। আর কিছুক্ষণের মধ্যে থেরে ফেলবে আমাদের। তখন লড়াই করার জন্যে প্রস্তুতি নিলাম। বিনা মুঁজে হার মানা এক্ষেত্রে বোকাধি। বারটা বন্দুক মোট আমাদের। নামানো হল। শব্দেরও হাতে বন্দুক। স্তনে দেখি আঠারটা। আর লোক প্রায় দুশ। একদফা গুলী চালাচালি হল। আমাদের দলে হতাহত কেউ নেই। ফের ছুভল ওরা গুলী। আমরা তখন আত্মরক্ষা করা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছি না। তখন ষাট জন দসু হৈ হৈ করতে করতে আমাদের জাহাজে আচমকা উঠে এল। সে কী দাপট! এটা ভাঙে গুটা কাটে পাল, ফুটো করে দেয়—যেন চোখের নিমেষে দক্ষযজ্ঞ কাণ। পাঠক অনুমান করতে পারছেন, কত অসহয আমরা। কিছুই করার নেই। ইতোমধ্যে আমাদের তিনজন মারা গেছে, আটজন গভীরভাবে জ্বর। বাকিদের বন্দী করল। তার মধ্যে আমিও আছি। নিয়ে গেল সালেতে। সেটা মূরদের আস্তানা। এবং নামকরা বন্দর।

তবে বন্দী হলেও ব্যবহার খারাপ পাই নি। সেটা আমার সৌভাগ্যই বলা যায়। গোড়ায় ভয় ছিল খুব—না জানি কি না কি অত্যাচার করে আমার উপর। সবাইকে বেধে নিয়ে গেল সম্মাটের এজলাসে, শুধু আমি বাদ। দসুদলের সর্দারের আমাকে ভারি পছন্দ। বয়েসটা তো কম, খাটাখাটিনিও করতে পারি। এটা হয়ত বুঝে থাকবে। তার কাছেই রেখে দিল আমায়। অর্থাৎ ক্রীতদাস যেরকম। ভেবে দেখুন আমার মনের অবস্থা। কোথায় হব ব্যবসাদার, তা নয় সব আশা নির্মূল করে হতে হল আমায় ক্রীতদাস। দৃঃখ্যে তো বুক আমার ভেঙে যায়। আর বাবার কথা মনে পড়ে। ঘুরে ফিরে সেই সব পুরানো চিন্তা। হায় হায় মানি নি তার নির্দেশ, কত অপরাধই না করেছি। আরো কত দৃঃখ্য আছে কপালে কে জানে!

সর্দার আমাকে বাড়ি নিয়ে গেল। আশার আলো দেখতে পেলাম। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে ফের জাহাজে চাপিয়ে নিয়ে যাবে পর্তুগাল কি স্পেনে। দসুতার প্রয়োজনেই। গৃহবন্দী তো থাকতে হবে না। তখন সুযোগ বুঝে একদিন পালাব। কিন্তু কোথায় কী। গেল ফের সমুদ্রযাত্রায়। আমাকে রেখে গেল বাড়িতে। বাগান দেখাশোনার কাজে। সঙ্গে ক্রীতদাসদের আরো সব খুচরা কাজ। রইলাম তাই। ফিরে এসে বলল, এখানে আর তোর থাকতে হবে না। আমার জাহাজে গিয়ে শুবি। বন্দরে ভেড়ানো আছে। দেখাশোনা করবি। এটাই এখন থেকে তোর কাজ।

তবু ভালো। গৃহবন্দীত তো খুচল। এখন শুধু ঘুরে ফিরে একটাই চিন্তা—কীভাবে পালানো যায়, কত সুচতুর উপায়ে আমি এখান থেকে সটকে পড়তে পারি। ভেবে ভেবে কূল আর পাই না। কথা যে বলব কারো সাথে, আলোচনা করব—এমন একজনও নেই। ক্রীতদাসদের মধ্যে না একজন ইঁরেজ কি আইরিশ কি স্কটল্যান্ডের বাসিন্দা! শুধু একলা আমি এই ভাবেই কেটে গেল টানা দুটি বছর।

আমি হতাশ প্রায়। কী লাভ আর অহেতুক ভাবনায়! ঠিক তখনি অস্তুত একটা ঘটনা ঘটল।

সর্দার তখন বাড়িতেই। ফিরে আসা ইন্সক একবারও বেরোয় নি। জাহাজ মেরামতির কাজ তখনো কিছু কিছু বাকি। ইত্যবসরে মাঝে মাঝেই পোকা নড়ে উঠে মাথায়। তখন শাস্পান নিয়ে আমাকে সঙ্গে করে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়। সে প্রায় হণ্টায় দু-তিনবার। সঙ্গে থাকে মারেম্বেক। তারও বয়েস কম। সেও ক্রীতদাস। তা দুটিতে মিলে হৈ হুঁপ্লোড করে সারাক্ষণ খুশি রাখি আমরা সর্দারকে। ফলে প্রতিবারে আমাদের দুজনকেই

তলব। আর আমার তো আরো একটা বাড়তি গুণ। ভালো মাছ ওঠে আমার হাতে। সেটা আমার ভাগ্য। মারেস্কা হয় তো বা বাদ গেল কোনোদিন, বদলি হিসেবে এল এক ছোকরা নিগ্রো। আমি স্বপনেই বহাল। মাঝে মাঝে এমনও হয়েছে। নিগ্রো আর আমাকে দিয়েছে পাঠিয়ে। মোটে দুজন আমরা। আর কেউ নেই। আমরা মাছ ধরে এনে দিতাম।

একদিন তো ভীষণ কুয়াশা। সকাল। আমি, মারেস্কা আর নিগ্রো বেরিয়েছি মাছ ধরতে। প্রায় এক ক্রোশটাক পথ পাড়ি দেবার পর দেখি সব বেঙ্গুল। কিছুই আর ঠাওর হয় না। চারধারে শুধু ধোঁয়ার কুণ্ডলী। তারপর যে কত বাইলাম দাঁড়, কত পরিশৃম তার আর সীমা সংখ্যা নেই। কূল আর আসে না। দেখতে দেখতে দিন গেল, রাত ঘনাল। তখনো সমানে পালা করে দাঁড় বাইছি এক একজন। শেষে ভোর হতে কুয়াশা কাটল। দেখি তখন চারক্রোশের মতো আমরা কূল থেকে দূরে। বাতাস উঠেছে। সে আর এক পরিশৃম। বহু কষ্টে ছন্দাড়া অবস্থায় ক্ষুধায় তঢ়শ্য কাতর আমরা শেষ অন্দি কূলে গিয়ে পৌছালাম।

সর্দারকে বলতে সর্দার বলল, তাইতো এ তো বড় দুশ্চিন্তার কথা। যদি সত্যি সত্যি পথ ভুল করে আরো দূরে চলে যেতি তোর—সেই মাঝ দরিয়ায়! তখন তো নাকালের একশেষ। শুধু তোদের কেন, আমি থাকলে আমারও হয় তো এই দশা হত। দাঁড়া, আমি ব্যবস্থা করছি। বলে বড় জাহাজের কাঠমিঞ্চীকে বলল শাম্পানে একটা ধর বানাতে। কম্পাস রাখার ব্যবস্থা হল। দরিয়ায় দিক নির্দেশের নির্ভুল দিশারী। তাক হল ঘরে অনেকগুলো। একটা মদের বোতল রাখার, একটা খাবার দাবার রাখার। মোটমাট বজরা যাকে বলে। ঘর অর্থে কেবিন। ওপরে সারেং বসার একটা ছোটো ঘর। সেখানে বহুকষ্টে দু-তিনজনের মতো মানুষ শুভে পারে। অর্থাৎ আমাদের যদি কখনো শোবার দরকার হয়, তারই জন্যে এই ব্যবস্থা। খাবার টেবিলও পাতা হল কেবিনের একধারে। আর ভাঁড়ারে মজুত হল বিস্তর চাল, রুটি আর কফি।

এরপর থেকে মাছ ধরতে গেলে এই বজরাই আমাদের বাহন। সর্দারও সঙ্গে থাকে। আর আমি তো আছি। মাছের ভাগ্য যে আমার বুব। একদিন দেখি আরো খাবার আরো বোতল তোলা হচ্ছে বজরায়। কী ব্যাপার? না, জিজ্ঞেস করে জানলাম, নাকি কজন মান্যগণ্য নিগ্রো বন্ধু যাবে প্রমোদ ভ্রমণে। সঙ্গে মাছ ধরার মজাও থাকবে, তারই জন্যে এই তোড়জোড়। বড় জাহাজ থেকে তিনটে বন্দুক আর কিছু গোলাবারুদও আনা হল। এগুলো অন্য কোনো কারণে নয়, আমি জানি। বালি হাঁস উড়ে বেড়ায় জলের ধারে ধারে, কখনো বা জলের বুকে। তাদেরই মারবার জন্যে এই ব্যবস্থা।

তো সব আয়োজন সম্পূর্ণ, এমনকি পরদিন সকালে ঝকঝকে তক্তকে করে বজরা ধোয়াধুয়িও শেষ, পতাকা উড়িয়ে দিয়েছি মাস্তুলের মাথায়, উড়েছে পতপত করে, এমন সময় সর্দার একলা এসে হাজির। থমথমে মুখ। নাকি যাবে না বলে জানিয়েছে অতিথিরা। অন্য কী কাজে হঠাৎ জড়িয়ে পড়েছে। রাত্রে বাড়িতে খাওয়া দাওয়ার নেমস্তুম। ভালো মাছ খাওয়াবে মনে বড় সাধ ছিল। আমাকে বলল, তুই বজরা নিয়ে যা। সঙ্গে মারেস্কা আর নিগ্রো যাক। ভালো মাছ ধরে আনিস। পাওয়া মাত্র আর দেরি না করে ফিরে আসবি। বাড়িতে পাঠিয়ে দিবি। আমি অন্য সব যোগাড় করি গে।

বলে চলে গেল।

আমার বুকে তখন রীতিমতো ঝড় বইতে শুরু করেছে।

তোলপাড় ... ...

এই সুযোগ। এর সম্বৰহার চাই। সবই আমার হাতে মজুত। একটা বজরা, প্রচুর

রসদ, তিনটে বন্দুক আর কম্পাস। আর কী চাই! এত ছোটোখাটো একটা জাহাজেরই সমান। ভেসে পড়ব দরিয়ায়। তারপর আর পালাতে অসুবিধে কী।

তবে আরো কিছু রসদ দরকার। তার জন্যে বুদ্ধি খাটিয়ে একটা ব্যবস্থাও করা গেল। নিশ্চোকে বললাম, দেখ ভাই, আমরা তিনজন মালিকের খাবারে ভাগ বসাব এটা তো ভালো দেখায় না। বরং আমাদের জন্যে তুমি অন্য কিছু নিয়ে এস। সে তখন এক ঝুঁড়ি বিস্কুট আর এটা পটা নিয়ে এল। সঙ্গে তিন বোতল জল। বললাম, এতে হবে না, বড় জাহাজ থেকে আমাদের জন্যে কয়েক বোতল মদও আন। সব তো জানা আমার। কোথায় মদ থাকে কোথায় কী সব আমার কষ্টস্থ। তখন কটা দাঢ়ী মদের বোতল আনল। খানিকটা মোম আমি এক ফাঁকে নিয়ে নিলাম। এটা দরকার কেননা রাত্রে মোমবাতি ঝালবার প্রয়োজন হবে। খানিকটা সুতো নিলাম। একটা হাতুড়ি, একটা করাত আর একটা ছেট্ট কুড়ুল। তারপর নতুন এক ফল্দী করে বললাম, ইসমাইল, মালিকের বন্দুক তো



যদি উঠবার চেষ্টা করিস তবে একগুলিতে জান নিয়ে নেবো।

রয়েছে দেখছি, কিন্তু গুলীগোলা তো নেই। সব জাহাজে। গুলী থাকলে বরং কটা বেলে হাঁস মেরে আনতাম। তাতে কর্তা সন্তুষ্ট হত। তুমি বরং জাহাজ থেকে এক বাস্তু গুলী নিয়ে এস। তার বুদ্ধি শুন্দি তো মাথায় কর। ভাবতে পারে নি আমার মতলব। সুবোধ বালকটির মতো নিয়ে এল একবাস্তু গুলী আর সেই সঙ্গে অনেকখানি বারুদ। ইত্যবসরে আমি কেবিনের তাক থেকে মালিকের বারুদের বাক্সটা নিয়ে সবটুকু বারুদ দুটো খালি শিশিতে ভরে মদের তাকে তুলে রাখলাম। বাক্সটা পড়ে রইল খালি। ব্যস্ সব আয়োজন শেষ। তখন নোঙর তুলে বজরা দিলাম ভাসিয়ে।

ঈশান কোণ থেকে বইছে বাতাস। পাল তখন গোটানো। পাল তুলে দিলে সিধে চলে যাব স্পেন বা কানিজের কাছাকাছি। সেটা ভালোভাবেই জানি। কিন্তু আপাতত সেই সদিচ্ছা আমার নেই। যত তাড়াতাড়ি পারি এখান থেকে সটকে পড়াই আমার মতলব।

আগে এখান থেকে পালাব, তারপর ভাগ্যের হাতে আমার জীবন। যেখানে ভেসে যাবে যাক। আমার আর কোনো পরোয়া নেই।

যথারীতি ওদের ধোকা দেবার মতলবে ছিপ ফেললাম জলে। মাছ ঠোকরাল, টোপ খেল। আমি ছিপ তুললাম না বা একটা টানও দিলাম না। বললাম, জানি না আজ আমাদের ভাগ্য কি আছে, এখানে মাছ পাওয়া যাচ্ছে না। বরং চল আরো খানিকটা এগোই।

তখন দাঁড় বাইতে বাইতে ক্রমশ কূল থেকে দূরে সরে যেতে লাগলাম। আমার হাতে ছিপ। আমি তো এখন বজরার কর্তা, ওরা আমার আদেশ মানতে বাধ্য। তাহাড়া আদেশের মধ্যে ওদের বেঝাবার মতো কোনো দুরভিসংক্ষিপ্ত নেই। বজরা যখন বেশ অনেকখানি দূরে, ধীরে ধীরে ছিপ রেখে আমি গিয়ে ইসমাইলের পেছনে দাঁড়ালাম। একদম জলের ধার দিসে সে দাঁড়ানো। দাঁড় বাইছে অপর ছেলেটি, তার নাম জুরি। হঠাৎ এক ধাক্কায় ফেলে দিলাম তাকে জলে। তখন তো হাবু ডুবু খেতে খেতে অস্থির। তবু ওস্তাদ সাঁতারু তো, বিশ্বয়ের প্রথম ধাক্কাটা সামলে অমনি বড় বড় হাতে জল কেটে চলে এত বজরার ধারে, আমাকে বলল তুলে নিতে। সে কী কাতর মিনতি! তখন এক ঝটকায় কেবিনে ঢুকে নিয়ে এলাম বন্দুক। বললাম, খবরদার। যদি উঠবার চেষ্টা করিস তবে এক গুলীতে জান নিয়ে নেব। বরং সাঁতার কেটে ডাঙায় ফিরে যা। ঢেউ বিশেষ নেই। তুই ভালো সাঁতার জানিস। মরবি না। আমরা চললাম। আর ফিরে আসব না কোনোদিন।

তখন ইসমাইল ধাতঙ্গ হল। বজরা ছেড়ে কূলের দিকে ফেরাল মুখ। জুরিকে দেখি একমনে দাঁড় বাইছে। বন্দুক নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম তার সামনে। বললাম কীরে, কথা শুনবি তো আমার? আফ্঱ার নামে শপথ কর। নইলে তোরও কিন্তু একই দশা হবে। জবাবে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল সব কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। আমি যেন অবিশ্বাস না করি। আমি যেখানে নিয়ে যেতে চাই, অনুগত ভৃত্যের মতো সেখানে আমার সাথে যাবে।

আমি একইভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম। নিশ্চো সাঁতার কেটে ফিরে চলেছে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। পাল খুলে দিয়েছি একটু আগে। কূল ক্রমশ দূর থেকে বহুদূর। এইবার শুরু হবে আমার আসল খেলা। হাওয়ার পাশ কাটিয়ে আমি চলে যাব ভিন্ন দিকে। সবাই ভাববে গেছি বারবারার উপকূলের দিকে। পরে হয়ত সেখানেই গিয়ে খোঁজখবর করবে। ধরতে যদি পারে আমাকে আর রক্ষে নেই। এরা কত নির্দয় কত নিষ্ঠুর আমি হাড়ে হাড়ে জানি। প্রথম কাজ হবে এদের নাগাল থেকে বহু দূরে সরে যাওয়া।

সঙ্গের ঘোর লাগতে বজরার মুখ ঘোরালাম দক্ষিণ পূর্ব দিকে। এটাই আমার পালাবার পথ। ওরা হাজার চেষ্টা করেও খুঁজে পাবে না। আর পুবে থাকার সুবিধে প্রচুর। কূলের ধার দিয়েই বলতে গেলে এগোব, তাতে হাওয়া পাব পালে। তরতর করে এগিয়ে যাবে নাও। অস্তুত এক রাতের চেষ্টায় এখান থেকে প্রায় দেড়শ মাইল দূরে। মরক্কোর সম্মাটের এক্সিয়ারের বাইরে। আর কে আমার নাগাল পায়!

তবু এই যে বলে ভয়, মনের মধ্যে অহরহ এক আতঙ্ক। ইসামাইলের সঙ্গে শেষ অন্তি ভালো ব্যবহার তো করি নি। প্রতিশোধ নেবার জন্যে নির্ঘাঁৎ নিশাপিশ করছে ওর হাত। করুক। আমিও বেপরোয়া। থামব না একদম। কূল পেলেও না। নোঙর ফেলার প্রশ্নাই ওঠে না। পাঁচদিন এইভাবে চলব নাগাড়ে। বাতাস এখন দক্ষিণমুখী। সেটা আমার পক্ষে মঙ্গল। যদি ওদের কেউ জাহাজ নিয়ে আমাকে ধরবার জন্যে এগোয়—নির্ঘাঁৎ বেরিয়ে

পড়েছে, আমি হলফ করে বলতে পারি ; সেক্ষেত্রে ততস্ফুলে তারাও ভগ্নোদয়ম অবস্থায় হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। তখন আর ভাবনা কী, আমি মুক্ত !

সেই হিসেবেই পাঁচদিন চললাম একটানা। ছদিনের দিন, ছোট এক নদী, তার মুখে ফেললাম নোঙর। কোথায় কোন নদী, কী এই দেশের নাম, কত দ্রাঘিমা কত অক্ষাংশ কিছুই জানি না। নদীর নামও অজানা। দুটো প্রধান দরকার আপাতত। কিছুটা বিশ্রাম, আর কিছু পানীয় জল। এক ফোটা জল নেই বজ্রায়। সঙ্গে নাগাদ থেমেছি এখানে, ইচ্ছে সাঁতার কেটে ডাঙায় যাব, জল আনব টিন ভরে। কিন্তু তার কি উপায় আছে ! সে যা তর্জন গর্জন জঙ্গলে, যে হাঁক ডাক। সে যে কত জন্ম ! কত হিংস্র প্রাণী। জুরি তো ভয়ে তটস্থ। আমাকে বলল, দেহাই আপনার, খবরদার ওদিকে যাবেন না। বললাম, দেখ, নয় রাতটুকু কাটলাম। কিন্তু দিনের বেলা তো যেতেই হবে। তখন হ্যাত জন্মুর সাক্ষাৎ মিলবে না, কিন্তু মানুষ দেখতে পাব। বন্য হিংস্র মানুষ। তারা জন্মুর চেয়ে কোনো অংশে হ্যাত কম নয়। জুরি বলল, তখন বন্দুক ছুড়ব, ঘায়েল করব তাদের। সেটা অসুবিধা কী। তারা ভয়ে পালাবে। মেটমাট ভারি খুশি জুরি। আমার নিয়াগতা নিয়ে চিন্তিত। তখন গেলাম না ডাঙায়। জুরির উপদেশই মানলাম। কেবিন থেকে নিয়ে এলাম বোতল। আর রুটি। খেলাম পেট ভরে। দেখি আবছা অঙ্ককারে ডাঙার ধারে জলে নেমে খেলছে নানান আকারের জীবজন্ম। কী তাদের উল্লাস ! কী গর্জন ! আমি জীবনে এইসব জন্মুর ডাক শুনি নি। ঘুম আর হল না। দুটি প্রাণী নিখর হয়ে বসে রইলাম সারারাত।

জুরি যেন ভয়ে কুকড়ে আছে। আমিও। তবে সেটা প্রকাশ করতে সাহস পাই না। তাহলে জুরি আরো ঘারড়ে যাবে। হঠাৎ দেখি এক ভয়ানক আকৃতির জন্ম সাঁতরাতে সাঁতরাতে আসছে বজ্রার দিকে। জুরি চিংকার করে উঠল। বলল, পালান এক্সুনি। নোঙর তুলে চলুন এখান থেকে সরে পড়ি। বললাম, দাঁড়াও, ব্যস্ত হয়ো না। তখন কেবিন থেকে বন্দুক নিয়ে এলাম। দেখি বজ্রার একদম কাছে এসেছে। ছুড়লাম গুলি। অমনি ভয় পেয়ে কূলের দিকে ফিরে গেল।

গুলির শব্দে দশগুণ বাড়ল তর্জন গর্জন। সে যে কী হুটোপাটি ! কী বীভৎসতা ! আমাদের তো ভয়ে হাত পা পেটের মধ্যে সৌধাবার উপক্রম। তবু অন্য কোনো ঘটনা আর ঘটল না সে রাতে। ঘুমের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। চোপর রাত জেগে রইলাম। আর মাঝে মাঝে আলোচনা করি নিজেদের মধ্যে—কেমন ভাবে যাব কাল ডাঙায়। যদি পড়ি বাঘ কি সিংহের খপ্পরে ! যদি বাঘ সিংহ না এসে আচমকা চারদিক থেকে ছুটে আসে নরখাদক মানুষের দল !

ভোরের আলো একটু একটু করে ফুটল। জীবজন্মুর হাঁক ডাক এখন আর নেই। যে যাব ডেরা নিয়েছে জঙ্গলের গহনে। আমাদের মাথায় এখন একটাই চিন্তা—জল আনতে যেতে হবে ডাঙায়। আর তাই নিয়ে নানান সংশয়। জুরি বলল সে যাবে, আমার যাবার দরকার নেই। বললাম, কেন ? বলল, যদি নরখাদক দল আসে তবে তাকে নিয়ে যাবে ধরে। সে অবস্থায় আমার তো আর কোনো ভয় নেই। নিশ্চিন্তে আমি ফিরে যেতে পারি দেশে। কী বলব, কথা শুনে এত ভালো লাগল ছেলেটাকে ! কতখানি ভাবে আমার কথা ! বললাম, তোমার একলা যাবার দরকার নেই। আমিও যাব। সঙ্গে থাকবে বন্দুক। তেমন বিপদ দেখলে গুলি চালাতে ইতস্তত করব না।

আরো একটু বেলা বাড়তে বজ্রা এগিয়ে নিয়ে গেলাম কূলের কাছে। তারপর জল ঠেলে হাতে টিন নিয়ে বন্দুক কাঁধে উঠলাম গিয়ে ডাঙায়। সামনে অনেকটা ফাঁকা মাঠ

মতো। তখন ঠিক হল, মাঠের এক ধারে ডাঙার কাছ বরাবর দাঁড়িয়ে থাকব আমি, বজরার দিকে নজর রাখব। জুরি যাবে জলের টিন নিয়ে মাঠের শেষ প্রান্তে। জন্মুর ভয়ের চেয়েও নরখাদক মানুষের ভয় তখন সবচাইতে বেশি। যদি মারমার করে দল বেঁধে ডিঙি নিয়ে অতর্কিংতে ছুটে আসে আমাদের বজরার দিকে। সব লুটপাট করে নেয়। কিংবা ঝাঁপিয়ে পড়ে জঙ্গলের দিক থেকে আচমকা, আমাদের ঘিরে ধরে ! সেক্ষেত্রে জলে ঝাঁপ দিয়ে অস্তত একজনের তো রক্ষা পাওয়ার একটা উপায় থাকল।

দেখি একটু পরে জুরি ফিরে আসছে। হাসি হাসি মূখ। হাতে জলের টিন। কাঁধে কী যেন একটা জীবের মৃতদেহ। কাছে আসতে দেখি খরগোশ ঠিক নয়, তবে অনেকটা ঐরকম দেখতে একটা প্রাণী। বেশ লম্বাটে গড়ন। বলল, শিকার করেছে। মাংসের স্বাদ চমৎকার। বেশ জমবে আজ দুপুরের খাওয়া।

ভালোই খেলাম। বা বলা যেতে পারে অপূর্ব। সঙ্গে সর্দারের কেবিন থেকে আনা এক বোতল উন্নম সুরা। জল ঘেটুকু এনেছে তাও স্বাদু। কোনো ঘোলা ভাব বা নুন কাটা স্বাদ



### তারপর সে কী ডাক! আমি জীবনে এমন সিংহ-গর্জন শুনিনি

নেই। জুরি বলল, জল আনতে গিয়ে অন্য কোনো বন্য জন্মু বা কোনো বন্য মানুষের সাক্ষাৎ মেলে নি। পায়ের ছাপও দেখতে পায় নি। তবে ভয় ভয় করছিল সারাক্ষণ।

তা ভয় থেকে ওকে ঘৃঙ্খি দেওয়া গেছে। খুব কাছেই রয়েছে আর একটা পানীয় জলের জায়গা। নদীর জল একটু বাড়লে সেখানে ফুর ফুর করে জল ওঠে। এখান থেকে দেখতে পাওয়া যায়। জুরিকে এরপর ওখানেই পাঠাতাম জল আনবার জন্যে।

আগের বার সমুদ্রবাতায় আমি এ অঞ্চলে এসেছি। বলতে গেলে জায়গাটা আমার অচেনা নয়। কিন্তু যন্ত্রপাতি তো কিছু নেই এবার সঙ্গে। না কোনো ম্যাপ, না অন্য কিছু। সঠিক ভাবে জায়গাটার অবস্থান কী আমি জানি না। তবে এটুকু জানি এর আশে পাশেই কোথাও না কোথাও ক্যানারি দ্বীপমালা এবং ভার্দ অস্তরীপের নিকটবর্তী দ্বীপপুঁজি রয়েছে।

কোথায় গেলে তার কোনো একটা দ্বীপ পাব সেটাই প্রশ্ন। এবং আমার একমাত্র চেষ্টা তার যে কোনো একটিতে পৌছে যাবার। ব্যস্ত তবে আর চিন্তা নেই। দ্বীপগুলি বাণিজ্যিকেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধ। ইংল্যান্ড থেকে জাহাজ আসে নানান পসরা নিয়ে। তার যে কোনো একটাতে উঠে পড়ব। ফিরে যাব স্বদেশে।

যতদূর অনুমান, সেই মুহূর্তে যে অঞ্চলে আমরা রয়েছি, সেটা মরক্কো সম্ভাটের রাজ্য এবং নিশ্চোদের রাজ্য—দুয়ের মধ্যবর্তী কোনো এলাকা। এটি নির্জন এবং স্বাপদ সংকুল। অনুর্বর এলাকা, চাষবাসের পক্ষে একান্ত অনুপযোগী, তাই নিশ্চোরা এখানে বসতি করে নি। চলে গেছে আরো দক্ষিণে। মরু অঞ্চলের প্রায় কাছাকাছি। আর জল্লুও এখানে অতেল। চিতা থেকে শুরু করে নেকড়ে, বাঘ, সিংহ সবই আছে। এখানে নিশ্চোরা ঝচিং কখনো আসে শিকার করতে। এটা তাদের মৃগয়াভূমি। আসে দল বেঁধে। এক এক দলে প্রায় হাজার খানেক মানুষ। মাইলের পর মাইল জুড়ে এই বন। অন্তত শখানেক মাইল তো আমাদেরই যেতে যেতে নজরে পড়ল। ঘন জঙ্গল। কুলের একেবারে গা দেঁসে। জনমানুষের চিহ্নমাত্র নেই। শুধু জল্লুর ডাক আর গর্জনের শব্দ আর পাখির কিটির শিচির। আর কোনো শব্দ কানে আসে না।

টেনেরি ফে-র চুড়োও নজরে পড়ল। ক্যানারি দ্বীপমালার সব থেকে উচু চুড়ো। দু দুবার চেষ্ট করলাম শিখরে ওঠার। তাতে চারদিকে নজর বোলাবার প্রচণ্ড সুবিধে। তাহলে দেখতে পেতাম কোথায় রয়েছে জাহাজ, কোথায় গ্রাম, কোথায় মানুষ—সব। কিন্তু এমনই খাড়াই, ওঠা সম্ভব হল না। দু দুবারই নেমে আসতে বাধ্য হলাম।

জল আনবার জন্যে মাঝে মাঝেই নামি ডাঙ্গায়। টিনে করে নিয়ে আসি। একদিন সকাল তখন। বললাম, আজ আর এগিয়ে কাজ নেই, নোঙ্গর ফেলি এই খানেই। তখন নোঙ্গের ফেললাম। ডাঙ্গ এখানে উচু। খানিকটা ফাঁকা মতো জায়গা। অদূরে পাহাড়। জল অনেক খানি নিচে। হঠাৎ জুরি বলল, ঐ দেখুন দৈত্য। ঐ পাহাড়ের গায়ে। তাকিয়ে দেখি সে এক মস্ত সিংহ। দৈত্যের মতোই আকৃতি। পাহাড়টা এগিয়ে এসেছে এখানে কূল অঙ্গি। ঝুলন্ত এক খণ্ড মস্ত পাথর। তারই উপর শুয়ে সেই সিংহ। নাগালের মধ্যেই আমাদের। বললাম, তুই যা। ওটাকে মেরে আয়। জুরির চোখ তো ছানাবড়া। বলে, বলেন কী আপনি! আমি মারব অত বড় জল্লুটাকে! কাছে গেলেই আমাকে হালুম করে গিলে খাবে। বললাম, বেশ। তাহলে আমি চেষ্টা করে দেখি। বলে বড় বন্দুকটা নিয়ে এলাম। তাতে বারুদ পুরলাম অনেকখানি, সঙ্গে দুটো টোটা। আরো দুটো বন্দুক এনে তাতেও বারুদ আর টোটা ভরে হাতের কাছে তৈরি রাখলাম। তারপর তাক করলাম। মাথা দেখা যায় না। এক পা তুলে নাকের সামনে দিয়ে আড়াল করে রেখেছে এমনভাবে যাতে মাথার মাঝখানে দৃষ্টি স্থির করতে অসুবিধা হয়। তবু সেই অবস্থাতেই ঘোড়া টিপলাম। তাতে লাগল হাঁটুর কাছে। গর্জে উঠল। উঠে দাঁড়াতে গেল তৎক্ষণাৎ। পারল না। দেখলাম সামনের ডান পাটা ভেঙ্গেছে। তারপর সে কী ডাক! আমি জীবনে এমন সিংহ-গর্জন শুনি নি। তখন আরেকটা বন্দুক নিয়ে কপাল তাক করলাম। সে তখন বনের দিকে চলে যাবার জন্যে মুখ ফিরিয়েছে। অমনি টিপলাম ঘোড়া। ব্যস জন্ম। মাথার মাঝখানে গিয়ে বিধল। মুহূর্তে ছিটকে পড়ল মাটিতে। দেখি হাত পা দাপাছে খুব। শেষ মুহূর্তের ছটফটানি যাকে বলে। বাঁচার জন্যে সংগ্রাম। এতে লাভ নেই কোনো, আমি জানি। তখন দেখি জুরি উঠে দাঁড়িয়েছে। বলল, যাব এবার আমি? বললাম, যাও। তখন বাকি বন্দুকটা নিয়ে এক হাতে জল সাঁতরে গেল ডাঙ্গায়, বন্দুকের নল কানে লাগিয়ে ঘোড়া টিপল। ব্যস শেষ।

নিষ্পন্দ নিখর হয়ে পড়ে রইল বিশালকায় জীবটা।

শিকারের মতো শিকারই বটে। আচ্ছা আচ্ছা শিকারিও অবাক হয়ে যাবে তার আকৃতি দেখে। কিন্তু এটুকই। ঐ বাহবাই সার। মাংস তো খাবার উপায় নেই। শুনেছি সিংহের মাংস কেউ খায় না। অকারণ ছ ছটা টোটা নষ্ট করলাম এই জন্যে। কত মূল্যবান আমাদের কাছে এখন টোটা বারুদ! জুরি বলল, আমাকে কুড়ুলটা দিন। বললাম, কেন? বলল, যাথাটা কেটে আনব। আমার ভারি ইচ্ছে করছে। তখন কুড়ুল দিলাম। তবে কাটল না যাথা। একখানা পা শুধু আসার সময় কেটে নিয়ে এত। আমি বললাম, শুধু পা কেন, চল না ছালটাও ছাড়িয়ে নিই। তখন দুজন মিলে বসলাম চামড়া ছাড়াতে। সে কি আর দু দশ মিনিটের কাজ! বলতে গেলে সারা বেলাটাই লেগে গেল। আমি তো আর ওস্তাদ নই, তবে জুরি কিছুটা পারে। ছালটা এনে বজরার চালে বিছিয়ে দিলাম। দুদিনেই রোদ পেয়ে শুকিয়ে একেবারে খটখটে। তখন সেটা বিছানায় পেতে দিলাম। শুতে যা আরাম!

এরপর দশ বার দিন আর বিশ্রাম নেই। নাগাড়ে চলা। চলেছি সিধে দক্ষিণ মুখো। খাবার দাবারের সঞ্চয় কমে আসছে। মাঝে মাঝে ডাঙায় নেমে জল নিয়ে আসি টিনে ভরে। ফের শুরু হয় চলা। নজর আমার যেন তেন প্রকারে গান্ধিয়া বা সেনেগাল নদীর নাগাল পাওয়া। দুটোর যে কোনোটা ধরেই যাওয়া যায় ভার্দ অস্তরীপে। সেখানে আমার স্থির বিশ্বাস ইউরোপের কোনো না কোনো জাহাজ পেয়ে যাব। আসে ওরা দল বেঁধে এখানে ব্যবসা করতে। গিনিতে যায়, ব্রাজিলে যায়, ইন্ট ইন্ডিজে যায়। যে কোনো একটা পেলেই হল। বুবিয়ে বললে কেউ তো আর নিতে আপত্তি করবে না। এবং বোঝাতে যে পারব আমার দুরবস্থার কথা, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।

বার দিন পর যে অঞ্চলে এসে পৌছলাম, সেখানে মানুষ থাকে। তার নানান প্রমাণ আমরা পাই। এমনকি কোনো কোনো জায়গায় আমাদের দেখবার জন্যে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম অনেক মানুষ। গায়ের রৎ কুচকুচে কালো আর উলঙ্গ একদম। পরনে এতটুকু ন্যাকড়া অব্দি নেই। একবার ভাবলাম যাই ওপরে, ওদের সঙ্গে একটু খাতির জমাবার চেষ্টা করি। জুরি বলল, খবরদার যাবেন না। যে কোনো বিপদ হতে পারে। কথাটা মন্দ বলে নি। চিনি না জানি না—কত কিছি তো শুনি এইসব মানুষ সম্পর্কে। অবশ্যি দাঁড়িয়ে আছে সার বেঁধে, নির্দোষ ভালোমানুষ চেহারা, কোনো অস্ত্র নেই কারো সাথে, শুধু একজনের হাতে একটা লাঠি। জুরি বলল, ওটা বল্লম। ভীষণ ধার। আর অব্যর্থ ওদের টিপ। চোখের নিম্নে ধাঁ করে ছুড়ে দেবে। আপনি ডাইনে বাঁয়ে সরে আত্মরক্ষা করার সুযোগটুকুও পাবেন না। তা সেদিকে আমার গোড়া থেকেই নজর আছে। ডাঙার একটু দূরে ফেলেছি নোঙর। নাগালের মোটামুটি বাইরে। স্থির হয়ে আছে বজরা। ওরাও স্থির। দেখছে আমাদের কৃত্তৃলী দৃষ্টিতে। তখন ইশারা করে বললাম, একটু কিছু খাবার কি পাওয়া যাবে? অমনি একজনকে কী যেন বলে দিল। ছুটে গিয়ে সে নিয়ে এল খানিকটা মাংস। সঙ্গে কিছুটা যব। কিন্তু নেব কীভাবে? উপরে উঠতে যে সাহস হয় না। তখন বজরা খানিকটা এগিয়ে পালটা কাত করে এগিয়ে দিলাম। অনেকটা হাতার মতো। তারই উপর ইশারায় দিতে বললাম সব। বুঝল না ইশারার মানে। রাখল ডাঙার ধার দেয়ে। কিন্তু যাই কী করে আনতে! মনে যে ভয়। হয়ত বুঝে থাকবে আমাদের মনের কথা। তখন সার বেঁধে একটু একটু করে পিছু হটে সবাই দূরে গিয়ে দাঁড়াল। আমি গিয়ে নিয়ে এলাম খাবার। বজরায় ফিরে আসার সাথে সাথে ওরাও ফের আগের জায়গায় ফিরে এল।

ধন্যবাদ জানলাম মাথা ঝুকিয়ে। এছাড়া দেবার কিছুই নেই। খেলাম মাংস। বজরা তখনো নোঙ্গর করা। শুয়ে আছি দুপুরে পাটাতনের উপর। হঠাৎ শুনি তুমুল কোলাহল। দেখি ভয়ে যে যার দিঘিদিক জ্ঞানশূন্য অবস্থায় পালাচ্ছে। আর পাহাড়ের দিক থেকে ছুটে আসছে একজোড়া অতিকায় জীব। অপাং করে নামল এসে জলে। একটা সাঁতরাতে সাঁতরাতে চলে গেল ঐ দিকে, আর একটা দেখি গুটি গুটি আমাদের বজরার দিকেই এগোয়। জুরিকে ইশারা করতে জুরি এগিয়ে দিল বন্দুক। শোয়া অবস্থাতেই বারুদ পুরলাম, তারপর বাকি দুটোতেও পোরা হল টোটা আর বারুদ। তাক করলাম মাথার দিকে। আর যখন সামান্য খানিক দূরে, তখন ঘোড়া টিপলাম। অব্যর্থ নিশানা। লাগল মাথার ঠিক মাঝখানে। একলাফে উঠল একবার জলের উপর, তারপর ডুব। অর্থাৎ অবস্থা কাহিল। তখন দেখি জলের মধ্যে তোলপাড় খাচ্ছে। সেই অবস্থাতেই এগোবার চেষ্টা করছে ডাঙার দিকে। সে কি আর পারে। প্রাণটা যে বড় ক্ষণস্থায়ী। একটু পরে জলের মধ্যে যে শেষ ডুব দিল, অর উঠল না।

এদিকে ডাঙার উপর তখন আর এক অবাক করা কাণ। শব্দ শুনে সবাই তো ভিমরি খাবার যোগাড়। কয়েকজন দেখি আতঙ্কে মাটির উপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়েছে। হফত অজ্ঞান। বাকিরা অবাক চোখ নিয়ে বারবার দেখছে আমাদের দিকে আর গুটিগুটি এগিয়ে এসে ভিড় করছে। জঙ্গুটা বলতে গেলে ওদের চোখের সামনেই মরল। তখন হৈ হৈ করে নেমে পড়ল একদল জলে। খোঁজ খোঁজ। জলের মধ্যে হাতড়ানি। পায় না খুঁজে। পাবে কী করে, জানে না তো সঠিক জায়গাটা কোথায়। সেটা আমি জানি। রক্ত নিচ থেকে উঠছে ঘুলিয়ে ঘুলিয়ে, ওখানেই মরে পড়ে আছে সে। তখন জায়গাটা ইশারায় দেখিয়ে দিলাম। খুঁজে পেয়ে সে যা খুশি! কিন্তু পারে না টেনে তুলতে। তখন দড়ি দিলাম ছুড়ে। তাই দিয়ে বিঁধে টানতে টানতে শুপরে তুলল। দেখে আমিও অবাক। এ যে চিতা। এত বড় হয় নাকি চিতা বাধ! ওরাও দেখা ইঙ্গিত আঙ্গাদে আটখানা। নেচে কুঁদে ভঙ্গি করে সে যা উল্লাস, আমাদের উদ্দেশে যা অভিনন্দনের বহর।

আর একটা চিতা ততক্ষণ পালিয়েছে। গুলির শব্দ, আলোর ঝলকানি আর জনগণের উল্লাসে বেধহয় মাথা ঠাণ্ডা রেখে দাঁড়িয়ে থাকার সাহস পায় নি। জল থেকে তড়িঘড়ি উঠে সিধে পালিয়ে গেছে পাহাড়ের দিকে। এদিকে মরা চিতাটা নিয়ে গোল হয়ে বসে গেছে তখন যাবৎ মানুষ। কাটছে টটকা টটকা মাংস, তাই কঁচা কঁচা চিবিয়ে খাচ্ছে। মাঝে মাঝে চোখ পিটপিট করে তাকায় আবার আমার দিকে। যেন নীরব চোখের ভাষায় বলতে চায়—এই যে খাচ্ছি আমরা, আপনার সম্মতি আছে তো? আছে!—আমি হাত তুলে জানান দিলাম। তখন আর এক দফা উল্লাসের ঘটা। নতুন করে আরো একবার হংস্যাড়। বলব কী, সে যা চটপট কাজ ওদের! ছুরি নেই, কাটারি নেই, শুধু কাঠের এক টুকরা ধারাল খস্তা মতো, তাই দিয়ে চোখের নিমিয়ে ছাড়িয়ে ফেলল পুরো ছাল। খানিকটা মাংস কেটে আমাদের দেবে বলে ইশারা করল। আমরা না করলাম। আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে বললাম, বরং ছালটা কি পাওয়া যেতে পারে? ওরা তো তাতে আরো খুশি। যেন কৃতার্থ। অমনি চটপট ছাল দিয়ে গেল আমাদের বজরায়। সঙ্গে আরো নানান ধরনের খাবার। তখন ইশারায় খালি জলের টিনটা উপুড় করে বললাম, একটু জল কি পাওয়া যেতে পারে? অমনি দুই মহিলাকে ডেকে কী যেন বলল। দেখি এক মুহূর্ত পরে তিনটে মাটির কলসীতে করে জল নিয়ে হাজির। রেখে চলে গেল। ব্যস, আমরাও নিশ্চিন্ত।

তবে আর না। এবার রওনা হতে হবে। বিদায় নিলাম নিশ্চো বন্দুদের কাছ থেকে।

আমাদের প্রচুর খাবার তখন মজুত। সঙ্গে দুটিন জল। এতদিন পরে যাহোক তবু মানুষের দেখা তো পেলাম। এটাও আমাদের কাছে বড় সান্ত্বনা। বলতে পারা যায় শক্তি। ভেসে পড়লাম ফের। ডাঙাৰ ধার থেঁথে টানা প্রায় এগার দিন। সমৃদ্ধ এখানে ভারি শান্ত। ডাইনে একটা দ্বীপ। আমি জানি এটাই ভাৰ্দ্বান্তৰীপ অঞ্চল। অজস্র দ্বীপ এখানে মালাৰ মতো চারধাৰে ছড়ানো ছিটানো। দ্বীপগুলোকে বলে ভাৰ্দ্ব দ্বীপপুঞ্জ। তবে দূৰ অনেকখানি। একদম কাছে মনেহয় যেটা, সেটাও প্রায় ডাঙা থেকে চার পাঁচ ক্ষেত্ৰের মতো। যাওয়াৰ ভারি হিচে হল। কিন্তু নিৱৰ্পায়। হাওয়াৰ বিপৰীতমুখে চলতে গেলে জানি না কখন পারব পৌছুতে। তদুপৰি ডাঙা থেকে মাইলখানেক দূৰে কখন ঝড় ওঠে, তুফান ছোটে—তাই বা কে বলতে পারে!

কী কৰব কিছুই ঠিক কৰতে পারছি না। নিঃশব্দে কেবিনে গিয়ে বসলাম। তোলপাড় খাচ্ছে একেৰ পৰ এক ভাবনা। জুৰিৰ হাতে হাল। হঠাৎ চিৎকাৰ কৰে উঠল,—কৰ্তা, দেখুন একটা জাহাজ! উল্লাসেৰ চিৎকাৰ নয়, ভয়েৰ। বলা যায় আৰ্তনাদ। ভেবেছে বুঝি সদাৰ লোক পাঠিয়ে দিয়েছে জাহাজে কৰে, আমাদেৰ ধৰে নিয়ে যাবাৰ জন্যে। আমি অমনি এক লাফে বাইৱে এলাম। দেখি জাহাজই বটে, পতুগিজদেৱ। গিনিৰ দিকে যাচ্ছে বলে প্ৰথমটা মনে হল। পৰে বুঝলাম অনুমান ভুল। অন্য কোথাও চলেছে। গিনিৰ দিকে হলে অমন মাঝ দৱিয়া দিয়ে যেত না, বৰং কূলেৰ খানিকটা কাছ থেঁথেই চলত।

মনে আশাৰ উভাদনা অথচ নিৱৰ্পায়। ভেবে দেখুন আমাৰ অবস্থা। কথা বলব ভারি হিচে, কিন্তু সম্ভব নয়। শুনতে পাবে না এতদূৰ থেকে আমাৰ ডাক। যদি সব পাল তুলে দিই, তাহলেও পারব না জাহাজেৰ কাছাকাছি পৌছতে। তাৰ আগেই ওৱা আৱো অনেক দূৰ চলে যাবে। কী কৰি এখন, কী উপায়! তখন মৰীয়াৰ মতো বজৱাৰ উপৰে উঠে নানাবৰকম ইশাৱা কৰতে লাগলাম। তাতে কাজ হল। দূৱীৰ দিয়ে দেখতে পেলো আমাকে। তখন বেগ কমাল। স্থিৰ প্ৰায় তখন সমুদ্ৰেৰ উপৰ। যেন ভাসমান ছবি। আমি উপৰ মুখ কৰে বন্দুক ছুড়ে জানান দিলাম আমৱা এক্ষুনি যাচ্ছি। পৰে শুনেছি ওদেৱ মুখে, বন্দুকেৱ আওয়াজ নাকি শুনতে পায় নি। ধোঁয়া দেখেছে। আৱ নৌকা দেখে ভেবেছিল ইউৱোপেৰ কোনো মাঝি। হয়ত জাহাজেৰ সঙ্গেই ছিলাম। যে কোনো কাৰণে জাহাজ থেকে নেমে পথ হারিয়ে ফেলি।

সে যাই হোক, দুজনে সমানে দাঁড় বেয়ে পৌছলাম যখন জাহাজেৰ কাছে, তখন আমাদেৱ কাহিল অবস্থা। তিনটি ঘণ্টা লেগেছে প্ৰায় আসতে। কাহিল হলেও মনে আশাৰ আলো। যাক, এতদিন পৰে ফেৱাৰ তো একটা উপায় হল।

আমাকে জিজ্ঞেস কৰল কে আমি, কী আমাৰ পৱিচয়। আমি তো ছাই কিছুই বুঝি না। বেশিৰ ভাগ নাবিক জানে পতুগিজ ভাষা, নয়ত ফৱাসি, নয় স্পেন দেশেৰ। ইংৰেজি যে বোঝে না কেউ। শেষে নিয়ে এল স্কটল্যান্ডেৰ এক নাবিককে। ভাগিয়স ছিল সে তাই বাঁচোয়া। বললাম সব। কেমন কৰে দু বছৰ পৰ পালিয়েছি, প্ৰভুৰ গৃহে কী কী আমাকে কৰতে হত, কী সেই প্ৰভুৰ প্ৰকৃত পৱিচয়—কিছুই বাদ দিলাম না। শুনে নিৰ্ভয়ে নিশ্চিন্তে আমাকে জাহাজে তুলে নিল।

সে যা খুশি আমাৰ! যা আনন্দ! বলতে গেলে অসীম দুর্দ্বাৰ হাত থেকে অব্যাহতি। মত্ত্যুৰ কোল থেকে ফিৰে আসা। আনন্দেৰ চোটে কী কৰব ভেবে পাই না। তখন কাণ্ঠেনকে বললাম, আমাদেৱ বজৱায় যা যা আছে সব আপনি নিয়ে নিন। আমাৰ আৱ কিছুই চাই না। শুধু মুক্তি চাই। শুনে ভাৱি মিষ্টি কৰে বললেন, তাৱ কোনো কিছুৱই

দরকার নেই। সব রইল বজরায়। বজরা জাহাজের সাথে বেঁধে নেওয়া হল ব্রাজিলে পৌছে সব আবার আমাকে দিয়ে দেবেন। বললেন, দেখ, তোমাকে যে রক্ষা করেছি তার পেছনে কোনো মতলব বা দুরভিসংক্ষি নেই। এটা মানুষেরই কাজ। আগামী দিনে বলা যায় না হয়ত আমারও এই দুর্দশা হতে পারে। তখন তুমি আমাকে রক্ষা করবে। ব্যস্ সব শোধ। আমি তবু নাছোড়বান্দা,—না না, তা হয় না, অন্তত যা আছে আমাদের তার কিছুটা নিন। বললেন, সেটাও হবে অবিবেচনার কাজ। আমি তোমাদের নামিয়ে দেব ব্রাজিলে। কিন্তু তারপর? আরো তো অনেকখানি যেতে হবে তোমাদের। সে রসদ কোথায় পাবে? বরং যা আছে সব বিক্রী করলে বিস্তর টাকা রোজগার হবে। তাই নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেও। এই আমি মনেপাণে চাই।

বলব কী, সে যেন দয়ার পরাকাস্থ। যেন মূর্তিমান প্রেম ভালবাসা আর ত্যাগের আশ্চর্য এক সমবয়। দূরদর্শিতাও খুব। যদি পাছে অন্য কোনো নাবিক আমাদের জিনিস জুরি করে নেয়! পড়ে থাকবে বজরায়—সবার তো সব সময় খেয়াল থাকবে না। তখন সব কিছু জাহাজে তুলে কী কী আছে তার একটা তালিকা বানালেন। দু দফা। একটা আমাকে দিলেন আরেকটা নিজের কাছে রাখলেন। মালপত্র সব রাখা হল জাহাজের গুদাম ঘরে। সে ভীষণ সুব্যবস্থা। বললেন, এই তালিকা মিলিয়ে সব জিনিস তুমি ব্রাজিলে গিয়ে ফেরত পাবে। এটা যত্ন করে রেখো। তালিকায় আমাদের সেই যে তিনটি মাটির কলসী পেয়েছিলাম নিগ্রোদের কাছ থেকে, দেখি তারও উল্লেখ আছে।

বজরার ব্যাপারে আমাকে বললেন, এক কাজ কর ওটা আমাকে বিক্রী করে দাও। আমার জাহাজের কাজে লাগবে। কত দাম নেবে? কী বলব দাম! এমন সদাশয় মানুষ, এত দয়া, এত উপকার করছেন আমাদের আমি কি পারি তার কাছে থেকে লাভ করতে বা কোনো মন্ত একটা দাম হাঁকতে। বললাম, আমি কিছু জানি না। আপনার যা ইচ্ছে হয় আমাকে দেবেন। চাই কি এমনিও নিয়ে নিতে পারেন। বললেন, না না, তা হয় না। দাম তোমাকে নিতেই হবে। বলে একখানা হৃদি লিখে দিলেন। ব্রাজিলের অফিসে সেটা দেখালে আমাকে ছশ চাপ্পিশ তঙ্কা দেবে। বললেন, এর চেয়ে যদি দাম কেউ দিতে চায়, তবে চিন্তা নেই, সেটাও তিনি আমাকে ব্রাজিলে পৌছে উশুল করে দেবেন। জুরির জন্যেও দাম ধরে দিলেন চারশ আশি তঙ্কা। এটা নিতে হাত আমার মোটে উঠতে চায় না। আমার সঙ্গী, আমার দুঃসময়ের সাথী। তাকে কিনা টাকার বিনিময়ে বেচে দেবে! ক্রীতদাসত্ত্বের ভাগীদার করব! বললেন, তোমার কোনো চিন্তা নেই। সে অর্থে ক্রীতদাস আমি ওকে করব না। খাটবে জাহাজে কাজ করবে তার বিনিময়ে উপযুক্ত পারিশুমির পাবে। সে-ও মোটে দশ বছরের জন্যে। তার মধ্যে যদি ও খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করে, তবে ওর মুক্তির কোনো বাধাই থাকবে না। জুরিকে জিজ্ঞেস করতে বলল সে রাজি। এই শর্তে তার কোনো আপত্তি নেই। তখন জুরিকে তাঁর হাতে তুলে দিলাম।

নির্বিশ্বেই পৌছলাম ব্রাজিলে। জায়গাটার নাম সালভাদোর। বাইশ দিন মোট লাগল সময়। হিসেব নিকেশ চোকানো হল। সবই ভালো। শুধু আমার তরফে একটাই চিন্তা। ফের ভাগ্যের হাতে পড়লাম আমি। জানি না আগামী দিনে ভাগ্য টেনে নিয়ে যাবে আমাকে কোথায়।

ভুলব না কাপ্তেনের কথা। আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না। এমন দয়া এমন পরোপকার আমি জীবনে দেখি নি। বহু পীড়াপীড়ি সঙ্গেও এক আধলা নিলেন না আমার কাছ থেকে ভাড়া বাবদ। উলটে দিলেন আরো অচেল। চিতাবাঘের ছালটার জন্যে দিলেন

বিশ তঙ্কা, আর সিংহের ছালের জন্যে চল্লিশ। বজরার প্রতিটি জিনিস আমি তালিকা মিলিয়ে ফেরত পেলাম। বললেন, বল এবার, যা আছে তোমার তার মধ্যে কী কী জিনিস তুমি বেচতে চাও। সব আমি কিনে নেব। তখন দুটো বন্দুক, সেই মোম, শিশি বোতল সব মিলিয়ে দাম দিলেন মোট সতেরশ ষাট তঙ্কা। আমিও ঝামেলা থেকে মুক্ত। হৃদয়ের আন্তরিক ভালবাসা জানিয়ে সবার কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

তা আমি তো বাসিন্দা নই এখানকার, সবাই তাই আমাকে চেনেও না। একখানা পরিচয় পত্র দিয়েছিলেন সেই সদাশয় কাপ্তেন। তারই জোরে সজ্জন এক ব্যক্তির সাথে পরিচিত হলাম। অমায়িক এবং এক কথায় ভদ্রলোক বলতে যা বোঝায়। ছোটো ব্যবসা। একই সাথে আখের চাষ আর আখ থেকে চিনি তৈরির কারবার। আমাকে প্রথম দিকে তার বাড়িতেই ঠাই দিলেন। শিখলাম সব। কেমন করে চাষ করতে হয়, কেমন করে চিনি তৈরি করে, কী তার কৌশল—সমস্ত কিছু। ব্যবসা হিসেবে চমৎকার। খুব ছোটো থেকে আরম্ভ করে অনেকেই এখন বিরাট ধনী হয়ে গেছে। ঠিক করলাম, আমিও এই ব্যবসা শুরু করব। তখন সব ব্যবস্থা তিনি করে দিলেন। এমনকি জামি কেনা থেকে কল কিনে দেওয়া অন্তি। টাকা আমিই দিলাম। আরো টাকার দরকার। কেননা কল চালু হলে অনেক টাকা হাতে মজুত রাখতে হবে। আমার তো সেই বন্দুর স্ত্রীর কাছে গচ্ছিত আছে তিনশ পাউন্ড। ভাবলাম, এক কাজ করি। এই সুযোগে তার কাছে আমার প্রাপ্য টাকা চেয়ে পাঠাই।

আমার পাশেই যার জমি, সে পতুগিজ। লিসবনের লোক। আমারই মতো ভাগ্যতাড়িত অবস্থায় এখানে এসে পৌছেছে। বাবা মা কিন্তু ইংরেজ। নাম ওয়েলস্। ভারি খাতির জমে গেল তার সাথে। দুজনে দুজনকে ডাকতাম মিতে বলে। তা দুজনেই আমাদের পুঁজি কম। কী আর করি, জমি তো শুধু শুধু ফেলে রাখা যায় না। খাদ্য শস্যের চাষ করতাম। একবার তামাকও বুনলাম। ক্ষতি তো কিছু নেই। বরং যা দুচার পয়সা আসে সেটাই লাভ। মন্দ হল না ফলন। অর্থাৎ চাষের উপযোগী জমি এতদিনে প্রস্তুত। এবার দেদার আখ ফলবে, সবাই বলল। কিন্তু পারি কি একলা অতখানি জমিতে একা হাতে চাষ করতে! একজন কেউ সাহায্যের লোক থাকা দরকার। তখন জুরির কথা ভেবে আফশোস হল খুব। ইস্ত যদি জুরি থাকত এখন আমার কাছে!

ফলে গড়িয়ে গড়িয়ে চলা যাকে বলে সেই টানা হ্যাচড়া, সেই গতির নামে দুগতি। আমার ভাগ্যটাই যে এই রকম। খুব একটা বেশি হবে কী করে! সব ছেড়ে ছুড়ে এসেছি অজানার ডাকে। বাবার আদেশে কান দিই নি। বারবার বলেছিলেন বাবা, দেখেরে ঘরে থাক। এখানেই যা হবার হবে। শুনি নি সে নির্দেশ। কিন্তু এখানে এসেই বা অন্য কী পেলাম। সেই তো মধ্যবিত্তের জীবন। সেই না উচু না নিচু মাঝখানের অবস্থা। তবে কেন মরতে এই পাঁচ হাজার মাইল দূরে রয়ে গেলাম।

অর্থাৎ দুঃখ যাকে বলে। নিজের অবস্থা নিয়ে নিজেরই মনে হাহাকার। আর যাতনা। ভালো লাগে না একদম। কাউকে বোঝাতে পারি না নিজের মনের কথা। শুধু মিতের সঙ্গে যা একটু গল্পসল্প হয়। তা তারও তো একই হাল। এ যেন নির্জন কোনো দ্বীপে বাস করার সামিল। বুদ্ধি যে দেবে এমন মানুষেরও যেন অনটন। মোটমাট সুখী নই আমি আমার অবস্থানে। মাঝে মাঝে মনে হয় হয়ত জীবনটা আমার এই ভাবেই চলবে। সুখ বা স্বাচ্ছন্দ্য হয়ত কোনোদিনই আসবে না।

এরই মধ্যে সাঞ্চনা এই, আমার সেই সদাশয় কাপ্তেন বন্দুটি আবার সমুদ্র যাত্রায়

যাবেন। এবারের গন্তব্যস্থল লন্ডন। তিনমাস ধরে চলছে তারই প্রস্তুতি। জাহাজে মাল বোঝাই হচ্ছে। একদিন এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। বললেন, তুমি আমাকে বরং একখানা চিঠি লিখে দাও। বলেছিলে, কার কাছে যেন টাকা রাখা আছে তোমার। আমি চিঠি দেখিয়ে টাকা নিয়ে আসব। ব্যবসায় লাগালে আরো লাভ পাবে। তবে নগদে এনে তো লাভ নেই। এখানে চলে না সে টাকা। বরং কিছু মালপত্র কিনে আনব। সেগুলো এখানে বিক্রী করে তুমি নগদ পাবে। পুরোটা আনব না। লিখে দাও একশ পাউন্ড। কেননা বলা যায় না, সমুদ্রের খেয়াল, আসার পথে হয়ত আমার জাহাজভুবি হল। সে অবস্থায় তিনশর মধ্যে একশ তোমার নষ্ট হবে। বাকি দুশ তো থাকবে। সেটা পরে অন্য কাউকে দিয়ে তুমি আনিয়ে নিতে পারবে।

সদাশয় মানুষ বলেই এত চমৎকার পরামর্শ দিলেন। আপনি করার কী থাকতে পারে! লিখে দিলাম চিঠি। একশ পাউন্ড দেবার কথা বলে দিলাম কাপ্তেনের হাতে। সঙ্গে আমার নিজের সম্বন্ধেও অনেক কিছু লিখে পাঠালাম।

সব। আমার সমুদ্রযাত্রার বিবরণ, দস্যুদলের আক্রমণ, আমার বন্দীদশা, দাসত্ব, সেখান থেকে পলায়ন, পতুগিজ জাহাজের কাপ্তেনের সঙ্গে পরিচয়, তার দয়া, আমার বর্তমান অবস্থা—কোনো কিছুই বাদ দিলাম না। লিখালাম কেন আমার টাকার দরকার। তা লিসবন থেকে যখন ফিরে এলেন কাপ্তেন, দেখি সঙ্গে নানান উপহার, আর একশ পাউন্ড দিয়ে কেনা নানান সামগ্রী। চাষের কাজের জন্যে বিস্তর যন্ত্রপাতিও এনেছেন। সেগুলো আমার খুব কাজে লাগবে। বাড়তি কিছু টাকাও দিলেন হাতে। বললেন, কাজের লোকের তো খুব দরকার তোমার। এই টাকা দিয়ে কাজের লোক রেখো। ছ বছরের চুক্তিতে মজুর পাওয়া যাবে এই টাকায়। বাড়তি দাবীর মধ্যে শুধু তামাকের নেশা। সেটা ক্ষেতের তামাক দিয়েই পূরণ হবে। এদিকে জিনিসপত্র বিক্রী করেও ভালো টাকা পেলাম। সবই ইংল্যান্ডে তৈরি। এদেশে তার ভালো বাজার। তার মধ্যে আছে কাপড়, নিত্য ব্যবহার্য টুকিটাকি জিনিস, বাসনপত্র আরো অনেক কিছু। ভালোই আমদানি হল বিক্রী করে। প্রায় চারগুণের মতো লাভ। মিতের চেয়ে অবস্থা আমার এখন দ্বন্দ্বের মতো ভালো। নিশ্চে দাস নিলাম একজন। আমার কাজে সহায়তা করার জন্যে। আর একজন ইয়োরোপীয় ভৃত্য। ঘোটের উপর সব দিক থেকে আমি এখন নিশ্চিন্তই বলা চলে।

তবে ঐ যে বলে না—অনেক ভালোও ভালো নয়, তাই হল আমার শেষ অঙ্গি। পরের বছর খুব ভালো চাষ হল। যেমন আখ, তেমন তামাক। তামাকের ইট তুলে দিলাম জাহাজে। বিনিময়ে দিল টাকা। আমার তখন খুশি আর ধরে না। নানান পরিকল্পনা মাথার মধ্যে ঘূরপাক খেয়ে বেড়ায়। নতুন করে উৎসাহ পাই। আর কেবল মন ফের কোনো সমুদ্রে ভেসে পড়ার জন্যে ছটফট করে ওঠে।

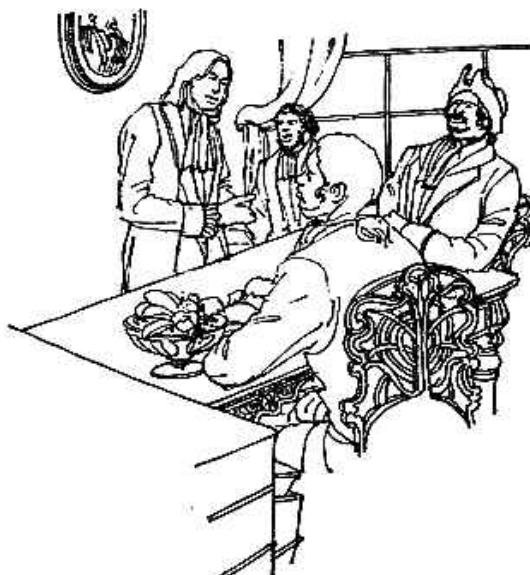
সব নষ্টের মূলে আমার এই অস্তির মতিত্ব। থিতু হয়ে যে থাকতে পারি না কোনো জায়গায়। কোনো কিছুই দীর্ঘদিন ভালো লাগে না। এ যেন জ্বালা বিশেষ। এই তো দেখুন না, ব্যবসায় লাভ হয়েছে প্রচুর, মোটামুটি দুজন কাজের লোক, জমিজমা নিয়ে সুখেই আছি, আরো সুখ আসবে আগামী দিনে। আমি যদি লেগে থাকি তবে। কিন্তু ঐ যে চঞ্চলতা। ঐ যে ভেতরে ভেতরে একটা ছটফটানি। সেদিক থেকে বিচার করলে আমি নিজেই আমার যাবতীয় দুর্ভাগ্যের নিয়ন্তা। ভুলের পর ভুল কেবল করেই চলি। শেষ আর হয় না। দুঃখ তাতে দ্বিগুণ হয়। কষ্ট তাতে বাড়ে। আমি নির্বিকার। হয়ত শুনে আপনারা বলবেন বোকামি। এভাবে অনিদেশ সমুদ্রযাত্রায় ভেসে পড়াটা কোনো বুদ্ধিমান মানুষেরই

কাজ নয়। জানি না কাজ কি অকাজ। তবু ঘরে বসে থাকতে মন চায় না যোটে। ঘরে বসে নিজের ভালো করতে ইচ্ছে হয় না। দুনিয়াটাকে দেখব এটাই আমার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা। আমি মনে করি আমার জীবদ্ধায় এই আমার অন্যতম কর্তব্য এবং দায়িত্ব।

মোচমাট তাড়িয়ে বেড়াতে শুরু করেছে আমাকে সেই পুরানো ইচ্ছা। বাবা মাকে ত্যাগ করে চলে এসেছি যে ইচ্ছার বলে। সুধী থাকতে আর মন চায় না। একটু একটু করে বড় হব ধনী হব, একটু একটু করে আমার ব্যবসা বাড়বে, এতে আমি তপ্ত নই। আমি চাই চটপট নিজের ভাগ্য ফেরাতে। তার জন্যে অভিযানে যেতে চাই। তাতে খুঁকি অনেক, দুঃখ বিস্তর আমি জানি। তবু বেপরোয়া আমার মন। কোনো দুঃখ বরণ করতেই আমি পিছপা নই।

অসঙ্গক্রমে কয়েকটি কথা বলে নিই।

ব্রাজিলে কাটল আমার টানা চার বছর। মোটের উপর ভালোই চলছে আমার চাষের



... তখন তো এই সব সম্পত্তি বিলি বন্দোবস্ত বা বিক্রির প্রয়োজন হবে

কাজ। ভাষাটা এতদিনে বেশ রপ্ত হয়েছে। বস্তুত হয়েছে বিস্তর মানুষের সঙ্গে। তার মধ্যে কিছু কিছু ব্যবসায়ী বন্ধুও আছে। তারা মূলত সালভাদোরের বাসিন্দা। বন্দর তো। মাল চালান দেবার প্রয়োজনে আমাকে প্রায় তাই যাতায়ত করতে হয়। খোসগল্পের আসর বসে। বলি আমার সমুদ্রযাত্রার কাহিনী। সুলভে স্বর্ণরেণু আনার গল্পও বলি। তাছাড়া আরো যে সব ব্যবসা চলে গিনিতে ছুরি কাঁচি খেলনা পুঁতি কুড়ুল—তারও বিবরণ দিই। বিনিময়ে মেলে গজদস্ত প্রভৃতি নানান মূল্যবান সামগ্রী। তাছাড়া নিশ্চোও ধরে আনা যায়। ব্যবসা হিসেবে সেটাও কিছু মন্দ নয়।

খুবই মন দিয়ে শোনে আমার কথা। আগ্রহ দেখি প্রচণ্ড। তবে নিশ্চো আনার ব্যাপারটা সম্বন্ধে একটু আপত্তি করে। এখনো রাজাৰ স্বীকৃতি মেলে নি এ ব্যাপারে। স্পেন বা পর্তুগালে এখনো এ ব্যবসা রমরমা নয়। তবু নিয়ে আসে কেউ কেউ নিজের প্রয়োজনে।

অথবা বিক্রী করলেও তাকে প্রয়োজন বলে দেখায়। মোটমাটি এভাবেই চোরাগোপ্তা পথে মানুষ বিক্রীর ব্যবসা চলে।

একদিন সকালে দেখি তিনি ব্যবসাদার আমার বাড়িতে এসে হাজির। মাত্র তার আগের দিনই এক ভোজের আসরে তিনজনকে শুনিয়েছি আমার সমুদ্রযাত্রার বিবরণ। নিশ্চো প্রসঙ্গও সেখানে স্বাভাবিক নিয়মে এসেছে। তো বলে, আপনার সঙ্গে গোপন কথা আছে। বললাম, কী কথা? বলল, এই ব্যবসা প্রসঙ্গেই আমাদের একটা প্রস্তাব আছে। সারারাত ধরে ভেবেছি আমরা তিনজন। এই যে এত বড় বড় ক্ষেত্র আমাদের, তাতে পারি না একশ হাতে চাষবাস করতে। পড়ে থাকে অচেল জমি। অনেকটা আপনারই মতো। এ অবস্থায় যদি কাজের প্রয়োজনে কিছু নিশ্চো আমরা নিয়ে আসি গিনি থেকে? আপনার কী মত? ভালো জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়ব। আপনিও আমাদের সঙ্গে থাকবেন। কেনাকাটার যাবতীয় দায়িত্ব আপনার। না না, টাকা আপনার লাগবে না, সব আমাদের। শুধু বুদ্ধি আপনার। আর কাজ হাসিল। বিনিময়ে আপনিও কিছু নিশ্চো পাবেন। এটা আপনার দন্তরী।

প্রস্তাব লোভনীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার বর্তমান অবস্থাটাও একটু ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে। এই তো ক্ষেত্র খামার সাজিয়ে বসেছি এখন—লাভ তো খুব একটা কম নয়, বরং ভালোই। বলা যায় জীবনে আমি এখন প্রতিষ্ঠিত। একশ পাউন্ড আনিয়েছিলাম ইংল্যান্ড থেকে, বাড়তে বাড়তে তাই এখন গিয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় চার হাজার পাউন্ডে। আমার তাবৎ সম্পত্তির এটাই এখন দাম। আরো বাড়বে ভবিষ্যতে। ব্যবসা আরো বড় হবে। সে অবস্থায় এর একটা সংগতি না করে আমি নড়ি কীভাবে এখান থেকে। সেটা কি আমার পক্ষে আদৌ সম্ভব?

অন্য কেউ হলে হয়ত এই অজুহাত তুলে যেত না। এখানেই থাকত। কালে দিনে আরো ধনী হত। একটু একটু করে বাড়িয়ে তুলতো নিজের সম্পদ। কিন্তু আমি মানুষটা যে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। নিজেই আমি নিজের সংহার কর্তা। তদুপরি অজানার নেশা তো আছেই। বললাম, যেতে আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু তার আগে আমার অনুপস্থিতিতে এই ক্ষেত্র খামার জমি জমা দেখাশোনার সু-বন্দোবস্ত করতে হবে। বলল, সেটা তারা করবে। তখন বললাম, কিন্তু আমি যদি আর না ফিরি। তখন এইসব সম্পত্তি বিলি বন্দোবস্ত বা বিক্রীর প্রয়োজন হবে। বলা যায় না, মারাও যেতে পারি। সে অবস্থায় দলিল করে দিয়ে যেতে চাই। বলল, ঠিক আছে, আপনার খুশিমতো তাহলে দলিল করুন। তখন লিখলাম, আমার অনুপস্থিতিতে যাবতীয় সম্পত্তির মালিক হবে আমার সেই রক্ষাকর্তা কাণ্ডেন এবং জমি বিলি, বন্দোবস্ত, বিক্রী চাষবাদ ইত্যাদি যে কোনো ব্যাপারে ঠিক আমার যা অধিকার, তারও তাই থাকবে। তার উপর নির্দেশ থাকবে সব বিক্রী করে দেবার এবং তা থেকে যা অর্থাগম হবে তার অর্ধেক নিজে রেখে বাকি অর্ধেক ইংল্যান্ডে বাবা মার কাছে নিচের ঠিকানায় পৌছে দেবে।

বলে বাবা মার নাম ঠিকানা দিয়ে সই করে দলিল শেষ করলাম।

মোটমাটি, সম্পত্তির ব্যাপারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা আমি নিয়েছি। আমি জানি না, অন্য কেউ হলে এই লাভের ব্যবসা ছেড়ে অজানা অনিশ্চিতের ডাকে এইভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ত কিনা। আমার ক্ষেত্রে সব ব্যাপারটাই অন্যরকম। আমি তো আর সুবে থাকব বলে জন্মাই নি। দূর্ভাগ্য আমার নিত্য সহচর। দেখা যাক, কোথায় কতদূরে কোন্ অনিশ্চিতের পানে ভাগ্য টেনে নিয়ে যায় আমাকে।

এখানে যুক্তি তুচ্ছ, ভাবনাটাই আসল। অর্থাৎ আমার কল্পনা। এদিকে জাহাজও তৈরি। ষোলশ উনষাট সালের ১লা সেপ্টেম্বর উঠে বসলাম জাহাজে। দিনটা ভালো নয়। অন্তত আমার কাছে। এই দিনই প্রথম সমুদ্রযাত্রায় বেরিয়ে ছিলাম আমি হলু থেকে। বাবা মায়ের সম্পূর্ণ অঙ্গাত্মারে। ঠিক আট বছর আগে সেটা। ফের চলেছি নতুন এক জাহাজে। তারিখ ছাড়া আর সব কিছুই আলাদা। দেখা যাক, এর শেষ কোথায় হয়।

একশ কুড়ি টনের মালবাহী জাহাজ। সঙ্গে ছাটা বন্দুক, চোদ্দ জন নাবিক, সারেৎ, আমি আর সারেঙ্গের ছোটো ছেলে। মালপত্র বিশেষ নেই। শুধু কিছু খেলনা সামগ্রী—পুঁতি, মালা, কাচের চুমকি, শামুকের খোলা, দূরবীন, ছুরি, কাঁচি, কুড়ুল—যা আর কি চলে ওখানে, নিশ্চেরা কেনে, বিনাময়ে অনেক দামী দামী জিনিস হাতে তুলে দেয়।

পাল তুলে প্রথম দিনই রওনা হলাম। এটা বিধি নয়। দু একদিন অপেক্ষা করে তারপর ভেসে পড়ার প্রথা। সে প্রথা এখানে অগ্রহ্য হল। চলল জাহাজ উত্তরমুখে। সামনে আফ্রিকা উপকূলের ম্যাপ খোলা। আমরা চলেছি দশ থেকে বার ডিগ্রী দ্রাঘিমা বরাবর। এভাবেই যায় সবাই। আবহাওয়া অত্যন্ত চমৎকার। গরমটা একটু বেশি। অগস্তিনো অন্তরীপ অন্দি বলতে গেলে কূলের কাছ যেঁধেই গেলাম। তারপর থেকে দূরত্ব বাড়তে লাগল। এবার যাব উত্তর পূর্ব দিকে। অর্থাৎ পথে পড়বে নোরোন্হার দ্বীপের সারি। পড়লও তাই। দ্বীপ রইল পূর্বদিকে, বার দিন লাগল মোট সেই এলাকা পার হতে। সোয়া সাত ডিগ্রী কোনাকুনি উত্তর মুখে এগোতে লাগলাম। তখন উঠল তুফান। টর্নেডো যাকে বলে। সে যা বাতাস, হাওয়ার যা চোট। বারটা দিন আমাদের আর নিজস্ব কিছু করণীয় নেই, শুধু হাওয়ার বুকে তুফানের বাপটে অনিদেশ ভেসে যাওয়া। কোথায় চলেছি কে জানে। পাগলা হাতির দাপট যে রকম। প্রতিমুহূর্তে মনে হয় এই বুঝি মৃত্যু হয় আমাদের, জাহাজ বুঝি ডুবে যায়। সমুদ্র গ্রাস করে নেবে সব কিছু। অসহায় বলতে ঠিক যা বোঝায় আমরা তাই। আমাদের জীবন মরণ এখন খোঁড়ো বাতাসের হাতে।

কিছু অঘটনও ঘটে গেল এই বার দিনে। একজন নাবিক মারা গেল সমুদ্রপীড়ায়। সারেঙ্গের ছেলে আর অন্য এক নাবিককে ভাসিয়ে নিয়ে গেল চেউ। বার দিনের দিন ঝড় শান্ত হতে দেখি, আমরা এগার ডিগ্রী উত্তর দ্রাঘিমা বরাবর কোনো স্থানে অবস্থান করছি। অগস্তিনো অন্তরীপ থেকে সেটা প্রায় বাইশ ডিগ্রী অক্ষাংশের তফাও। বরৎ একদিক থেকে মঙ্গলই বলতে হবে। কেননা এরই কাছাকাছি আমাদের গন্তব্যস্থল। ব্রাজিলের উত্তরাংশ সেটা। কিছু দূরে আমাজন নদী। গিনির উপকূল ভাগ। ওরোনক নদী আমাদের সামনে। এরা বলে মহানদী। সারেৎ বললেন, বলুন এখন কী করব। কোনদিকে যাব এবার? বেশি পথ যে পাড়ি দেওয়া সম্ভব না সেটা আমি জানি। কেননা জাহাজ ফুটো। ভাঙ্চুর হয়েছে বিস্তর। এ অবস্থায় কূলের ধার যেঁষে এগোনো ছাড়া গত্যন্তর নেই।

এটা সারেঙ্গেই প্রস্তাব। আমি বিরোধিতা করলাম। সামনে তখন আমেরিকার উপকূল ভাগের মানচিত্র পাতা। বললাম, এগিয়ে কোন দিকে যাব আমরা? এ অঞ্চলে কি জনবসতি আছে? ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঁজি অন্দি যেতে হবে তাহলে আমাদের। মানুষের মুখ প্রথম সেখানেই নজরে পড়বে। বরৎ বারবাড়োজ এখান থেকে কাছে, সে দিকে যাওয়াই মঙ্গল। মেঞ্জিকো উপসাগর এলাকায় পড়লে মন্ত অসুবিধে। জলের ভারি তোড়। জবরদস্তি দুকিয়ে নেবে ভিতরে। সে অবস্থায় আমরা অসুবিধেয় পড়ব।

মোটমাট যেখানেই যেতে চাই, অন্তত পনের দিনের পথ। এই পনেরটা দিন কারো সহায়তা ছাড়া আমরা চলতে পারব না। দুজন নাবিক মারা গেছে। সেই দুজনের ঘাটতি

পূরণ অবিলম্বে প্রয়োজন। তুপুরি জাহাজ সারাই করারও দরকার আছে।

সেই প্রস্তাবই গ্রাহ্য হল। উত্তর পশ্চিম দিকে চলল আমাদের জাহাজ। পশ্চিম প্রান্ত ঘৰ্ষে। ইংল্যান্ড দ্বীপ মালার দিকে এখন আমাদের মুখ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এর যে কোনো একটা দ্বীপে পৌছলে আমরা সংকট থেকে ত্রাণ পাব। কিন্তু সমুদ্রে কি আর মানুষের বিশ্বাস কাজ করে। সবই তো অজ্ঞান অনিদেশের খেলা। কখন ওঠে তুফান কখন ওঠে বড় কেউ বলতে পারে না আগে। হল তাই। আমরা তখন সোয়া বার ডিগ্রী দ্রাঘিমা বরাবর। হঠাৎ শুরু হল তুফান। ফের সেই দুর্দশা। নিজের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। সবই বড়ের উপর নির্ভর। জনবসতি এলাকা পার হয়ে চলেছি তীব্র গতিতে। ঘূরপাক থাচ্ছে জাহাজ। কে জানে হয়ত ভিড়ি গিয়ে কোনো এক অজ্ঞান দ্বীপে, সেখানে বর্বর নরখাদক মানুষ। জ্যান্ত কেটে কেটে থাবে আমাদের মাংস। আর কি নিষ্ঠার আছে।

তখন কে যেন হঠাৎ চিংকার করে উঠল—ডাঙ্গা, ডাঙ্গা! ঐ দেখ! দেখি বালিয়াড়ি। তাতে আটকে আছে আমাদের জাহাজ। কাত হয়ে আছে। তুফান তো তখনো চলছে সমন্বে। আর ঢেউ। সেই অবস্থাতেই মস্ত এক ঢেউ এসে বাঁপিয়ে পড়ল জাহাজের উপর। যেন গ্রাস করে নেবে সব কিছু। আর্তনাদ করে ভয়ে চোখ বুজলাম।

আমি ভাষায় সে অবস্থার কথা বোঝাতে পারব না। সেই অবস্থায় যে পড়ে নি, তাকে বোঝাবার চেষ্টা করাও বাতুলতা। জানিনা জীবন রক্ষা পাবে কী মারা যাব। জানি না এ কোন দ্বীপ, এখানে মানুষ থাকে কি থাকে না সেটাও অজ্ঞাত। জাহাজ যে চুরমার হয়ে যাবে এটা বুঝাতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু করবারও কিছু নেই। স্থির ভাবে বসে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করা ছাড়া আমাদের আর গত্যন্তর নেই।

বাতাসের তোড় একটু কম। কিন্তু সংকট তাতে এতটুকু কমে নি। বালিতে মুখ গুজড়ে পড়ে আছে জাহাজ। কী যে ভয়ানক সেই অবস্থা তা বর্ণনার অভীত। পারব কি এই সংকট থেকে ত্রাণ পেতে? জানি না। সহায় সম্বল বলতে আমাদের আর কোনো কিছুই নেই। ছিল জাহাজের সাথে বাঁধা একটা নৌকা, সে যে কখন কোথায় জলের তোড়ে ভেসে গেছে কি খান খান হয়ে ভেঙে গেছে বা তলিয়ে গেছে জলের নিচে, আমরা কিছুই জানি না। আরেকটা আছে জাহাজের ডেকে মাস্তলের সঙ্গে বাঁধা। কিন্তু সেটা পাড়ব কি ভাবে, নামাবই বা কী করে? সবই যে আমাদের আয়ত্তের বাইরে। এই ঢেউয়ের সঙ্গে আমরা কেমন করে যুবব? জাহাজ তো যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে পারে। এতক্ষণে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে কিনা তাই বা কে সঠিক করে বলতে পারে?

শেষ চেষ্টা করল সারেং। মাস্তলে উঠে দড়ি খুলে দিল নৌকোর। বাকিরা হাতে হাতে নামিয়ে নিল। একজন টেনে ধরে রইল এক দিক, বাকিরা উঠল নৌকায়। তারপর সেও উঠে গেল এক লাফে। মোট এগার জন আমরা। অমনি জলের তোড়ে সাঁই সাঁই করে ছুটতে লেগেছে নৌকো। সে কী ঢেউ! উচু একেকটা এই এন্তোখানি। আছড়ে পড়ছে মুর্মুর পাড়ে। আমরা সেই আশন্ত উত্তাল সমুদ্রের উপর দিয়ে যোচার খোলার মতো ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চললাম।

কিন্তু কতক্ষণ পারব এইভাবে চলতে সেটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। যে কোনো মুহূর্তে ডুবে যেতে পারে নৌকো। যে কোনো মুহূর্তে আমরা সলিল সমাধি প্রাপ্ত হতে পারি। নিষ্ঠার যে নেই এটা অনিবার্য। কেননা এই প্রচণ্ড ঢেউয়ের মাথায় সামান্য নৌকোর কোনো মূল্যই নেই। পাল গোটাবার প্রশ্ন ওঠে না। কেননা নৌকোয় পাল নেই। আছে দাঁড়। প্রাপণে বাইতে শুরু করেছি তাই। লক্ষ্য আমাদের কূল। কিন্তু কূলের কাছে পৌছলেই যে নিশ্চিন্ত

সেটাই বা বলি কেমন করে। পৌছবা মাত্র ঝাপিয়ে পড়বে চেউ, আছড়ে পড়বে আমাদের নৌকোর উপর, চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে চোখের নিমিষে। তখন উপায় ! মৃত্যুকে তখন কি আর এড়ান যাবে ? না। এবং এমতাবস্থায় দৈশ্বরকে আকুলভাবে ডাকা ছাড়া আমাদের গত্যস্তর নেই। মনপ্রাণ উৎসর্গ করে দিলাম তাঁরই পদতলে। তারপর মরীয়ার মতো তিল তিল করে কূলের দিকে অথবা মৃত্যুর দিকে এগোতে লাগলাম।

কূল যে কেমন তা-ও কি ছাই জানি ? অর্থাৎ সেটা পাহাড়, না পাথর, না মাটি, না বালি—সে তো এখান থেকে বোঝার উপায় নেই। একটাই আশা এখন—যদি এইভাবে চেউয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে কোনো উপসাগর কি নদীর মুখে গিয়ে হাজির হতে পারি। সে ক্ষেত্রে চেউ আমাদের যতটা খুশি সরিয়ে নিক। বাতাস যদি দিকভুল করে—সেটা ক্ষতি নয়, বরং আমাদের পক্ষে মঙ্গল। একমাত্র পরিভ্রান্তের উপায় সেটাই। নদীর মুখে পড়লে যেন তেন প্রকারেন ঢুকে পড়ব নদীতে, এগিয়ে যাব তরতর করে। তরঙ্গ আর তুফানের ভয় থাকবে না। ডাঙাও পাব দুধারে। কিন্তু কোথায় সেই নদীর মুখ ; এই যে চারপাশে তাকাই, দেখবার চেষ্টা করি—নজরে পড়ে না। শুধু ডাঙাটা ভেসে ওঠে চোখের সামনে। চেউয়ের মাথায় যখন নৌকো আচমকা লাফ দিয়ে ওঠে উপরে। সেটাও ভয় জাগায়। প্রমাদ গুনি। এই ডাঙার উপর চেউয়ের ঝাপটে আছড়ে পড়লে আমাদের আর নিষ্ঠার নেই।

প্রায় দেড় ক্রেশ পথ এইভাবে টালমাটাল খেতে খেতে এগোলাম। সে বড় ভয়ঙ্কর। প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে চেউয়ের বিরুদ্ধে প্রতি মুহূর্তে আমাদের লড়াই। কিন্তু সে আর কতক্ষণ। এত মারমুখী চেউ। যা ধাক্কা তার, যা তোড়। গেল নৌকো চোখের নিমিষে উল্লেট। পড়লাম জলে। কে যে কোথায় ছিটকে গেলাম জানি না। সে এমনই আকস্মিক শেষ মুহূর্তে একটু যে দৈশ্বরের নাম করব সে সুযোগটুকুও পেলাম না। মুহূর্তে আরেকটা চেউ এসে নিল আমাদের গ্রাস করে।

পাঠক ক্ষমা করবেন। ভাষায় সে অবস্থা আমি ব্যাখ্যা করতে অপারাগ। জলের নিচে ডুবে আছি। চিন্তা গেছে তোলপাড় হয়ে। সাঁতারু হিসেবে আমি খুব একটা মন্দ নই। কিন্তু কী লাভ সেই মুহূর্তে সাঁতার জ্বনে। মৃত্যুর প্রহর গুনছি জলের নিচে। হঠাতে আরেকটা চেউয়ের দোলায় ভেসে উঠলাম উপরে। দেখি পড়ে আছি ডাঙায়। শুকনো খটখটে সে জায়গা। কিন্তু শরীরে তাগদ নেই মোটে। বেঁচে যে আছি এটাই বড় কথা। জল খেয়েছি অনেকখানি। বড় দুর্বল আর ক্লান্তি। তবু বাঁচবার ঐ যে এক অদম্য তাগিদ। উঠলাম ভূমিশয্যা ছেড়ে। এগিয়ে গেলাম। মনে ভয়। যদি আরেকটা চেউ এসে আমাকে সমুদ্রে ফেরৎ নিয়ে যায়।

গেল তাই। সে যা তোড় ! পাহাড়ের মতো উচু সেই চেউ। ঝপাং করে এসে লাফিয়ে পড়ল আমার ঘাড়ে। আমি দম বক্ষ করে রইলাম। কিন্তু সে আর কতক্ষণ। বুক যে ফেটে যায় ! তখন জল ঠেলে হাঁকু পাঁকু করে ভেসে ওঠার চেষ্টা করলাম। বহুকষ্টে মাথাটা তুলতে পারলাম একটুখানি। মাত্র দু সেকেন্ড তার মেয়াদ। কিন্তু সেই মুহূর্তে সেটাই অনেক। বুক ভরে শ্বাস নিয়ে ফের বক্ষ করলাম দম। ততক্ষণে ফেরত এসে গেছি ডাঙায়। যাক, কিছুক্ষণের জন্যে তো শাস্তি !

কিছুক্ষণ এই জন্যে বললাম কেননা এই স্বল্প সময়ে আমি যে পালাব চেউয়ের কবল থেকে ত্রাণ পেতে নিরাপদ কোনো দ্রুতে, সে শক্তি আমার নেই। বড় দুর্বল শরীর। তার উপর মুহূর্মুহু চেউ। পারি কি আমি তার নাগাল থেকে সরে গিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে ?

এই তো আরেকটা। আবার সেই তোড়। জলে ডুবে ফের আমার দমবন্ধ। ফের বহুকষ্টে মাথা তোলা। প্রাপপণ চলেছে লড়াই। তখন দেখি পায়ের নিচে ঘাটি। ফিরিয়ে দিয়ে গেছে ফের কূলে। যাক, এ—যাত্রাও বাঁচোয়া।

এইভাবে আরো একবার। কিন্তু না, আর নয়। এবার যে কোনো উপায়ে নিজেকে রক্ষা করতেই হবে। আছড়ে ফেলেছে এবার বালির উপর। একটু বেসামালে পড়লে জানি না আমি আর এ কাহিনী লিখতে পারতাম কিনা। জল সরে গেলে দেখি একটা পাথর। বুকে ভীষণ চেট। ডান দিকটা যেন পুরোপুরি অসাড়। ঝিমঝিম করছে মাথা। এ অবস্থায় ফের যদি আসে ঢেউ, আমার আর রক্ষা নেই। তখন প্রাপপণে আঁকড়ে ধরলাম পাথর। শরীরে যতটুকু শক্তি আছে তাই দিয়ে। একটু পরেই ঢেউ এল। কিন্তু অবাক কাণ্ড দেখি এবার আর আগের মতো তোড় নেই। একটু যেন শাস্তি। তবু মরীয়ার মতো ঢেউ সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ি কি মরি করে অনেকখানি ছুটলাম। ঢেউ আসছে আবার। ফের শুয়ে চেপে ধরলাম আরেকটা পাথর। আমার পা ভিজিয়ে দিয়ে চলে গেল গজরাতে গজরাতে। তখন উঠে ফের ছুটলাম একটুখানি। দেখি ডাঙা। আহ্ শাস্তি! ঘাসের উপর বসে পড়লাম। শুধু পাছে খুব। এখন আর ঢেউ আমার কিছু করতে পারবে না। আমি নিরাপদ দূরত্বে চলে আসতে পেরেছি।

এ এক অস্তুত রহস্য বলা যায়। একটু আগে জীবন আমার বিপন্ন। বাঁচব কি বাঁচব না এটাই তখন একমাত্র প্রশ্ন। আর একটু পরে, এখন আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ। কেউ পারবে না আমার এটটুকু ক্ষতি কি অঘসল করতে। সমুদ্র এখন যতই গর্জাক, যত তোলপাড় করক, আমার আর ভয় নেই। আমি কোনো কিছুতেই আর ডরাই না।

ইটলাম খানিকক্ষণ। কখনো দুহাত তুলে প্রার্থনার ভঙ্গিতে। কখনো বা বালকের মতো কাঁদতে কাঁদতে। সে নানান ভঙ্গি আমার। শরীরের নানান বিভঙ্গ। হু হু করছে মন। আর কেউ বৈচে নেই আমার সহ্যাত্মাদের মধ্যে। ডুবে গেছে সকলে। শুধু একা আমি জীবিত। জাহাজটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

ঐ তো জাহাজ। মুখ গুজড়ে পড়ে আছে বালির উপর, পিছনে বিশাল সমুদ্রের দৃশ্যসজ্ঞা। তারই পটভূমিকায় লাগছে যেন নিশ্চল নির্বাক কোনো ছবির মতো। আর অবাক কাণ্ড। কীভাবে যে পারলাম আমি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে। কিছুতেই হিসেবটা মেলাতে পারছি না।

ভেবে আর কিছু লাভ নেই। আমি যে সম্পূর্ণ একা এটা ঘটনা। বন্ধু নেই, সাথী নেই, পরিচিত কেউ নেই ... ... ... কিন্তু এই যে এখানে এসে ভিড়লাম, এটাই বা কেমন জায়গা। ঘুরে ঘুরে একবার তো দেখা দরকার। তখন ঘাড় ঘুরিয়ে চারদিকে নজর ফেললাম। সবশেষে নজর পড়ল নিজের উপর। একি, আমি তো সম্পূর্ণ ভেজা। পোশাক ছেড়ে ফেলার কথা প্রথমেই মনে হল। কিন্তু ছাড়ব যে, পরার মতো আছেটা কী? তবে থাক, ছাড়ার দরকার নেই। কিছু খাই বরং। ক্ষিধে পেয়েছে। কিন্তু কী খাব? খাবার এখানে কোথায়? তেষ্টা মেটাব তেমন একটু জলেরই বা নাগাল কোথায় পাই? সে ভারি দুঃসহ অবস্থা। একটু একটু করে নিঃসঙ্গতা আমাকে গ্রাস করছে। আমি যে সম্পূর্ণ একা এটা টের পাচ্ছি। কিন্তু উপায়? মানুষ যখন নেই সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই আছে হিংস জানোয়ার। একটু পরে অতর্কিতে লাফ দিয়ে পড়বে আমর ঘাড়ে। আমাকে খাবে। আত্মরক্ষা করার মতো একটা কোনো অস্ত্র কি সঙ্গে আছে আমার? হঠাৎ ঝঁশ হতে পকেটে হাত দিয়ে দেখি—আছে তো ছুরিটা। আর তামাকের কোটা। এগুলো পকেট থেকে হাজার ঢেউয়ের

দাপটেও পড়ে নি। তবু শাস্তি। যাক, অন্তত ছুরি দিয়ে আক্রমণের প্রথম চোটা তো ঠেকাতে পারব! কিন্তু ক্ষিধে যে এখন ভীষণ। ক্ষিধে এড়াবার জন্যে খানিকটা ছুটে এলাম। সভ্য সমাজে এমন করলে লোকে বলত পাগল। এখানে তো আর কেউ দেখার বা বলার নেই। এদিকে একটু একটু করে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে নিতে যাবে দিনের আলো। সূর্য যাবে পাটে। আর দেরি করা ঠিক না। অন্তত আলো থাকতে থাকতে যে কোনো একটা গাছে উঠে রাতের জন্যে আঙ্গনা গাড়া ভালো। অন্তত খাই না খাই, ঘুমোই কি না ঘুমোই—হিংস্র জন্তুর আক্রমণের হাত থেকে প্রাণটা তো বাঁচবে।

খুজে খুজে পেয়ে গেলাম একটা গাছ। সিধে উঠে গেছে কাণ্ড। গায়ে অল্প স্বল্প কঁটার আবরণ। সেটা মদ নয়। আমার পক্ষে বরং মঙ্গল। উঠে পড়লাম উপরে। পাওয়া গেল মনের মতো একখানা ডাল। বসলাম আরাম করে পা ঝুলিয়ে। তারপর জামা খুলে জামা দিয়ে শক্ত করে বেঁধে নিলাম নিজেকে গাছের সাথে। বলতে ভুলে গেছি, এরই মধ্যে পানীয়ের সঞ্চাল পেয়েছি এক জায়গায়, খেয়ে এসেছি পেট ভরে অনেকখানি। কৌটা থেকে তামাক ছিঁড়ে দিয়েছি খানিকটা মুখে। তামাকের স্বাদে ক্ষিধে দূর হয়। এটা আমি জানি। এবার সব দিক থেকে শাস্তি। আর পরিশান্ত তো ভীষণ। তাই আরাম করে বসতে না বসতে ভীষণ ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল।

এক ঘুমে রাত কাবার। চোখ মেলে দেখি ফুটফুট দিন। আকাশ ফর্সা। ঝড় নেই। সমুদ্র যেন শান্ত শিষ্ট ভালোমানুষটি। কোথায় সেই ঢেউ। কোথায় বা সেই গর্জন। যেন দর্পণের মতো স্থির, নিখর। আরেকটা অন্তুত অবাক ব্যাপার—কাল যে বালির মধ্যে মুখ খুঁজে পড়েছিল আমাদের জাহাজটা, দেখি ঝড়ের তাড়নায় সেটা এখন উঠে খানিকটা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সরেও এসেছে কুলের দিকে অনেকটা। এটা ঢেউয়ের কারসাজি—আমি চোখ বুজে বলতে পারি। মোটামুটি সেই পাহাড়টা এখন জাহাজের খুবই কাছে। তবে ডাঙা থেকে যাইলখানেক মতো দূর। ভাবি ইচ্ছে করছে একবার জাহাজে উঠে নিজস্ব প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র নিয়ে আসতে।

গাছ থেকে নামলাম। হঠাৎ ডানদিকে চোখ পড়তেই দেখি—ওমা, ঐ তো আমাদের সেই নৌকো। তা প্রায় এখান থেকে মাইল দুয়েকের মতো দূর। কুলের উপর তুল দিয়ে গেছে ঢেউ। জল গেছে নেমে। তাই দাঁড়িয়ে আছে বালির উপর আড়াআড়ি ভাবে। ইঁটতে ইঁটতে সে দিকেই এগোলাম। কাছাকাছি হতে দেখি, উপায় নেই নৌকো অব্দি যাবার। প্রায় আধ মাইল চওড়া একটা খাড়ি মতো; সেখানে টইটস্বুর জল, তার ওধার চড়া। সেখানেই আটকে আছে নৌকো। দূর থেকে জল আমার চোখে মালুম হয় নি। সে হোক গে যাক, নয় নাই পেলাম নৌকো, কিন্তু জাহাজ তো বলতে গেলে হাতের গোড়ায়। দেখি না গিয়ে একবার। যদি পারি একবার কোনোক্ষণে জাহাজে উঠতে, তবে আমার বেঁচে থাকার মতো বিস্তর রসদ মিলবে।

বেলা ততক্ষণে বেড়েছে। সমুদ্র শাস্তি। চলেছি গুটি গুটি জাহাজের দিকে। মনটা ভাবি খারাপ লাগছে। কী যে মতি হল তখন দুদুড়ি করে নেমে পড়লাম সবাই জাহাজ থেকে, উঠলাম নৌকোয়।... যদি না নেমে জাহাজেই থাকতাম, তবে হয়ত এই দশা আজ হত না। নির্ধার্ত না। বেঁচে বেতেই থাকতাম সকলে। আমারও জীবন রক্ষা নিয়ে অত দুর্বিপাকে পড়তে হত না। সঙ্গী সাথীদের কথা ভেবে চোখে জল এল। কিন্তু কেঁদে এখন আর কোনো লাজ নেই। যা শেষ হয়ে গেছে তাকে ফিরিয়ে আনার চিন্তা তো ব্যথা। এখন নিজের জীবন রক্ষার সংগ্রাম। বাঁচতে হবে আমাকে। তার জন্যে চাই প্রয়োজনীয় রসদ। এবং সেটা

যেহেতু জাহাজে আছে, আমাকে তাই জাহাজে উঠতে হবে। প্যান্ট হাঁটু অন্দি গুটিয়ে ফেললাম। কেননা সামনে বেশ খানিকটা জল। পায়ের নিচে সদ্য জমা পলি। পিছলে যাই প্রতিমুহূর্তে। বহু কষ্টে এক সময় জাহাজের কাছে গিয়ে হাজির হলাম। কিন্তু উঠব কী করে? পাটাতন যে অনেক উচুতে। মসৃণ গা। অবলম্বন বলতে কিছুই নেই। কী করা যায়! চারপাশে সাঁতরে বেড়ালাম অনেকক্ষণ। হঠাৎ দেখি ছেট্ট একটা কাছি। উপর থেকে ঝুলে আছে, তাও বেশ খানিকটা উচুতে। বিস্তর চেষ্টা করে ধরলাম চেপে তার প্রান্তদেশ। তখন বেয়ে ওঠা আর কঠিন নয়। উঠলাম। দেখি জল জমে আছে অনেকখানি। সেটা এক দিক থেকে এই মুহূর্তে মঙ্গল কেননা এত ভারি জাহাজ কাত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা এখন কম। পাটাতনের উপরিভাগ খটখটে শুকনো। অর্থাৎ কেবিনও শুকনো। সেখানে জল ঢুকতে পারে নি। এখন দেখা দরকার মালপত্র সব শুকনো এবং আস্ত আছে কিনা।

আছে। যাক্ শান্তি! প্রথমেই হানা দিলাম রুটি-বরে। যতগুলো পারলাম পকেটে পুরলাম, দু হাতে দুটো নিয়ে ছিড়ে ছিড়ে শুরু করলাম খাওয়া। কিছু বিস্কুটও নিলাম



টাল সামলাতে সামলাতে হুমকি থেয়ে পড়লাম গিয়ে পেটির সামনে

পকেটে। পানীয়ের কয়েকটা বোতল বের করে এক জায়গায় জড় করে রাখলাম। একটা বোতল খুলে খেলাহও বেশ অনেকখানি। যাক্ আপাতত পিপাসার কবল থেকে নিশ্চিন্ত। এবার দরকারী অন্যান্য জিনিসের সঞ্চান করতে হবে।

সবচেয়ে প্রথমে দরকার একখানা নৌকো। ভেলা হলেও অসুবিধে নেই। মোটামুটি মালপত্র জাহাজ থেকে নিয়ে যেতে তো হবে ডাঙায়। দেখি ভাঁড়ার ঘরে বিস্তর দড়ি আছে। আর কাছি, আর পাটাতনে অতিরিক্ত প্রচুর চেরা কাঠ। বাড়তি মাস্তুলও আছে খান দুই। সব জড় করে অমনি কাজে লেগে গেলাম। বাঁধাঁচাঁদা করে ভেলা অবশেষে তৈরি হল। জলে নামাতে হবে এবার। তখন দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিলাম জলে। দড়ির প্রান্তদেশ জাহাজের মাস্তুলের সাথে শক্ত করে বাঁধা রইল। আড়াআড়ি ভাবে একখানা কাঠ নামিয়ে দিলাম ভেলার উপর। এটা সিডি। মালপত্র নিয়ে জাহাজ থেকে নামবার কাজে দরকার হবে। একটা সরু মাস্তুল দিয়ে করলাম লগি। এটা ভেলা বেয়ে ডাঙায় যাবার সময় আমার

কাজে লাগবে।

মোটের উপর মাল বয়ে নিয়ে যাবার উপকরণ আমার মজুত। এবার দেখা দরকার কী কী জিনিস এতে করে আমি নিয়ে যাব এবং তার ওজন কী রকম। প্রথমে বাকি চেরা কাঠগুলো তুললাম। তাতে পাটাতন আরেকটু বড় হল। এবার তুললাম তিনটে কাঠের খালি পেট। এগুলো থেকে মাল বের করে আগেই আমি খালি করে রেখেছি। একটাতে ভরলাম ঝুটি, চাল, পানীয়, শুকনো মাংস, বিশ্কুট, কটা মুরগি ছিল সঙ্গে সেগুলো জলের ঝাপটায় মারা গেছে—তাও। কিছু যব আর গম নেবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ইদুর বস্তা ফুটো করায় ফুটো দিয়ে পড়ে গেছে। মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। নেওয়া হল না। কটা বোতল নিলাম পানীয়ের আর জলের কয়েকটা। ব্যস পেটি বোঝাই। তখন পেরেক মেরে কাঠের ঢাকনা আটকে মুখ বক্স করে দিলাম। দেখি জলের তোড় তখন একটু বেড়েছে। চেউ উঠছে মৃদু মন্দ। কুলে খুলে ফেলে এসেছিলাম জামা, কোট আর গেঞ্জি। সব চোখের সামনে জলের টানে গেল ভেসে। প্যান্ট আর মোজা পরনে আছে। সেটাই যা সান্ত্বনা। সে যাক গে, মন খারাপ করে তো কোনো লাভ নেই। পাব না আর ঐ জামা বা কোট। ফের মন দিলাম কাজে। দ্বিতীয় পেটিতে ভরলাম কাজ করার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি। জাহাজে ছুতোরের একটা বাক্স ছিল। বলতে গেলে বাক্স খালি করে সব মালই নিলাম। এগুলো যে বড় দরকারী। নির্জন নিরালায় আমার আত্মরক্ষার একমাত্র অবলম্বন। এখন যদি কেউ বলে আমাকে—এই নাও এক বস্তা সোনা, বিনিয়নে এই যন্ত্রপাতির বাক্স অমাকে দাও, দেব না। হাজার লোভ দেখালেও না।

বন্দুক আর গোলাবাকুন্দ কিছু দরকার। কেবিনের তাকে দেখি দুটো পিণ্ডল আর দুটো বন্দুক। বাকুন্দ রয়েছে অনেকখানি একটা পাত্রে। আর এক বস্তা মতোন টোটা। দুটো ঘরচে ধরা তলোয়ারও দেখতে পেলাম। সব নিলাম। বাকুন্দের পাত্র আরো দুটো নজরে পড়ল। তর মধ্যে একটা ভালো, আরেকটায় জল ঢুকে ভিজে গেছে। ভালোটা নিলাম। মোটমাট নিশ্চিন্ত এখন। এবার ভালোয় ভালো ভেলা ভাসিয়ে ডাঙায় উঠতে হবে।

তবে তেমন কিছু বকমারি হবে বলে মনেও হয় না। সমুদ্র এখন শান্ত। আমার পক্ষে ষপ্পু সেটা। জল কিছুটা বেড়েছে ঠিক, তবে এমন নয় যে তয় পাওয়ার মতো বা ঘাবড়ে যাবার মতো। বাতাস আছে। তার গতি এখন কুলের দিকে। মোটমাট অনুকূল অবস্থাই হলা যায়। ভাঙা দাঁড় পেলাম একটা জাহাজের ডেকে। নিলাম। ভেলা ঠেলে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। দড়ি বেয়ে নামলাম এবার ভেলায়। দড়ি খুলে দিলাম। মাইলখানেক অঙ্গি বলতে গেলে নিশ্চিন্ত। কোনো বিপদের সন্তাননা নেই। যেমনটি চাই, তেমনই চলে ভেলা। স একেবারে তরতর স্বচ্ছদ গতি। তবে মুশকিল হল আরো খানিকটা এগিয়ে। দেখি ডাঙার দিকে কিছুতেই আর নিয়ে যেতে পারি না ভেলা। সামনে একটা নদীর মুখ। সমুদ্রের ছল প্রবল বেগে ঢুকছে সেই নদীতে। তারই টানে আমার সব রকম চেষ্টা অগ্রহ্য করে ভেলা সেই দিকেই এগিয়ে চলল। আমার আয়ত্তের সম্পূর্ণ বাইরে। ঘূর্ণি উঠছে নদীর মুখে। ঘূর্ণির টানে পড়ে আমার তো বলতে গেলে নাজেহাল অবস্থা। ভেলা এই ওল্টায় কি সেই ওল্টায়। একদিকে কাত হবার সঙ্গে সঙ্গে পেটিগুলো সড়াৎ করে সরে সেই দিকে গিয়ে উমা হল। টাল সামলাতে সামলাতে হৃদ্দি খেয়ে পড়লাম গিয়ে পেটির সামনে, দুহাত দিয়ে খাপপশে ঠেলে রাখলাম। তাইতে রক্ষে। নইলে ফের কপালে ভরাডুবি।

আরো খানিকক্ষণ পর। দেখি পাক খেতে খেতে নৌকো ঢুকে পড়েছে নদীর ভিতর। লেছে স্নোতের টানে তরতর করে এগিয়ে। ঘাম দিয়ে এতক্ষণে যেন জ্বর ছাড়ল। চারপাশে

তাকালাম। সেই ডাঙ। দুধারে ঘন জঙ্গল। কিন্তু থামা তো দরকার এবার। কতড়ুর আর যাব? সমুদ্রের নাগাল ছেড়ে বেশি ভিতরে ঢোকার আমার ইচ্ছে নেই। তাতে মুশকিল। কেননা কাছাকাছি থাকলে নজর রাখতে পারব দূরে, কোনো জাহাজ-টাহাজ যায় কিনা দেখতে পাব।

আরো খানিকটা এগিয়ে একটু ফাঁকা মতো জায়গা। মাঠই বলা যায়। জঙ্গল দূরে দূরে। লগি কাদায় গেঁথে ভেলা থামলাম। ডাঙার একেবারে গায়ে। কিন্তু ওঠার উপায় নেই। পাড় এখানে বজ্জ উচু। অতএব প্রতীক্ষা করতে হবে। জল সমৃদ্ধ থেকে যত ভিতরে চুকবে তত উচু হবে ভেলা, পাড়ের সমান সমান হবে। তখনি নামার চেষ্টা করব।

হল তাই। আরো প্রায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করার পর জল উচু হল প্রায় এক ফুট মতো। দেখি পাড়ের প্রায় সমান্তরাল। তখন লগি গাঁথলাম শক্ত করে মাটিতে। দড়ি দিয়ে বাঁধলাম। পেটিগুলো ঠেলে নামিয়ে দিলাম ডাঙায়। নিশ্চিন্ত এবার। দুর্ব্বরকে অশেষ ধন্যবাদ, আমার একটি জিনিসও নষ্ট হয় নি।

কিন্তু নামলাম যে এখানে, থাকি কোথায়? মালপত্রই বা কোথায় রাখি। এটা এবার ঠিক করা দরকার। সুরে ফিরে দেখতে হবে চতুর্দিক। আসলে জায়গাটা কোনো মহাদেশের অংশ না দ্বীপ এটাই এতক্ষণে আমি বুঝতে পারি নি। এখানে মানুষ বাস করে কিনা সেটাও প্রশ্ন। জীবজন্তু যে আছে এ ব্যাপারে আমার সন্দেহ নেই। কিন্তু কী জাতীয় জন্তু তারা? হিংস্র না কি সাধারণ? মাইলখানেক দূরে একটা পাহাড় নজরে পড়ছে। খাড়া উচু চূড়া পাশে আরো কয়েকটা টিলা পাহাড়। আমার ধারণা পাহাড়ে উঠলে ঘোটামুটি চারদিক আমি দেখতে পাব। কিন্তু যাবার আগে উপর্যুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন আছে। পথে কী বিপদ আপদ হয় কিছু বলা যায় না। তাই পিণ্ডিল সাথে নিলাম। আর একটা ছররা বন্দুক। সঙ্গে বেশ খানিকটা বারুদ আর টোটা। তারপর রওনা দিলাম পাহাড়ের দিকে।

ভারি কষ্ট হল উঠতে। খাড়া উচু পাহাড়। কষ্ট হবে এটাই স্বাভাবিক। চারদিকে তাকালাম। শুধু জল আর জল। অর্থাৎ দ্বীপ এটা। দূরে একসার পাহাড়। আরো দূরে গোটা দুই ছোটো দ্বীপ। ব্যস, আর কিছু দেখার মতো নেই।

আরো একটা জিনিস পরিষ্কার হল। এখানে যে মানুষ বাস করে না এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। শুধু ঘন সবুজ বনানী। আর অসংখ্য বনমোরগ। হিংস্র জন্তু যে আছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তবে সেটা নিভাস্তই অনুমান। যাতায়তের পথে কোনো জন্তু নজরে পড়ল না বা গর্জনও শনতে পেলাম না। ফেরার পথে একটা মন্ত পাখি মারলাম। বসে ছিল গাছে নিশ্চিন্তে। বন্দুক তাক করে ঘোড়া টিপলাম। সেই প্রথম বন্দুক গর্জন দ্বীপে। তার বিরল কৃতিত্বের অধিকারী একলা আমি। আর বন্দুক গর্জে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সারা জঙ্গল জুড়ে সে যা বনমোরগের দাপাদাপি আর ডাক। তবে এই টুকুই। ঘন জঙ্গলের আড়াল ছেড়ে বাইরে খুব একটা কেউ বেরল না। শুধু দু চারটি। তাও সুট করে ভয়ে চুকে পড়ল গাছগাছালির আড়ালে। ভুলে নিলাম মরা পাখিটাকে। যতদূর ধারণা, বাজপাখি জাতীয় একটা কিছু। ঠোটের গড়ন আর পালকের রঙ দেখে আমার অন্তত সে রকমই মনে হল। কিন্তু নথ নেই। এটা ভারি অবাক ব্যাপার। আর মাংসের স্বাদও ভারি বিশ্রী। তীব্র ঝাঁঝাল একটা গন্ধ। বলতে গেলে অথাদ্য। শেষ অব্দি রান্না করে খাবার ইচ্ছে আর হল না।

ফিরে এলাম জায়গায়। প্রধান সমস্যা এখন মালপত্র ঠিক ঠিক শুভ্রিয়ে নিরাপদ হ্যানে রাখা। কিন্তু কোথায় সেই নিরাপদ অঞ্চল? তাছাড়া রাত্রে আমিই বা থাকি কোথায়?

এখানে শুয়ে থাকার প্রশ্নই ওঠে না। কেননা জীবজগতের ভয়। ঘুমের মধ্যে যদি এসে আমাকে অতক্রিতে আক্রমণ করে।

অবশ্য পরে দেখেছি, আমার এই ভয় এবং অনুভাব অমূলক। ধীপে হিস্তে জন্ম বলতে কিছুই নেই।

মালের পেটিগুলো চারপাশে সাজিয়ে মোটামুটি একটা ঘেরা মতো করলাম। হঠাৎ দেখলে মনে হবে কুটির। ছাউনিটা অবশ্য বাদ। এটা রাতটুকু কাটাবার উপায় মাত্র। খাবার হিসেবে হাতের গোড়ায় পেলাম একটা বনমোরগ। তাকে শুলি করে মারলাম। একটা খরগোশ শুলির শব্দ শুনে বন থেকে বেরিয়ে এত। তাকে আর মারলাম না।

মোটামুটি মালপত্র যেটুকু এনেছি জাহাজ থেকে তা যথেষ্ট নয়, অরো অনেক কিছু আমাকে আনতে হবে। বিশেষ করে, পালটা দরকার, ছাউনি করার কাজে লাগবে। আরো হাজারো এটা খটা জিনিস। জাহাজে পড়ে আছে অকেজো অবস্থায়—লাভ কী? বরং নিয়ে আসি এখানে আমার কাজে লাগবে। তারজন্যে অনেকবার জাহাজে যাওয়া দরকার। এবং সেটা যত শীত্র সম্ভব হয় ততই মঙ্গল। কেননা এর পরে যে তুফান উঠবে, আমি চোখ বুজে বলে দিতে পারি, তাতে জাহাজের আর অস্তিত্ব বলতে কিছু থাকবে না, ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। সুতরাং পড়ে রইল আর সব কাজ। এটাই প্রধান এবং জরুরি বিবেচনার পরদিনই ফের যাব বলে ঠিক করলাম। কিন্তু যাব কী ভাবে? ভেলা নিয়ে? বরং থাক। যেভাবে গিয়েছিলাম প্রথমবার, সেই ভাবে পায়ে হেঁটেই যাব। ফিরে আসার সময় বরং কাঠ দিয়ে ফের একটা ভেলা বানিয়ে নেওয়া যাবে। তবে হ্যাঁ, এবার আর বেশি পোশাক রাখব না গায়ে। শুধু একটা সার্ট, আর প্যান্ট আর পায়ে রবারের জুতো। এবং কোনোক্রমেই এর কোনোটা জলের ধারে বালির উপর খুলে রাখব না।

আগের বারের মতোই জল ভেঙ্গে কখনো সাঁতরিয়ে জাহাজে গিয়ে উঠলাম। তৈরি হল আরেকটা ভেলা। তাতে একের পর এক মাল তুললাম। তবে এবার আগের মতো অতগুলো নয়। নিলাম পেরেক আর আংটার তিনটে থলি, স্ক্রু ড্রাইভার, ডজন দুই হাত কুড়ুল, একটা ধাতা, সাত বালি টোটা, পাখি মারা আরেকটা বন্দুক, আরো খানিকটা বারুদ, আর সীসার মস্ত একা পাত। এত ভারী যে পাতটা তুলতে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হল। টানতে টানতে জাহাজের কিনারে নিয়ে এসে ভেলায় তোলা—সে এক ঝীতিমতো গলদার্ম কাজ।

একটা বাল্লে শুধু পোশাক—আশাক। সব পুরুষদের। নিলাম ভেলায়। পাল ছিল বেশ কয়েকটা বাড়তি, সেগুলো তুলে নিলাম। ভাঙ্গ করা খাট নিলাম একটা, আর এক প্রস্তুতোষক বালিশ। আর নয়। আপাতত আজকের মতো এখানেই ইতি। তখন ধীরে ধীরে ভেলা বেয়ে নদী দিয়ে ডাঙায় এসে উঠলাম।

এসে দেখি মালপত্র যেমন যা ফেলে গেছি ঠিক সেই ভাবেই পড়ে আছে। কেউ হাত দেয় নি বা একটা টুকরো জিনিস অন্তি নষ্ট হয় নি। আমি ভেবেছিলাম হয়ত কেউ না কেউ তছনছ করবে কি চুরি-চামারি করে নিয়ে যাবে। মোটমাট সেদিক থেকে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। শুধু দেখি বিড়ালের মতোই দেখতে অনেকটা—বুনো একটা জীব বসে আছে আমার পেটিগুলোর কাছে ঘাপটি মেরে। আমার দিকে জুলজুল করে দেখতে লাগল। আমি বন্দুকটা ঢেলে তার দিকে এগিয়ে দিলাম। লক্ষ্যে মাত্র করল না। তখন একটা বিস্কুট দিলাম। দেখি শুঁকল খানিকক্ষণ, তাবপর কড়মড় করে চিবিয়ে থেয়ে নিল। থেয়েই ফের দেখি প্রত্যাশীর মতো চেয়ে আছে। কিন্তু আর দেব কী করে? আমার যে বিস্কুট বা

অন্যান্য খাবার জিনিসের সংগ্রহ নামধাত্র। তা থেকে কি আর এত দানখয়রাত চলতে পারে। তখন দেখি একটুকাল বসে খাকার পর নিতান্ত ব্যাজার মুখে ধীরে ধীরে জঙ্গলের দিকে ইঁটা দিল।

এবার মোটামুটি বিস্তর মালপত্র জমেছে। সেগুলোর নিরাপত্তা দরকার। আপাতত প্রয়োজন একটা তাঁবু খাটানো। তারই কাজে লেগে পড়লাম। খুঁটি এনেছি বেশ কয়েকটা জাহাজ থেকে। সেই সাথে ছাঁটো বড় নানান মাপের অনেক গুলো পাল। খানিকক্ষণ কাজ করার পর দেখি চমৎকার একটা তাঁবু তৈরি হয়েছে। তখন মালপত্র পেটি থেকে খালি করে তাঁবুর ভেতরে এনে তুললাম। তারপর খালি পেটি কটা আরো নানান এটা ওটা জিনিস দিয়ে ঘিরে দিলাম তাঁবুর চারপাশ। যাক এতক্ষণে বিজন বিভুই ধীপে নিজস্ব ঘর বলে তবু কিছু একটা তৈরি করা গেল। নিশ্চিন্ত লাগছে বেশ।

দরজাও বানিয়েছি তাঁবুর। চেরা কয়েকটা কাঠ দিয়ে আড়াল করে দিয়েছি ঢোকার মুখটা। তাতে ঠেক্না দেওয়া বোঝাই একটা পেটি। মোটমাট বাহিরে থেকে ঠেলাঠেলি করে কেউ যদি ঢুকতে চায় তাকে ঝক্কি পোয়াতে হবে। সেই ফাঁকে আমিও সজাগ হবার সুযোগ পাব।

ভারি চমৎকার ঘুমোলাম সেদিন আমার নতুন ঘরে। দরজা আটকে বিছানা পেতে মাথার কাছে দু দুটো পিণ্ডল রেখে দে ঘুম। ক্লান্তিও তো কম নয়। সারাদিনের পরিশ্রমের একটা ধূকল আছে বৈকি। এক ঘুমে রাত একেবারে কাবার।

পরদিন ভোর থেকেই নতুন আরেক প্রস্তু চিন্তা। মালপত্র যা এনেছি এ পর্যন্ত একজন মানুষের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু এখনো যে অনেক কিছু আছে জাহাজে। চেউ এলে বড় উঠলে ভেসে যাবে জাহাজ, টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাবে—সব সঞ্চয় জমা হবে গিয়ে সমুদ্রের গর্ভে। লাভ কী তাতে! বরং নিয়ে আসি না আমিই সব। একদিনে না পারি, ধীরে ধীরে, খেপে খেপে। আপাতত যথেষ্ট মনে হলেও কদিন লাগবে ফুরোতে। জানি না তো কতদিন থাকতে হবে এখানে। সে অবস্থায় যত যা আনব সেটুকুই লাভ। তাই লাগবে আমার জীবন-যাপনের কাজে। তো কোমর বেঁধে লেগে গেলাম। বোজহই যাই একেবার, নিয়ে আসি এটা ওটা টুকিটাকি মাল, বেশি হলে ভেলা বানাই, কম হলে নিয়ে আসি কূলের উপর ভাসয়ে ভাসিয়ে। এইভাবে দড়ি এল, মোটা সুতো এল, বেশ কয়েকখানা ত্রিপল আনলাম, সেই ভেজা বারদের প্যাকেটটাও আনলাম,—মোটমাট প্রায় সবই। এর জন্যে দরকার হল মোট এগার বার যাতায়াত। শেষাবধি পড়ে ছিল মন্ত্র রুটির টিন, মদের বোতলের একটা পেটি, এক বাল্ক চিনি আর এক পিপে ঘয়দা। এগুলো গোড়াতে আমি দেখতে পাই নি। পরে দেখি লুকানো রয়েছে একটা আলাদা জায়গায়। সব জড় করে তুললাম ভেলায়। তারপর নিরাপদে ডাঙায় নিয়ে এলাম।

পরের দিন ফের আরেক দফা যাত্রা। নেশা ধরে গেছে যে আমার। দস্যুর মতো কেবল লুঠপাট করে সব নিয়ে আসতে মন চায়। দেখি পড়ে আছে একধারে কটা খুঁটি, সেই সাথে কাছি অনেকখানি, সব মিলে তা-ও নেহাঁ কম নয়। ভালোই ওজন। ভেলায় তুললাম। আসছি বেশ জল কেটে কেটে, হঠাৎ তোড় এল। ওলট পালট চেউ। ভেলা গেল চোখের নিমেষে উলটে। আমি ঝপাখ করে পড়লাম জলে। মালপত্র সব মুহূর্তে জঙ্গলের নিচে। শুধু ভেলাটা একটু পরে ভেসে উঠল। তখন সাতার কেটে সোটাতে চড়ে ফিরে এলাম ডাঙায়। মনে আংক্ষেপ। বসে রইলাম সমুদ্রের পাড়ে। চেউ একটু একটু করে কমল। ভাঁটার টানে জলও নেয়ে গেল নিচে। তখন যেখানটাতে ভুবেছিল ভেলা, সেখানে খোজখাজ করে কাছি

গোছাটা আর তারের গোছাটা তুলে আনতে পারলাম। লোহাও ছেটো বড় নানান ঘাপের কিছু ছিল সঙ্গে। বলতে ভুলে গেছি। সেগুলো উদ্ধার করা আর সম্ভব হল না। ভারী বলে গড়াতে গড়াতে চলে গেছে সমুদ্র গর্ভে।

এবার হিসেবে বসলাম। মোট তের দিন আছি আমি এখানে। এর মধ্যে এগার বার গেছি জাহাজে। যতদূর সম্ভব মানুষের দুখানা হাত যা আনতে পারে সব এনেছি আমি জাহাজ থেকে ডাঙায়। সমুদ্র মোটামুটি শান্ত। এতটুকু উত্তাপ বা বড় বাঞ্চার কোনো লক্ষণ নেই। যাব নাকি ফের? আর একটি বার যদি আরো কিছু নজরে পড়ে। কোনো টুকিটাকি প্রযোজনীয় জিনিস।

গেলাম ফের পরের দিন। তন্ম তন্ম করে শুঁজলাম প্রতিটি অংশ। কোথাও কিছু নেই। গেলাম সারেং এর কেবিনে। দেখি টেবিলের একটা দেরাজ তালা মারা। তালাটা ভেঙে ফেললাম। দেখি তিনটে স্ক্রুপ। বড় একটা কাঁচি। ডজন খানেক ছুরি আর কটা কঁটা চামচ। সব পকেটহু হল। আরেকটু ভেতরে হাতড়ে দেখি নানান দেশের কিছু খুচরো পয়সা আর টাকা। যেমন ইংল্যান্ডের ছ পাউন্ড নোট। বাজিলের কিছু মুদ্রা, একটু সোনা,



খানিকটা রূপো—হাসি পেল খুব। কী হবে এসব নিয়ে—অখ্যাত অঞ্চাত জনহীন দেশে! মাটিতে পুঁতে রাখলেই বা কী আসে যায়। সে অর্থে এই একখানা ছুরির দাম আমার কাছে অনেক বেশি। তবু নিলাম সব। ছেট্ট একফালি ত্রিপলে মুড়ে পকেটে রাখলাম। ফিরব এবার। তেলা কি আরেকটা বানাব? নাকি সাতার কেঁটে ফিরে যাব? ভাবছি এইসব। হঠাৎ দেখি আকাশ কালো করে কী মেঘের ঘনঘটা। চোখের নিমিষে যেন দৃশ্যপট পালটে গেল। উঠল ঝড়। স্পষ্ট ঝড় ওঠা দেখতে পেলাম। ডাঙার দিক থেকে আসছে হ হ হাওয়া। গাছপালা দুলছে। সে কী দুলুনি! আর দেরি নয়। ভেলা বানাবার চিন্তা বা চেষ্টা এখন ব্রথা। ঝাপ দিয়ে পড়লাম অমনি জলে। সাঁতার কেটে যখন কুলে গিয়ে পৌছলাম তখন বাতাস আরো তীব্র, জল ফুলে ফুলে উঠতে শুরু করেছে। দেউ ধেয়ে আসছে দৈত্যের মতো কুলের দিকে সমুদ্রের বুক ভেঙে।

তাঁবুতে পৌছে স্বত্তির নিশ্চাস ফেললাম। বেশ নিরাপদ লাগছে। বাইরে হাওয়ার সোঁ দাপাদাপি। রাতভর সেইভাবেই চলল। দেখি বড় আর নেই। জাহাজটাও নেই।

কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে হাওয়া কে জানে! হয়ত সমুদ্রের গর্ভে এখন তার স্থান। ইন্দ্ররকে অশেষ ধন্যবাদ। প্রয়োজনীয় যা কিছু জিনিস সব ইতোমধ্যে নিয়ে আসতে পেরেছি। যদি দু একদিন দেরি করতাম কী করছি করব বলে বলে দিন কাটাতাম, তাহলে সব এতক্ষণে জাহাজের সাথে সাথে আমার নাগালের বাইরে চলে যেত। সেক্ষেত্রে আক্ষেপ করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকত না।

তা জাহাজের চিন্তা আপাতত মন থেকে দূর করলাম। এখন আরেক চিন্তা আমার—স্টেই এই মুহূর্তে প্রধান—জিনিসপত্র সমেত নিজেকে আরো নিরাপদ করা, যাতে নরখাদক বর্বর বা বন্য হিংস্র জন্তু আমার কোনো ক্ষতি না করতে পারে, সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখা। এর জন্যে দরকার নিজের আস্তানা আরো ঘজবৃত্ত, আরো চৰৎকার করা। কিন্তু কোথায় করব সেই আস্তানা? নাকি তাঁবুই খাটিয়ে রেখে দেব, না কোনো গুহাটুহার খোঁজ করব।

খুঁজতে বেরলাম জায়গা। দুটো দিকে মূলত আমার নজর। প্রথমত খুব একটা ভিতরে চুকব না, সমুদ্রের কাছাকাছি থাকব, দ্বিতীয়ত পানীয় জলের সরবরাহ ধাকবে পর্যাপ্ত। যেন জলের খোঁজে দূরে কোথাও না যেতে হয়।

এর পাশাপাশি অবিশ্য স্বাস্থ্যের কারণটাও আছে। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে এটা সবচেয়ে প্রথম কথা। নরখাদক বর্বর বা হিংস্র জন্তুর কবলে যদি পড়ি তবে তো সব চুকেই গেল। সুতরাং নজর রাখতে হবে। আরো একটা ব্যাপার এখানে আসা ইন্দ্রক লক্ষ করেছি। সূর্যের বড় তেজ। ঝলসে যায় যেন পিঠের চামড়া। এর কবল থেকেও নিজেকে রক্ষা করার প্রয়োজন আছে।

খুঁজতে খুঁজতে যে জায়গাটার হদিশ মিলল বলা যেতে পারে, আমার চিন্তার সঙ্গে সাযুজ্য করে স্টো আদর্শ স্থান। পাহাড়ের ঢালে সমতল মতো খানিকটা এলাকা। বেশ উচুতে। পেছনে পাহাড়টাও বেশ খাড়া। অর্থাৎ পেছন থেকে অজানতে কোনো রকম বিপদ আসার সম্ভাবনা নেই। একটা গুহাও আছে কাছাকাছি। গুহা অবিশ্য যথার্থ অর্থে নয়, পাহাড়েরই গায়ে একটা গর্ত মতো। তার মুখে একটা দরজা বসাতে পারলে অনেক দিক থেকেই শান্তি।

পাহাড় ঢালু হতে হতে গিয়ে মিশেছে মাটিতে। সেখানে সবুজ মখমলের মতো ঘাস। এখানেই তাঁবুটা খাটালাম। প্রায় শ খানেক গজ চওড়া আর দুশ গজ মতো লম্বা মাঠ। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন বাড়ির উঠোন, খেটে খুটে বহুদিনের পরিশ্রমে আমিই তৈরি করেছি। আরো খানিকটা এগিয়ে গেলে সমুদ্র। ঢালু হতে হতে জমি গিয়ে মিশেছে কূলে। সব দিক থেকেই পছন্দ আমার, সব দিক থেকে মনের মতো। যা যা চাই সব ব্যবস্থাই এখানে আছে।

আমার আসল লক্ষ্য কিন্তু গুহাটা। তাঁবু খাটাবার সাথে সাথে গুহাটাকেও ঢেলে সাজালাম। ঝাড় পৌছ করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হল। তারপর খুটো গাড়লাম দুদিকে দুটো। মাঝখানে দিলাম চওড়া চেরা কাঠ। উচু হল দরজা প্রায় মাটি থেকে সাড়ে পাঁচ ফুট। তারপর তার দিয়ে সামনে অর্ধবৃক্ষাকারে বেশ খানিকটা জায়গা বেড়ার মতো করে ঘিরে দিলাম। আর কী চিন্তা আমার। মই বানালাম একটা। স্টো একেবারে উচ্চতায় দরজার মাথা অল্পি। উঠব মই বেয়ে, গুহায় নামব, তারপর তুলে নেব মই। ভিতরে রেখে দেব। ব্যস আর কে নাগাল পায়। আসুক নরখাদক, আসুক হিংস্র জন্তু, তারের বেঠনী যদি বা ডিঙিয়ে আসে, কিছুতে পারবে না সাড়ে পাঁচ ফুট উচু কাঠের দরজা পার হয়ে আমাকে

ধরতে বা আমার কোনো ক্ষতি করতে। নিরাপদ নিশ্চিন্তে পড়ে পড়ে আমি ঘুমোতে পারব।

তাঁবুটা রইল নিছকই একটা আস্তানা হিসেবে, মালপত্র যতখানি সন্তুষ এনে রাখলাম তারের বেষ্টনীর মধ্যে। সেখানেও চারদিকে খুটো গেড়ে অনেকটা তাঁবু মতো বানালাম। এটা বৃষ্টি আর রোদের হাত থেকে জিনিসপত্র রক্ষার অভিপ্রায়ে। বড় ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দিলাম তাঁবুর মাথা। ব্যস্ত এদিক থেকেও নিশ্চিন্ত।

তারপর গুহার মধ্যে খাট পাতলাম, বিছানা পাতলাম, শুয়ে পড়লাম টান টান হয়ে। আহ শান্তি।

কিন্তু কাজের কি আর শেষ আছে। যের বাঁধার কাজ। একটু করলে মনে হয়, আরো যে একটু করা দরকার। তাই মাটি তুলে আনলাম নিচ থেকে। তাল তাল মাটি চওড়া করে তারের বেড়ার গায়ে জমিয়ে দিলাম। উচু হল প্রায় দেড় ফুট। হল দেয়াল। সেটা নিরাপত্তার আরো এক ধাপ। তারের বেড়ার ফাঁক গলে যদি বা কেউ ঢুকতে পারত, দেয়াল ডিঙিয়ে এখন আর সেটা সন্তুষ হবে না। অর্থাৎ আমার মালপত্র নিয়ে অহেতুক দুশ্চিন্তারও আর কারণ থাকছে না।

মোটমাট গোছগাছ করে সব কিছু নিপুণভাবে সাজিয়ে নিতে সময় লাগল যথেষ্ট। সেটাই স্বাভাবিক। চট করে তো আর কিছু হয় না। এরই মধ্যে একদিন এক কাণ্ড। দুন্দাড় করে কালো কুচকুচে এক চিলতে মেঘ ধূয়ে নামল দারুণ বৃষ্টি। আমি তো থ। তখন সবে গুহার দরজাটা বসিয়েছি, মালপত্র তখনো কিছু বাইরে, কিছু তাঁবুর মধ্যে। হঠাৎ বৃষ্টির ধারার মধ্যেই কানের পর্দা ফাটিয়ে ত্রাহি ত্রাহি এক বস্তুপাত। সে যা আওয়াজ। আওয়াজটা দেখি খানিকক্ষণ ধরেও রয়ে গেছে। ব্যাপার কী! তখন হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো কারণটা মনে উদয় হল। তাই তো, রেখেছিলাম যে বারুদের একটা প্যাকেট বাইরে খোলা জায়গায়। তাতেই কি ধরে গেল আগুন! তারই কি বিস্ফেরণের আওয়াজ পেলাম!

বেরিয়ে দেখি সত্যি সত্যি তাই। তখন সে যা দুঃখ আমার, যা মনের অবস্থা। বারুদ মনে যে আমার জীবন, আমার ক্ষুধার অন্ন যোগাবার একমাত্র সম্বল। এই বিজন বিভুঁয়ে বারুদ নেই কিছু নেই—আমি বাঁচব কী করে।

অবিশ্যি যায় নি সব। মোটে একটা প্যাকেট গেছে। আছে আরো অনেক খানি। সেই যা সাজ্জনা। সেগুলোকে এখন আগলে রাখাটাই সবচেয়ে বড় কথা। অধিনি হড়মুড় করে অন্য সব কিছু গুছিয়ে তুলবার আগে বারুদ আর টোটার প্যাকেটগুলো নিয়ে গুহায় ঢোকালাম। মূল প্যাকেট খুলে বানালাম একশটার মতো পুরিয়া। ছেটো বড় সে নানান মাপের। প্রায় আড়াইশ পাউন্ড ওজনের যে বারুদ। পুরিয়া করা হলে রাখলাম ছড়িয়ে ছিটিয়ে। নিশ্চিন্ত এখন। কেননা যদি কোনো কারণে বছের আগুনে একটা পুরিয়া জলেও যায়, তবে সেটাই যাবে, বাকিগুলোতে তার ছোঁঁচ লাগবে না এবং সেক্ষেত্রে আমার বাকি বারুদ রক্ষা পাবে।

আর এই সব টুকিটাকি কাজের ফাঁকে ফাঁকে রোজ একবার করে বেরিয়ে পড়ার ব্যাপার তো আছেই। দুটো তার উদ্দেশ্য। এক হল দ্বীপটাকে ভালো করে চেনা জানা, দুই—ছেটোবড় জীবজন্তু মেরে খাদ্যের সংস্থান করা। তা ঘুরতে ঘুরতে দেখি, ছাগল আছে জঙ্গলে বিস্তর। সেটা মোটামুটি আমার পক্ষে শুভসংবাদই বলা যায়। কিন্তু এত লাজুক এত ভীরু প্রকৃতির। আর অসন্তুষ্ট গতি পায়ে। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে উধাও। তবে তাতে খুব একটা অসুবিধার কারণ নেই। কেননা আমার বন্দুকের গতিও কিছু কম নয়। একবারে না পারলাম, পারব তো মারতে কখনো না কখনো। শুধু ধৈর্য ধরে একটু

অপেক্ষা আর নজরটাকে নতুন ভাবে শানিয়ে নেওয়া। সঙ্গে ফনি। একটা তো আমি এই  
মধ্যে আবিষ্কার করে ফেলেছি। পাহাড়ের মাথায় উঠে তাক করে বসে থাকি। সামনের  
ছোটু উপত্যকা মতো। খানিকটা ঢালা জমি। সেখানে কচি কচি ঘাস। দেখি মূরে মূরে  
সেখানেই আসে ঘাস খেতে। মাথা কালে ভদ্রে উপর দিকে তোলে। তুললেও সে অল্প  
একটু। আমি যেখানে বসা তত অন্ধি চোখ যায় না। ফলে আমাকে দেখতে পায় না। তো  
দিলাম একদিন ঘোড়া টিপে। মরল একটা ছাগল। সঙ্গে তার আবার একটা বাচ্চা। দুধ  
খাচ্ছে। ভারি খারাপ লাগল মনটা। আহারে, বেচারার মা-টাকে মেরে ফেললাম! দেখি  
মরবার পরেও দুধের দ্বিটা থেকে মুখ সরায় না। তখন গিয়ে কোলে তুলে নিয়ে এলাম  
নিজের আস্তানায়। কিন্তু এক জ্বালা—কিছুতেই অন্য কিছু মুখে তুলবে না। বাচ্চা যে  
একদম। ঘাসপাতা খাওয়ার অভ্যেস যে হয় নি। তা শুকিয়ে মরবে, বরং আমিই মারি;  
থেয়ে ফেলি। হাত উঠছিল না মাঝতে, তবু উপায় নেই। আমারই হাতে শেষ নিশ্চাস ত্যাগ  
করল। মা-বেটা মিলিয়ে একলার পক্ষে যথেষ্ট মাংস। খেলাম তাই কদিন পেট পুরে। যাক,  
অন্তত কটা দিনের কুটি খরচ তো বাঁচল।



বারোটা খুদে খুদে দাগ টানলাম

আস্তানা বানাবার পর এখন আমার সামনে জরুরি কাজ হল আগুন জ্বালাবার মতো  
একটা জ্যাগা তৈরি করা। সেটা স্থার কাছাকাছি থাকলেই ভালো হয়। এবং কোনো  
একটা ঢাকা জ্যাগায়। অর্থাৎ সে আগুন আমি নিভতে দেব না কোনোদিন। অন্তকাল  
ধরে জ্বলবে। অন্তত আমি যতদিন এই দ্বিপে আছি ততদিন। পাঠক, এবার এই অবসরে  
আমার নিজের মনের অবস্থার কথা একটু শনে নিন।

স্বত্বাবতই মন আমার খারাপ। বিজ্ঞ বিভুঁয়ে এসে উঠেছি, জানি না কবে শেষ হবে  
এখনকার মেয়াদ, কবে পারব এখান থেকে ফের লোকালয়ে ফিরে যেতে—এই নিয়ে  
অহোরাত্র মনের খাজে খাজে একটা ব্যথা, একটা দুশ্চিন্তা গুমরে গুমরে বেড়ায়। এটাকে  
আমি নিয়তি বলেই মেনে নিয়েছি—আমার মন্দভাগ্য। ভাবতে বসলেই অনেক কথা মনে  
পড়ে যায়, চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে ফৌটায় ফৌটায় জল, আমার বুক যেন ছিড়ে টুকরো

টুকরো হয়ে যেতে চায়। তবু উপায় নেই। কেঁদে গলা চিরে ফেললেও কেউ শুনতে পাবে না আমার কাতর আহ্বান। কেউ আমার বেদনার কথা জানতেও পারবে না।

তবে হ্যাঁ, এসব চিন্তায় বুক যখন ভারি হয়ে ওঠে, তখন পালটা চিন্তাও এসে সান্ত্বনার ভাষা নিয়ে ঘনের আনাচে কানাচে ঘূর ঘূর করে। তখন আসে পালটা জিঞ্জাস। নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করি—আচ্ছা ছিলে তো তোমারা মোট এগার জন। একসাথে জাহাজে করে সবাই আসছিলে। বাকি দশজন কোথায় গেল; কেন তারা রক্ষা পায় নি? কেন বা একলা তুমি বিচে গেলে? কী এর উদ্দেশ্য? এও কি নিয়তির অমোগ নির্দেশ নয়? ভালো না মন্দ সেটা তুমি নিজেই ঠিক করে নাও।

তখন ঘনে একটু বল পাই। যাকে বলে নতুন উদ্যম আর সাহস। আরো যুক্তি তখন আসে। যেমন—জাহাজটা চড়ায় এসে আটকে থাকার কথা। ছিল সেই জন্যেই তো পেরেছি আমি মালপত্র নামিয়ে আনতে। টুকিটাকি জিনিস থেকে শুরু করে খাদ্য, বস্ত্র, পানীয়, এমন কি বন্দুক, তার গোলা বাবুদ—সব। এগুলো না পেলে আমার আজ কী দশা হত? আর এমনই ভাগ্যের খেলা—নামিয়ে আনলাম শেষ জিনিসটুকু, দেখতে না দেখতে প্রায় চোখের সামনে কোথায় কোন্ নিরুদ্ধেশে ভেসে গেল জাহাজ। এগুলো কি আমার পক্ষে মঙ্গলদায়ক নয়?

অবিশ্যি বাবুদ কিছুটা নষ্ট হয়ে গেছে। সেই বজ্জপাতের ফলে। সেটাকে আমি আর নিয়তির খেলা বলে ঘনে করি না। ধরে নিই ওটা কাকতালীয়। তবে সেটা যাতে আর না যাটে তার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা আমি গ্রহণ করেছি। তবু যেমন ডাকলেই আমারও বুক দুরু দুরু করতে থাকে। ঘাবড়ে যাই। ভাবি, বাজ পড়বে না তো আবার! তাতে ফের বাবুদ জ্বলে যাবে না তো?

মোটের উপর অনন্ত নির্জন নিরালা আমার জীবন। মজা নদীর নিখের জল যেরকম। তবে তারও মধ্যে একটা শৃংখলা আনা দরকার। যেমন কোথায় আছি আমি তার একটা হাদিশ। কবে প্রথম এসেছি এখানে তার হিসেব। কতদিন আছি তার একটা বর্ণনা। এগুলো দরকার। অন্তত পরে কোনো না কোনোদিন আমার নিজেরই দরকার হতে পারে।

মানচিত্র এনেছিলাম জাহাজ থেকে, তার হিসেব মিলিয়ে দেখলাম—আমি যে দ্বিপে আছি, সেটা অনামী, ন ডিগ্রী বাইশ মিনিট উন্নতি অক্ষরেখায় তার অবস্থান। আমি এসেছি এখানে ৩০শে সেপ্টেম্বর। আজ বার দিন পার হয়ে গেল। এরও একটা হিসেব রাখা দরকার। তখন একটা মন্ত গাছের গায়ে ছুরি দিয়ে খোদাই করে লিখলাম—আমি, এই দ্বিপে ১৬৫৯ সালের, ৩০ শে সেপ্টেম্বর এসেছি। তার পাশে বারটা শুদ্ধ শুদ্ধ দাগ কাটলাম। অর্থাৎ বার দিন আছি আমি এখানে। দিন যেমন বাড়বে, দাগও একটা একটা করে বাড়বে। মোটমাত এটাই হবে আমার আগামী দিনের দিন—মাস—বছরের ক্যালেন্ডার। খুচরো অনেক কিছুই এনেছি জাহাজ থেকে। তার উল্লেখ আগে করি নি। কেননা সেগুলো মূল্যবান তেমন কিছু নয়, কিন্তু দরকারী বটে আমার কাছে। যেমন কলম, কালি, কাগজ, কাপ্তনের নামাঙ্কিত কয়েকটা কাগজের মোড়ক, কম্পাস, জ্যামিতিক মাপ কষার কিছু যন্ত্রপাতি, কিছু নকশা, সমুদ্রে জাহাজ চালনা সংক্রান্ত কয়েকখানি বই, একখানা বাইবেল, পত্রগিজ ভাষায় লেখা খানকতক বই, তার মধ্যে একখানা প্রার্থনাগীতি ধরনের—সব যত্ন করে আমি তুলে রেখেছি আমার অন্যান্য মালপত্রের সঙ্গে। ফেলি নি একটাও। কখন কোনটা দরকার লাগে বলতে পারে না কেউ! তবে লাগবে যে দরকারে কোনোদিন এটা আমি স্থির জানি। হ্যাঁ, আরো তিনটে অন্য জাতীয় জিনিস এনেছি জাহাজ থেকে। সেটা

আগে বলতে আমার একেবারে ঘনে নেই। দুটি বেড়াল এবং একটি কুকুর। এরা জাহাজে আমাদের সাথে সাথেই ছিল। প্রথম যেদিন ভাঙা জাহাজ থেকে মাল আনতে যাই সেদিনই পরম যত্নে বন্দী বেড়াল দুটোকে ভেলায় তুলে নিয়েছিলাম। কুকুরটাকে কোলে করে নিয়ে আসার দরকার হয় নি। ভেলা ছাড়তে দেখে নিজে থেকেই লাফিয়ে পড়েছে জলে, তারপর সাঁতার কাটতে উঠেছে এসে ডাঙায়। সেই থেকে সে আমার পরম বিশ্বস্ত অনুচর। সুখ দৃঢ়ের সাথীও বলা যায়। ছিল একসাথে অনেক দিন। আমার তো মন্ত সুবিধে। এমন নয় যে ওকে দিয়ে খাটিব কি কোনো কাজ করাব। বলব, এটা নিয়ে আয় তো ওটা নিয়ে আয় তো। সে সব কিছু না। বরং বসে বসে কথা বলব ওর সাথে। সেইভাবে কিছুক্ষণ সময় কাটবে। কদিন পরে দেখি ব্যাপারটা বড় একতরফা। আমি একলাই বক বক করে মরি। তার চেয়ে বরং এক কাজ করি না। কলম আছে কালি আছে কাগজ আছে বরং লিখেই ফেলি সবকিছু। তাতে অন্তত নথি বলে একটা জিনিস থাকবে। তখন তাই শুরু করলাম। কিন্তু কালি এক সময় গেল ফুরিয়ে। সে যাকগে, নতুন করে, কীভাবে কালির প্রয়োজন মেটানো যায় সেটা পরের চিন্তা। কিন্তু যে কদিন কালি ছিল দোয়াতে আমি প্রতিটি হিসেব বিবরণী নির্ভুল ভাবে লিখে ফেলেছি খাতায়। যাতে বুকাতে কারো অসুবিধে না হয়।

অর্থাৎ কালির প্রয়োজনটা এক্ষেত্রে যত তীব্র, তেমনি প্রয়োজনীয় আমার কাছে কোদাল, কুড়ুল, বেলচা, সুচ, আলপিন, সুতো ইত্যাদি। সেলাই ফৌড়াইয়ে ইতোমধ্যেই বেশ ওস্তাদ হয়ে উঠেছি। জামা ছিড়লে এখন আর বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে সুচ সুতো হাতে বসে যাই।

তবে হ্যাঁ, অনেক কিছু আবার নেইও। সেটা কাজ করতে গেলে মালুম পাই। সে নানান জিনিস। ফলে কাজে অহেতুক দেরি হয়। যেমন একটা শাবল খুব দরকার। নেই। তাই তাঁবু খাটাতে বা মাটি খুঁড়ে মাটি তুলে দেয়াল দিতে সময় লাগল প্রায় দ্বিশুণ। কী করব, অন্যরকম জিনিস দিয়ে যে কাজ করতে হয়। তাতে সময় লাগে বেশি।

যেমন ধূরুন বড় করাত নেই। আছে একটা ছেটো হাত করাত। তা দিয়ে খুঁটি কাটতে হবে মাপ মতো তাঁবুর জন্য। দুদিন লাগল আমার খুঁটি কটা কাটতে। শাবলের অভাবে

### মন্দ

ভয়ঙ্কর নির্জন ধীপে আমি আটকে গেছি। কোনোদিন যে উদ্ধার পাব এখান থেকে সে আশায় ছাই।

এই যে সারা দুনিয়া থেকে বিছিনতা এটা আমার কাছে মর্যাদিক।

### ভালো

কিন্তু জীবিত আছি এটা অনেক বড় কথা। আমার সহযাত্রীদের মতো আমার সলিল সমাধি হয় নি।

বিছিন্ন সহযাত্রী দল থেকেও। সেটা আমার পক্ষে ঘঙ্গল। আমি এখনো জীবিত। জানি না নিছকই মিথ্যে আশা কিন। তবে আমার বিশ্বাস পরম করুণাময় ঈশ্বর যে আশ্চর্য উপায়ে আমাকে রক্ষা করেছেন ঠিক একই ভাবে একদিন না একদিন তিনি আমাকে এই সঙ্কট থেকে ত্রাণ করবেন।

মানব জগৎ থেকে আমি বিছিন। বা  
বলা যায় নির্বাসিত। মানুষের সঙ্গে  
আমার আর কোনোরকম যোগাযোগ  
নেই।

জীবনের প্রয়োজনে পোশাকেরও  
দরকার হয়। আমার সংগ্রহে পোশাক  
তেমন কিছু নেই।

যদি অতর্কিতে কোনো হিংস্ব জন্ম বা  
নরখাদক বর্ষারের দল আক্রমণ করে  
তাকে প্রতিহত করার মতো তেমন  
কোনো অস্ত্র আমার কাছে নেই।

এমন কেউ নেই যার সাথে আমি  
কথা বলতে পারি বা কোনো একটা  
সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে পারি।

একটা গোটা দিন গেল সেগুলোকে মাটিতে শক্ত  
করে পুঁত্তে। সে এক সীতিমতো ক্লেশকর অবস্থা। মাথার ঘাম পায়ে ঝরার উপক্রম।  
তাতে অবিশ্য দৃঢ় নেই আমার। হবেই বা কি দৃঢ় দিয়ে। আমি কি এখানে কোনো  
সরকারি অফিসে কাজ করি যে চৌপাহর আমাকে তাগাদা মেরে দু ঘণ্টার কাজ আধ ঘণ্টায়  
কেউ উঠিয়ে নেবে? নাকি আমার অন্য আরো নানান কিছু করার আছে যার জন্যে সময়  
আমার বেশি দেওয়া দরকার! দুটোর কোনোটাই না। কাজ বলতে আমার কেবল দুবেলা  
ভক্ষণ আর খাদ্যের রসদ সংগ্রহ করে আনা। আর বলা যায় সেই সাথে ঘুরে ঘুরে দীপটা  
ভালো ভাবে দেখা ও চেনা। সুতরাং সময় নিয়ে আমার অত মাথাব্যথা কীসের?

মেটামাট নিজের অবস্থা নিয়ে আমি কিন্তু বেশ গভীরভাবে ভাবতে শুরু করেছি।  
লিখেও ফেলেছি আমার বর্তমান অবস্থার বিবরণী। এমন নয় যে এটা কেউ দেখবে

কিন্তু তথাপি না খেয়ে আমাকে দিন  
কাটাতে হয় না। এমন নয় যে আমি  
অনাহারে মারা যাব বা কোনোভাবে  
আত্মরক্ষা করতে পারব না।

উষ্ণ আবহাওয়া মন্ডলে এখন  
আমার অবস্থান। পোশাক নেই তাই  
পোশাকের প্রয়োজনটা বেশি করে যন্তে  
হচ্ছে। থাকলে হয়ত পরবার প্রয়োজনও  
বোধ করতাম না।

দরকারও নেই তেমন কোনো  
অস্ত্রের। ঘুরে ফিরে তো দেখলাম  
কদিন। বর্ষার মানুষ দূরের কথা, হিংস্ব  
জন্ম অব্দি এই দ্বীপে একটিও নেই।  
আফ্রিকার উপকূলে যদি আমার  
জাহাজডুবি হত—সেই যেমন বজরায়  
চড়ে পালাবার সময় সেবার  
দেখেছিলাম—তাহলে যে কী দশা হত  
ভাবলে শিউরে উঠি।

জীবন নির্বাহ করার প্রয়োজনে কথা  
বলাটা কি একান্তই দরকার? কথা তো  
বলে মানুষ প্রয়োজনে। ইন্দ্রের দয়ায়  
ভাঙ্গা জাহাজ থেকে প্রয়োজন মেটাবার  
যাবতীয় জিনিস আমি নামিয়ে এনেছি।  
তাতে শুয়ে বসে কেটে যাবে আমার দীর্ঘ  
দিন। তবে আর ভাবনা কী!

সেইজন্যে লেখা। কিন্তু আগামী দিনে আমার লেখাটা উদ্ধার পাবে, তখন আমি হয়ত আর বেঁচে থাকব না—সেইজন্যে লেখা। এটা সম্পূর্ণ আমার নিজেরই জন্যে। নিজেকে যাচাই করার প্রশ্ন। নিজেকে নিয়ে ভাববার প্রশ্ন। ভালো কী কী আমার জীবনে সেটা যেমন বুঝবার প্রয়োজন আছে, মন্দ কী কী এবং কেন সেটাও তেমনি বোঝা দরকার। তা না হলে নিজের প্রকৃত অবস্থা আমি বুঝতে পারব কীভাবে।

আমার পক্ষে ভালো কী আর মন্দ কী তার যে তালিকা করেছি সেটা এইরকম :

মোটমাটি ভালোয় মন্দয় মিশিয়ে এই আমার বর্তমান অবস্থা। এটা যে গভীর দুঃখের জীবন—সারা দুনিয়া থেকে বিছিন্ন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবু ভালো যে সব দিক, তার জন্যে নিজের ভাগ্যকে আমি হাজার সেলাম জানাই। হয়ত এই অবস্থা আমার জীবনের ক্ষেত্রে দরকার ছিল। কত দুর্দশায় মানুষ পড়তে পারে। কতখনি মর্মান্তিক হতে পারে তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত—এ বোধ এরকম অবস্থায় না পড়লে আমি কল্পনাও করতে পারতাম না। তবে এরই মধ্যে ভালো যেটুকু সেটুকু আমার উপরি পাওনা। কথা তো নয় এই অবস্থায় কোনোরকম ভালোর দেখা পাওয়ার। তাই নিয়েই আমি সম্পৃষ্ঠ থাকি।

আর একটা কথা। ভাবি না এই সব নিয়ে আর বেশি কিছু। মাঝে মাঝে ঐ যে দেখার অভ্যেস—কোনো জাহাজের দেখা পাই কিনা—সেটাও ইদানীং বন্ধ করেছি। এখন কেবল নিজেকে মানিয়ে নেবার প্রশ্ন। এই পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেবার ব্যাপার। এবং একমাত্র চেষ্টা আমার কীভাবে কত নিপুণ ভাবে এখানে আমি বেঁচে বর্তে সুস্থ সবল স্বাভাবিক হয়ে থাকতে পারি।

তা আস্তানা তো একটা যা হোক খাড়া করেছি। পাহাড়ের ঢালে তাঁবু একটা। তার চারদিকে খুঁটি গেড়ে তারের বেড়া। কিছুটা অংশ আবার মাটি দিয়ে গাঁথা। অর্থাৎ দেয়াল। এটাকেই বছর দেড়েক ধরে খেটে খুটে কুটিরের আকৃতিতে নিয়ে এলাম। তুললাম চারধার দিয়ে চালা ঘর। কাঠকুটো এটা সেটা দিয়ে ছাওয়া হল চাল। তাতে একটা সাজ্জনা—বৃষ্টির হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। জল এসে তাঁবুর ভেতর অঙ্গি ভিজিয়ে দেয় না। সে যা ভয়কর বৃষ্টি সেখানে! যখন হৃড়মুড়িয়ে নামে আকাশ ভেঙে তখন রীতিমতো ত্রাস ধরিয়ে দেয়।

ঘর হ্বার পরই আসে ঘর গোছাবার ইচ্ছে। আমার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম কিছু নেই। গোছাতে গিয়ে দেখি—সে এক লণ্ডন কাণ। মালপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে তাঁবু গুহা সব একেবারে দখল করে রেখেছে। আক্ষরিক অর্থে যাকে বলে জুড়ে থাক। তাতে জ্বায়গা হয় না। তার উপর দরকার হলে হাতের গোড়ায় কোনো জিনিস চট করে খুঁজে পাওয়া যায় না। এক কাঞ্জ করলে কেমন হয়?—যদি গুহাটা ভিতর দিকে খানিকটা বাড়িয়ে নিই! তবে দরকারী মালপত্র আরো বেশি বেশি করে গুহার মধ্যে রাখতে পারব।

তখন শুরু হল বাড়াবার কাজ। এমন একটা কিছু পরিশুমারের ব্যাপার নয়। ঝুরো বালি মাটি। প্রথমে কাটলাম ডানধার দিয়ে খালিকটা। তারপর ফের আবার তার ডাইনে। দেখি খুঁড়তে খুঁড়তে কাটতে কাটতে সিধে বাইরে বেরিয়ে এসেছি। তা মন্দ কী। এটাকে নয় একটা দরজা করি। বড় মুখটা তো কাঠ দিয়ে আড়াল। থাক ঐ ভাবেই। এই দরজা দিয়েই নয় ঢুকব বেবুব।

বিড়কি দোর নাম দিলাম সেই দরজারটার। কিছুটা পেছন দিকে ঘেঁষা তো তাই। ঢুকলে মালপত্র যেখানে রেখেছি সিধে সেখানে। জ্বায়গাও বিস্তর। তখন সেখানে আরো

অনেক মাল এনে জড় করলাম।

কিন্তু দরকার আপাতত একটা টেবিল আর একটা চেয়ার। নইলে বজ্জ অসুবিধে। বসতে পারি না দুদণ্ড। মাটিতে বসে বা দাঁড়িয়ে খেতে কষ্ট হয়। লিখতে বসতেও বিশ্রী লাগে। মোটমাট খেতে পেলে শুভে চাওয়া যে রকম আমারও এখন একটু আরামের দরকার।

শুরু হল কাজ। কিন্তু সে কি আর চাট্টিখানি কথা! প্রথমত যন্ত্রপাতির অভাব। দ্বিতীয়ত এসব আজ করার অভ্যেস আমার কোনোদিনই নেই। এরও তো একটা হিসেব আছে রে বাপু। জানি আমি সেই হিসেব? কাঠ কাঠ, মেলাতে যাই, দেখি টেরা-বাঁকা হয়ে সে যাচ্ছেতাই চেহারা। তখন সেটা বাতিল করে ফের নতুন আরেক খণ্ড কাঠ নিয়ে কাজে লাগি। তা কাঠ কি আর আমার জন্যে কেউ নিয়ে যসে মেজে নিপুণ করে রেখেছে। তখন কাঠের দরকারে গাছ কাটতে হয়। সেটাকে করাত দিয়ে ফালি করতে হয়। করতে গিয়ে দেখলাম হয়ত বজ্জ পাতলা হয়ে গেল। কিংবা প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি পুরু। তখন ঘসো তাকে, পাতলা কর—সে এক বাঞ্ছাটাই বলা যায়।

তবে তাতে সাময়িক অশাস্ত্র হয় ঠিকই কিন্তু মজাও পাই। সময়ের তো এখানে আমার কোনো মূল্য নেই। কোনো কাজে বেশিক্ষণ লাগলে কেউ তো আর জবাবদিহি চাইবে না। তো ভাবনা কীসের। বিস্তর খাটাখুটি করে অনেক দিন পরে বানালাম চেয়ার আর টেবিল। অমনি কটা তাকও তৈরি করলাম। সেটা আবশ্যিক কম বাঞ্ছাটের। কেননা জাহাজ থেকে আনা চেরা কাঠগুলো সঙ্গেই ছিল। শুহার দেয়ালে তাই থাকে থাকে বসিয়ে দিলাম। নিচে দিলাম মস্ত বড় বড় পেরেক আটকে। আর চিন্তা কীসের। মাল রাখব এবার থেকে এই সব তাকে। সাজালাম তাক। দরকারী যাবতীয় জিনিস এনে রাখলাম। হাতের গোড়ায় বলতে যা বোঝায় আর কি। সে ভারি আনন্দ। খুঁজতে হয় না মোটে, জিনিস হাটকাতে হয় না, হাত বাড়ালেই নাগাল পাওয়া যায়। এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে।

আর টেবিল চেয়ার দুটোই যখন আছে, তখন লিখতে বসতেই বা অসুবিধা কি। শুরু হল লেখা। একে বিবরণী বলাই ভালো। আমি তো আর লেখক নই। ঘটনা যেমন যেমন ঘটছে বা ঘটেছে, আমি লিখে রাখছি পর পর। নথিবদ্ধ করা বলতে যা বোঝায়। হয়ত এইভাবে শুরু করলে ভালো হত: ‘৩০শে সেপ্টেম্বর। অনিবার্য মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়া আমি ডাঙ্গায় উঠিলাম। সৈরকে ধন্যবাদ দিবার কথা সেই মুহূর্তে আমার মনে হয় নাই। কেননা পাকস্থলীতে প্রভৃতি পরিমাণে লবণাক্ত জল। প্রথম কাজ সেগুলি বর্ষি করিয়া বাহির করা। তাহাই করা হইল। কিছুটা সুস্থ বোধ করিতে লাগিলাম। তখন মনের মধ্যে কেবলই অনুত্তাপ আর দৃঢ়ব্যোধ। এ কোথায় আসিলাম আমি। কী আমার পরিণতি! অবোধ বালকের মতো তখন কেবলই ত্রন্দন আর অশ্রুপাত। কান্দিতে কান্দিতে কখন জ্ঞান হারাইয়াছি জ্ঞানি না। জ্ঞান ফিরিয়া আসিতে দেখিলাম আমি ঘাসের উপর শুইয়া আছি। শরীর প্রচণ্ড দুর্বল। চোখ যেন ঘুমে জড়াইয়া আসিতে চায়। কিন্তু অদূরে যে বনরাজি দেখিতেছি—উহাতে কি হিস্ম, কোনো জন্ম আছে? আমাকে কি অতর্কিংতে আসিয়া গ্রাস করিবে? সেই ভয় লইয়াই আমি একটু পরে নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িলাম।

সম্ভব হয় নি এভাবে আমার পক্ষে লেখা। ভাষার এত কারিকুরি আমার জ্ঞান নেই। সাদা-মাটা ভাবেই লিখেছি যেমন কলম এগিয়েছে ঠিক তেমনি। ভাঙা জাহাজ থেকে

দিনের পর দিন নানান জিনিসপত্র নিয়ে আসার বিবরণ যে ভাষায় আছে, একই ভাষায় বলা হয়েছে আমার হতাশার কথা—যখন বারে বারে পাহাড়ের মাথায় উঠে একটাও জাহাজ না দেখতে পেয়ে দৃঢ়ত্বে বেদনায় আকুল হাদয়ে শিশুর মতো আমি হাত পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসেছি। তা-ও।

মোটমাট আমি যে কথাটা বোঝাতে চাই—সহজ সরল অনাড়ম্বর আমার এই বিবরণী। ৩১ তারিখ থেকেই শুরু। যদিও আরম্ভ করেছি অনেক পরে। টেবিল চেয়ারে আর কোনো অসুবিধে নেই। কাগজও বেশ কিছু আছে। তবে কালিটাই যা সমস্যা। শেষ হয়ে যাবে কিছুদিনের মধ্যে আমি জানি। তারপর আর লেখার কোনো উপায় থাকবে না। তবে যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। দেখা যাক, কবে ফুরোয় আর কতখানি অব্দি আমি লিখতে পারি।

## বিবরণী

৩০শে সেপ্টেম্বর ১৬৫৯॥ হতভাগ্য আমি। রবিন্সন ক্রুসো আমার নাম। বড়ের মুখে পড়েছিল আমাদের জাহাজ। ছন্দছাড়া বিপর্যস্ত। রক্ষা পেয়েছি কোনোক্রমে। উঠেছি এসে এই দ্বীপে। এ-ও এক হতভাগ্য দ্বীপ। এর নাম দিয়েছি আমি হতাশার দ্বীপ। আমার সহযাত্রীরা কেউ আর বেঁচে নেই। জলের বুকে তলিয়ে গেছে কে কোথায় কে জানে। একলা আমিই কোনোক্রমে মৃত্যুর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছি।

সারাটা দিন এই নিয়ে আমার কী অনুভাপ। আর কত অশুবর্ণ! এ কোথায় এলাম! খাব কী আমি? জামা কোথায়, বাড়ি কোথায়! থাকব কোনখানে? কী পরব? অস্ত্রও তো নেই যে বাঁচাব নিজেকে। কত হিংস্ব জন্ম আছে, কে তার খোঁজ রাখে। নরখাদক মানুষও তো থাকতে পারে। হয়ত অনাহারে মরতে হবে আমাকে। এই সব চিন্তা একের পর এক। শেষে রাত ঘনিয়ে এল। তখন একটা গাছের উপর উঠে শক্ত করে ডালের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে সুমিয়ে পড়লাম। কী যে শান্তি! সারা রাত ধরে বৃষ্টি হল। বৃষ্টির মধ্যেই আমি অঘোরে ঘুমোলাম।

১লা অক্টোবর॥ সুম থেকে উঠে দেখি অবাক কাণ। আমাদের জাহাজটাকে ঠেলতে ঠেলতে ঢেউ এনে কুলের কাছে বালির চড়ায় তুলে দিয়ে গেছে। কাত হয়ে রয়েছে জাহাজ। তবে ডাঙা থেকে সে অনেকখানি দূর। আর চারধারে জল। সাঞ্চনা এই, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় নি বা উলটে পড়ে নি। তার মানে মালপত্র যা ছিল জাহাজে সবই ঠিকঠাক আছে। মনে খানিকটা ভরসা পেলাম। নিজের দরকার মতো খাবার দাবার তাহলে নিয়ে আসা যাবে। সাথীদের কথা ভেবে বুকটা যেন ভেঙে গেল আমার। তড়িঘড়ি ঢেউয়ের মাথায় ডিঙি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়লাম, যদি থাকতাম জাহাজে তবে হয়ত এ দশা আজ হত না। পারতাম যেন-তেন-প্রকারে জাহাজ সমেত নিজেদেরকেও রক্ষা করতে। যদি জাহাজ যেত, ভেঙে, তাতেই বা পরোয়া কী। রইলাম তো আমরা সবাই জীবিত। ভাঙা জাহাজের কাঠ কুটো দিয়ে নয় বানিয়ে নিতাম ডিঙি। তাইতে করে সমুদ্রে পাড়ি জমাতাম। এই সব নানান চিন্তা ভরে রাখল মন। গেলাম হাঁটতে হাঁটতে জাহাজের কাছে। দেখি শুকনো একদম, খটখটে। তখন সাঁতার কেটে ঘুরে পেছনধার দিয়ে জাহাজে গিয়ে উঠলাম। আজও বৃষ্টির কামাই নেই। তবে সাঞ্চনা এই, হাওয়ার দাপট আজ কম।

চরিশ তারিখ অন্ধি আমি ভীষণ ব্যস্ত। বারে বারে পায় প্রতিদিনই একবার করে জাহাজে যাই। নিয়ে আসি যা চোখে পড়ে সব। ভেলায় করে। বৃষ্টি আছে। তবে মাঝে মাঝে আকাশ পরিষ্কার হয়। এটা বর্ষাকাল।

২৪শে অক্টোবর॥ আজ্জ ভেলাটা উলটে গেল। নিজের ভুল বলব না, আসলে স্নোতের টানে পড়ে টাল সামলাতে পারি নি। জিনিস-পত্র সব গেল জলে। আমিও জলে হাবুড়বু থেতে থেতে সামলে নিলাম। তবে গভীর জল নয়। লোহালঙ্কড় জাতীয় যা যা ছিল তা ছাড়া বাকি সব হাতড়ে উদ্ধার করলাম। অনেক কিছু জলের নিচেই রয়ে গেল।

২৫ শে অক্টোবর॥ সারাদিন সারারাত ধরে আজ বৃষ্টি। সঙ্গে বাতাসের দাপট। কোথায় যে ভেসে গেল জাহাজ, না কি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে গেল তাই বা কে জানে। বাতাসও একটু একটু করে বাড়ছে। আজ আর বাইরে বেরলাম না। সামলে সুমলে রাখলাম মালপত্র। সেটাই আজকের প্রধান কাজ। বৃষ্টির হাত থেকে তো সব কিছু রক্ষা করতে হবে।

২৬ শে অক্টোবর॥ সারাদিন ঘুরে বেড়ালাম আজ আস্তানা কোথায় করা যায় তার খোঁজে। রাত্রে নিরাপদে ঘুমোতে হবে। তা ছাড়া হিংস্ম জীবজন্মের আক্রমণের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করাটাও বড় কথা। পেলাম মনের মতো জ্ঞান্যগা বিস্তর ঘোরাঘুরির পর। পাহাড়ের গায়ে একটা গুহা। মোটামুটি যা চাই আমি সেইরকম। মাটির একটা দেওয়াল তুলব চারিদিকে। তার ওপরে তারের বেড়া। ব্যস, আর আমাকে পায় কে। কে আর আমার নাগাল পাবে।

২৬ থেকে ৩০ শে অক্টোবর॥ নতুন আস্তানায় এনে তুললাম যাবতীয় জিনিসপত্র। কটা দিন এতে কেটে গেল। বৃষ্টি হল মাঝখানে খানিকটা। তবে সে নাম মাত্র। আমার কাজ বন্ধ করার মতো কিছু নয়।

৩১ অক্টোবর॥ ভোর বেলা বেরলাম বন্দুক কাঁধে। দুটো মতলব আমার।—শিকার করে খাদ্যসংস্থানের ব্যবস্থা করা আর এই ফাঁকে যতখানি সম্ভব দ্বীপের চারধার ঘুরে দেখে আসা। এক ধরনের অভিযান বলা যায়। শিকার বলতে পেলাম একটা ছাগল। সঙ্গে তার বাঢ়া। বাঢ়াটাকে কোলে করে গুহায় নিয়ে এলাম। ভেবেছিলাম পুষব। কিন্তু সে আর হয়ে উঠল না। কিছু থেতে চায় না সে। তখন তাকেও মেরে ফেলতে হল।

১লা নভেম্বর॥ গুহার সামনা সামনি পাহাড়ের ঢালে একটা তাঁবু খাটালাম। সেখানেই কাটালাম রাত্। বেশ বড় সড়। জ্ঞান্যগা বিস্তর। মালপত্র সব রাখলাম চার ধারে টাল দিয়ে।

২রা নভেম্বর॥ আজ বেড়া বাঁধার কাজ শুরু। ভেলা বানিয়েছি যত কাঠ দিয়ে সব জড় করে খুঁটি গেড়ে সেগুলো পেরেক পুতে আটকে দিলাম। বেশ মজবুত হল। সঙ্গে তারের টানা দেওয়া। নিরাপদই বলা যায়।

৩রা নভেম্বর॥ বন্দুক নিয়ে আজও বেরলাম ভোর সকালে। দুটো মুরগি মারলাম। দেখতে অস্তুত। অনেকটা পাতিহাসের মতো। মাংস অতি সুস্বাদু। বিকেলে টেবিল বানাতে বসলাম।

৪ঠা নভেম্বর॥ কাজের ব্যাপারে এবার একটা শৃঙ্খলা দরকার। অর্থাৎ নিয়ম মাফিক এবার থেকে চলতে হবে। এইভাবে সাজালাম সারাদিনের হিসেব।—সকালে বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়ব, ঘুরব দু থেকে তিন ঘণ্টা। বৃষ্টি হলে সেটা অবশ্যি বন্ধ থাকবে। ফিরে এসে এসব টুকিটাকি কাজ নিয়ে। চলবে এগারটা অন্ধি। তারপর দুপুরের খাবার খাব। বারটা থেকে দুটো অন্ধি একটানা ঘুম। এটা দরকারও। কেননা প্রচণ্ড গরমে দুপুরে বসে কাজ

করা দায়। বিকেলে ফের বসব কাজ নিয়ে। মোটোটি টেবিলটা আমাকে বানাতেই হবে। পাকা ওস্তাদ তো আমি ছুতোরের কাজে! কিছুতেই আর হিসেব মাফিক কিছু করে উঠতে পারি না। তবে সে যাই হোক। কাজটা যেভাবে হোক শেষ করতে হবে।

৫ই নভেম্বর॥ কাঁধে বন্দুক, পেছনে পেছনে আসছে কুকুর—যথারীতি আমি ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে বেরিয়ে পড়লাম। একটা বন বিড়াল মারলাম গুলি করে। বেশ তুল তুলে নরম চামড়া, কিন্তু মাংস একেবারে বিস্বাদ। মুখে মোটে ঢেকাতেই পারি না। যা বিশ্রী তার স্বাদ! ফেলে দিলাম সব। তবে চামড়াটা নয়। চামড়া আমি সব কটাই রেখে দিই। যখন যে জীব যারি প্রত্যেকের ! এলাম সমুদ্রের ধারে। দেখি এক বাঁক মোরগ। এদের ধরন আলাদা। সম্ভবত সামুদ্রিক জীব। আর দেখি দুটো শীল মাছ। বাপরে হঠাতে দেখে আমার যা ভয়! দেখি নি সাক্ষাৎ আগে কোনোদিন। তবে ভয় তারাও কিছু কম পায় নি। একটু পরে সৃড়সৃড় করে জলের নিচে তলিয়ে গেল।

৬ই নভেম্বর॥ প্রাতঃস্মরণের পর যথারীতি টেবিল নিয়ে কাজে বসলাম। আজ শেষ করতেই হবে। বহু কষ্টে শেষ হল। তবে সে এক বিত্তিকিছি চেহারা। মোটে পচাশ হল না আমার নিজেরই। তবু কী আর করা—যাহোক হল তো একটা টেবিল।

৭ই নভেম্বর॥ আবহাওয়া আপাতত বেশ চমৎকার। ১২ তারিখ অঙ্গি ক'দিন ধরে একটানা চলল আমার চেয়ার বানাবার কাজ। বিস্তর ছেঁটা চরিত্র করে সেটাকে মোটামুটি একটা চেহারায় আনা গেল। তবে ঐ—আমার নিজেরই অপছন্দ। তা-ও তো কতবার কতরকম বদলাবদলি করলাম। ই�্যা, ভালোকথা। রবিবারের হিসেব রাখতে মাঝখানে হঠাতে একদিন ভুল হয়ে গেছে। সেই থেকে বে-হিসেবেই চলছে রবিবারের দিনটা। তা নিয়ে অবিশ্যি আমার বিশেষ মাথাব্যথাও নেই।

১৩ ইনভেন্টরি॥ বৃষ্টি হল ঝমঝমিয়ে। তাই শান্তি। কী যে গরমে হাঁসফাঁস করেছি কটা দিন! সঙ্গে বজ্র বিদ্যুতের দাপাদাপি। তাতে করে খানিকটা বারুদে আগুন ধরে গেল। হায় হায়, সে যা দুঃখ আমার! তখন বসে বসে ছোটো ছোটো অনেকগুলো পুরিয়া বানালাম। বাকি যা বারুদ আছে তাই দিয়ে। তখন নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আমার এত দরকারী জিনিস—সব একসাথে পুড়ে নষ্ট হবার আর তো সুযোগ রইল না।

১৪-১৬ই নভেম্বর॥ বিস্তর ছোটোছোট চোকোনা কাঠের বাক্স বানালাম তিনদিন ধরে। এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। একেকটার আকৃতি একেক রকম। কোনোটাতে ধরবে এক পাউন্ড বারুদ। কোনোটাতে দু পাউন্ড। পুরিয়াগুলো ফের ভেঙে আলাদা আলাদা করে বাক্সে ভরলাম। রাখলাম গুহার একদম ভিতর দিকে। সম্পূর্ণ নিরাপদ এবার। একটা পাখি মারলাম বড়সড়। কী পাখি জানি না। তবে যাংস খুব সুস্বাদু। কদিন বেশ আয়েস করে খাওয়া গেল।

১৭ই নভেম্বর॥ গর্ত খুড়ে গুহাটাকে আরো বড় করার কাজ আজই শুরু হল। কিন্তু সে কি আর শুধু হাতে পারা যায়! ঢাল নেই তলোয়ার নেই..... এক্ষেত্রে ঢাল তলোয়ার বলতে একটা শাবল, বেলচা একটা, আর ঝুড়ি বা ঐ জাতীয় কিছু। কিছুই তো নেই। তখন কাজ বন্ধ করে বসলাম প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জাম বানিয়ে নিতে। ছিল লোহার একটা মস্ত আংটা মতো। সেটাকেই সিধে সাধা করে বানানো হল শাবল। কিন্তু বেলচা বানাব কী সিং? নেহাত কোদাল হলেও চলত। কিন্তু বানাবার যে কোনো উপকরণ নেই।

১৮ই নভেম্বর॥ বেরলাম ভোর বেলা যথারীতি। আজ সিধে জঙ্গল। কাল রাতেই ভেবে রেখেছি আমি মতলবটা। লোহার অভাবে এক্ষেত্রে কাঠ দিয়ে আমার প্রয়োজন

মিটিয়ে নেব। তা খুঁজতে দেখি সঠিক জিনিসটিই একেবারে চেখের গোড়ায়। মন্ত্র একটা গাছ। ব্রাঞ্জিলে এই গাছের কাঠকে বলে লোহা কাঠ। লোহারই মতোন শক্ত আর সেই অনুযায়ী ভারী। ঘোটাসোটা দেখে একটা ডাল কাটিব বলে মনস্থির করলাম। কিন্তু সে কি আর সহজে পারা যায়! কূড়ুল ঘোটে বসতে চায় না। ভৌতাতোতা হয়ে সে তো যাচ্ছে তাই অবস্থা। সে যাই হোক, ডাল অবশ্যে কাটা গেল। নিয়ে যাব কাঁধে করে। পারি না তুলতে। যা প্রচণ্ড ভারী! বহুকষ্টে অবশ্যে খানিকটা দড়ি বেঁধে টানতে টানতে খানিকটা বয়ে সেটাকে তাঁবুর সামনে এনে ফেললাম।

আর তাকে কেটেকুটে মাপ মতোন করা, তাই দিয়ে বেলচা বানানো—সে যে কী ঝকঝিরি ব্যাপার তা আপনারা আশা করি সহজেই অনুমান করতে পারছেন। তবু পারলাম শেষ অর্জি। এটাই যা সাম্ভনা। হাতলটা হাতলের মতোই হল। অবিশ্যি লোহার একটা বেড় মতো থাকে, সেটা বাদ। বেশিদিন টিকিবে বলে মনে হয় না। আসলে জোরটা তো হাতলের উপরই পড়ে। তবে কাজ চালাবার পক্ষে চমৎকার। এটা আমাকে স্বীকার করতেই হবে।



বহুকষ্টে অবশ্যে খানিকটা দড়ি বেঁধে টানতে টানতে.....

এবারে দরকার একটা ঝুড়ি। অথবা একটা ছোটো চার চাকার গাড়ি। ঝুড়ি বুনবার জন্যে বিস্তর খোজাখুজি করলাম কদিন। বেত তো নেইই, উপরন্ত এমন কোনো গাছ নেই যার কচি ডাল দুমড়ে মুচড়ে গোল করে ঝুড়ি বোনা যায়। সেক্ষেত্রে চাকার গাড়িটা তবু খানিকটা সন্তু ব। সব পারব শুধু চাকা বাদে। কেননা চাকার জন্যে লাগবে লোহা। লোহার ডাণাটা লাগানো থাকবে গাড়ির নিচে, তার সঙ্গে লাগানো থাকবে চাকা। কীভাবে লাগাব? কোথায় বা পাব লোহার ডাণা? সুতরাং এটাও আপাতত খারিজ? তখন বুদ্ধি খাটিয়ে একটা কাঠের মন্ত্র চেটানো থলো মতো বানালাম। এতে করে দেখেছি মিস্ত্রী মন্ত্রুরেরা বাড়ি তৈরির সময় চুন সুরক্ষী মাখা লেই বয়ে নিয়ে যায়। সে যাই হোক। আমার কাজ তো এতে চলবে।

ঘোটমাট চারদিন লাগল আমার এই সব বানাতে। উদয়ান্ত বলতে গেলে খাটুনি। শুধু সকালের প্রাতঃঅমগ্নিকু বাদ। এটা আবার বমবামিয়ে বৃষ্টি না পড়লে বক্ষ হয় না। বন্দুক

ঘাড়ে শুম থেকে উঠেই ঠিক রোজকার নিয়ম মতো বেড়িয়ে পড়া। তাতে লাভও প্রচুর। ফেরার সময় প্রতিদিনই কিছু না কিছু শিকার আমার সঙ্গে থাকে।

২৩ শে ডিসেম্বর॥ অন্য সব কাজ এখন বরবাদ। শুধু নতুন তৈরি সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে গুহার আয়তন বাড়াবার কাজ। লাগল মোট আঠার দিন। আগে যতটুকু জায়গা ছিল গুহায়, এখন তার প্রায় দ্বিগুণ।

মোটামুটি এতখানি বাড়াব এই মন নিয়েই আমি কাজ শুরু করেছিলাম। একাধারে আমার ভাঙ্গার ঘর, বৈঠকখানা, রান্নাঘর, আর তাক। সব আমি গুহাতেই করতে চাই। নিজে এখানে থাকব না, শোবো রাস্তির বেলা তাঁবুতেই। কিন্তু মালপত্রগুলো তো সব রাখতে পারব। তাতে শুকনো থাকবে, ভাঙ্গার ভয় নেই, এমন কি আগুনে পুড়বারও। তবে তাঁবুতে বৃষ্টি বেশি হলে ধার দিয়ে জলের ছাঁট আসে। এটা অস্বস্তিকর। তখন চার পাশে কখনো খুঁটি গেড়ে কাঠকুটো পাতা দিয়ে চালা মতো একটা তুললাম। বারান্দাও বলতে পারেন। ঢাকা বারান্দা। তবে নিশ্চিন্ত। যাক, বৃষ্টির হাত থেকে তো রক্ষা পাওয়া গেল।

১০ই ডিসেম্বর॥ গুহা বাড়াবার কাজ শেষ, হঠাতে একদিন একটা অংশ থেকে খানিকটা মাটি ধসে পড়ল। আমি তো থ। ভয়ও পেয়ে গেছি খুব। যদি থাকতাম আমি এখন ঐ অংশে ! তবে তো জ্যান্ত কবৰ। নতুন করে কবর খুঁড়ে মৃতদেহ শোয়াবার আর ব্যবস্থা করতে হত না। (অবিশ্য এই বিজন বিভুঁয়ে কেই বা করবে সে ব্যবস্থা !) সে যাই হোক, কাজ খানিকটা বাড়ল। মাটি তুলে ফেলে দিলাম বাইরে। ছাদটাকেও মেরামত করা দরকার। মোটামুটি নিশ্চিন্ত হতে চাই, এরকম ধস ভবিষ্যতে আর কখনো নামবে না।

১১ই ডিসেম্বর॥ মেরামতির কাজে আজ থেকেই লেগে পড়েছি। একদিনে হ্বার নয়। বামেলা যে অনেক। লাগল মোট সাতটি দিন। খুঁটি গাড়লাম ভিতরে বেশ কয়েকটা। খুঁটির মাথায় চেরা কাঠ দিলাম সেটে। এইভাবে বলতে গেল আগাগোড়া ছাদটাই। তাতে এক ঢিলে দু পার্শি মারা হল। ছাদের সুরক্ষা, সেই সাথে খুঁটি দিয়ে ঘরের মধ্যে মোটামুটি একটা ভাগাভাগি মতো। অর্ধাং এ খুঁটি থেকে ঐ খুঁটি অন্দি রান্নাঘর। ওটা থেকে এটা অন্দি ভাঙ্গার। এই রকম।

১৭ই ডিসেম্বর॥ ২০ তারিখ অন্দি নাগাড়ে করলাম তাক লাগাবার কাজ। খুঁটির গায়ে পেরেক পুতলাম একরাশ। সব জিনিস তো আর বসিয়ে রাখা যাবে না, কিছু কিছু ঝুলিয়ে রাখারও দরকার হবে। তা হল সে ব্যবস্থা। এবার খিড়কি দোরটার দিকে নজর দিতে হবে।

২০ শে ডিসেম্বর॥ যাবতীয় মালপত্র গুহায় নিয়ে এলাম। এবার সাজিয়ে রাখবার পালা। আরো কটা তাক লাগাতে হল। এদিকে চেরা কাঠের টানাটানি। কত আর থাকতে পারে, সবই তো মোটামুটি এটা নয় ওটা নানান কাজে লাগানো। ইতোমধ্যে আরেকটা টেবিলও বানিয়েছি।

২৪শে ডিসেম্বর॥ আজ সকাল থেকে মুষলধারে বৃষ্টি। চলল সারারাত। আমি বাপু গুহার মধ্যে খুটিসুটি মেরে সারাদিন বসা। বাপরে বাপ, এই বৃষ্টিতে কোনো সুস্থ মানুষ বেরতে পারে !

২৫শে ডিসেম্বর॥ সারাদিন আজও বৃষ্টি।

২৬শে ডিসেম্বর॥ বৃষ্টি আজ আর নেই। আবহাওয়া ঠাণ্ডা। বেশ চমৎকার লাগছে।

২৭ শে ডিসেম্বর॥ একটা ছাগল মারলাম। আরেকটা পায়ে লেগেছে গুলি, যথেষ্ট

জখম, আমি গলায় দড়ি বেঁধে টানতে টানতে তাঁবুতে নিয়ে এলাম। খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখলাম। দেখি পা-টা ভেঙেছে। লতা পাতা দিয়ে বাঁধা ছাদা করে দিলাম। সারল ধীরে ধীরে পা। পোষও মানল। না মনে উপায় কী। এতদিন ধরে এত সেবা, এত যত্ন, তার তো একটা প্রতিদান বলেও জিনিস আছে! ঘাস থেত কুচকুচ করে। আমার তাঁবুর সামনেই তো কত ঘাস! যেত না কোথাও। দেখে দেখে আমারও মনে খেলে গেল নতুন মতলব। তাই তো, এমন কয়েকটা জীব ধরে এনে পোষ মানালে কেমন হয়। ঘরের থেকে তো আর কিছু দেবার দরকার হবে না। বরং বাবুদ ফুরিয়ে গেলে এরাই আমার দিনের দিন অন্ন যোগাবে।

২৮-৩০ শে ডিসেম্বর॥ ভৌষণ গরম। একটুও হাওয়া নেই। প্রাণ একেবারে উষ্টাগত। গাছের পাতা একটু নড়ে না পর্যস্ত। বিকেলে সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়লে আমি শিকারের অব্যেষ্টগে বেরই। আর সারাদিন ছায়ায় বসে দরজা তৈরি নিয়ে খুটখাট করি।

১লা জানুয়ারি॥ প্রচণ্ড তাপ। কমে নি একটুও। ভোর সকালে বেরিয়ে যাই, সূর্য উঠতে না উঠতে ফিরে আসি। ফের বেরই বিকেলে। দুপুরে চিংপাঁ বিছানায় শোয়া। আজ বিকেলেই একটা নতুন আবিষ্কার হল। পাহাড়ের ওপাশটায় ঢলে গিয়েছিলাম। দেখি মনোরম এক উপত্যকা। সেখানে প্রচুর ছাগল ঘুরে ঘুরে ঘাস খাচ্ছে। বড় লাজুক তো ওরা। আমাকে দেখা মাত্র সে যা ছুট! ক্লাল কুকুরটাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসব। গুলি না চালিয়ে দেখি একটাকেও ধরতে পারি কিনা।

২রা জানুয়ারি॥ আজ সাথে কুকুর নিয়ে এসেছি। লেলিয়ে দিলাম। দেখি উলটো ব্যাপার। শিং উচিয়ে দল বেঁধে সবাই এককাটা হয়ে দাঢ়াল। কুকুর মশাই তো হতভম্ব। এমন যে হতে পারে আমার মতো সেও তো আশা করে নি। দেখি মানে মানে পিছু হটতে লেগেছে।

৩রা জানুয়ারি॥ মাটির দেয়াল আর তারের বেড়াটা নিয়ে ফের উঠে পড়ে লেগেছি। কেবলই মনে ভয় পাছে কেউ যদি অতক্রিতে আক্রমণ করে। মোটমাট আরো পুরু করতে হবে দেয়াল এবং আরো পোক।

[ ১৪ই এপ্রিল অব্দি একটানা দেয়াল নিয়ে লেগে রইলাম। অন্য কিছু করার সময় আর মোটে করে উঠতে পারি না। এমন একটা বিরাট কিছু নয়। মাত্র ২৪ গজ লম্বা ঘোরানো দেয়াল। একদিক থেকে অপরদিক চওড়ায় মাত্র ৮ গজ। তাঁবু আর গুহা দুটোই দেয়ালের গুরুতর মধ্যে। গুহার দরজাটা ঠিক ঘাব বরাবর। ]

সে একেবারে উদয়াল্প খাটুনি। মাঝখানে হপ্তা বলতে গেলে একটানা বৃষ্টি হল। তাতে ক্ষতি হল কাজের। কিন্তু আমারও সেই এক গোঁ।—যেভাবে হোক, দেয়ালটা গড়ে তুলতেই হবে। এটা আমার নিরাপত্তার জন্যে একান্ত দরকার। জঙ্গল থেকে কাঠের খুঁটি কেটে আনা থেকে শুরু করে মাটি কাটা, মাটি তোলা, তাকে কাদা করা—সব এই দু হাতে। এ যেন অসাধ্য সাধনের মতো ব্যাপার।

তা দেয়াল যখন শেষ হল, আমি স্বত্ত্বির ইঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। হয়েছে বেশ খানিকটা উচু। এমনকি জাহাজ যদি আশেপাশে আসে, হঠাৎ দেখে কেউ বুঝতে পারবে না এটা পাহাড়েরই অংশ না আর কিছু। মনুষ্য-বসতির বিন্দু-মাত্র লক্ষণ তাদের নজরে পড়বে না। না পড়ুক। আমিও সেটাই চাই।

তাই বলে কাজে যেহেতু ব্যস্ত, ভাববেন না, রোজকার শিকার করা আমি ছেড়ে দিয়েছি। শুধু বৃষ্টি হলে যা অন্য ব্যবস্থা। আর বেরলে সে যে কত নতুন নতুন আবিষ্কার। এক একটা আবিষ্কার হয় আর প্রাণ মন আনন্দে নেচে ওঠে। একদিন দেখি এক ঝাঁক

বন-পাহাড়। তারা গাছে থাকে না, পাহাড়ের গায়ে ফাঁক ফোকরে বাসা বেঁধে বাস করে। একদিন কয়েকটা ফোকরে হাত চুকিয়ে নিয়ে এলাম কটা বাচ্চা। পুষ্লাঘ। হল বড়। ওমা, দেখি একদিন ফুড়ুৎ। সে যা দৃঢ় আমার! অবিশ্য ওদের দোষ নেই। খাবার তো কিছু দিতে পারি না। কদিন আর পারে, দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করতে! তা আমিও হাল ছাড়বার পাত্র নই। ফোকরে হাত গলিয়ে প্রায়ই নিয়ে আসতাম একটা কি দুটো বাচ্চা। কদিন পুষ্ট তারপর কেটে কুটে খেতাম। অপূর্ব সুস্বাদ মাসের।

অর্থাৎ বলা যায় ইদানীং আমি নিজেকে নিয়ে অতিশয় ব্যস্ত। ঘর গেরস্থালি সাজানো থেকে শুরু করে রান্না বান্না সব এই দুহাতে। কিন্তু নানান জিনিস যে এখনো আমার দরকার। প্রয়োজন যে একটু একটু করে বাড়ছে। যেমন জল রাখবার একটা কুঁজো বা কলসী আমার অবিলম্বে চাই। কোথায় পাব কলসী? বর্ষাবাদলের দিনে ঘরে আগে থেকে জল তুলে না রাখলে বড় অসুবিধে হয়। চেষ্টা করলাম বিস্তর। প্রথমে ঘাটি দিয়ে, তারপর কাঠ দিয়ে। কিছুতেই আর হয়ে উঠে না। যেমন ভাবে বানাই, কোথাও না কোথাও টুইয়ে পড়ার একটা জায়গা থেকে যায়। তাই দিয়ে পড়ে যায় সব জল। তখন বাধ্য হয়ে সে চেষ্টা পরিত্যাগ করলাম।

বাতিরও খুব দরকার বোধ করি। বাতির অভাবে সঙ্গে লাগতে না লাগতে আমাকে শুয়ে পড়তে হয়। সাতটা বাজে তখন মোটে। খানিকটা মোম পেলেও চলত। সেই যেমন আফ্রিকায় ছিল সঙ্গে, তাই দিয়ে নৌকোয় ঝালাতাম বাতি। এখন অবিশ্য খানিকটা চর্বি সম্বল। সেই একটা ছাগল মেরেছিলাম, তারই চর্বি জমিয়ে রেখেছি। রোদে নিয়েছি শুকিয়ে। বানিয়েছি ঘাটি দিয়ে একটা ছোট্ট থালা। তাতে শুকনো চর্বি রেখে তার মধ্যে দিয়েছি একটা ন্যাকড়ার পলতে। তাতেই ঝলে বাতি। আলো অবিশ্য তেমন একটা জোরাল নয়, তবু কাজ চলে আমার।

ইতোমধ্যে আর এক কাণ্ড। একদিন জাহাজ থেকে আনা এটা নাড়াচাড়া করতে গিয়ে দেখি ছোট্ট একটা থলি, তাতে কিছু শস্য দানা। এগুলো মুরগির খাবার। আমাদের জাহাজের সঙ্গেই এসেছে। তবে এ যাত্রায় জাহাজে মুরগি ছিল না। ছিল আগের যাত্রায়। তারই উদ্বৃত্ত খাবার পড়ে ছিল হয়ত থলিতে। কেউ খেয়াল করে নি। তাতে ইন্দুর মহারাজদের পোয়াবার। খেয়েছে প্রাণ ভরে যত খুশি। তা তাঁবুতে সেই থলিটা খুলে দেখি কিছু খোসা আর আধ খাওয়া দানা। কী হবে এ সব রেখে? ফেলে দিলাম রেড়ে তাঁবুর সামনের উঠোনে। থলিটা তখন আমার খালি করা একান্ত দরকার। বারুদ রাখব। তারপর আর সেই দানার কথা আমার মনে নেই।

মাঝখানে কদিন টানা বৃষ্টি গেল। তারও প্রায় মাস খানেক পর। হঠাৎ একদিন চোখ পড়তে দেখি—বা বে বাঃ! সবুজ সবুজ কটা চারা যে বেরিয়েছে! সে কী আনন্দ আমার! গুনে দেখলাম সব মিলিয়ে মোট বারটা। সবই যব গাছ। আমাদের ইংল্যান্ডে এই জাতের যব হয়।

গুরু আনন্দ বললে কম বলা হয়, যতটা আনন্দ ঠিক ততখানিই যেন বিশ্ময়। সত্ত্ব বলতে কি, আমার প্রায় হতবাক মূক বিমৃঢ় অবস্থা তখন। কী বলব একে—ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছাড়া কী অন্য কিছু একে বলা যায়? কিন্তু আমি তো ঈশ্বরকে একবারও ডাকি নি। এই কদিনে এক বারও স্মরণ করি নি তার নাম। ধর্মকর্ম সম্বন্ধে আমার তেমন একটা আসন্তি বা আগ্রহ নেই। তবে কেন আমার মতো মানুষের প্রতি তাঁর এত দয়া! ঐ যে বলে—সবনিয়ন্তা ঈশ্বর—একি তাঁরই প্রতিরূপ! হয়ত মানস চক্ষে দেখেছেন তিনি জীবিকা নির্বাহের জন্যে এখানে এই ছন্দছাড়া দ্বিপে আমার কিছু খাদ্যশস্যের প্রয়োজন। আচমকা

তারই ব্যবস্থা করে দিলেন।

চোখ দিয়ে জল পড়ছে তখন আমার। আনন্দের অশ্রু। আমি ধন্য। প্রকৃতির তথা ঈশ্বরের সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ অযাচিত ভাবে আমার কাছে এসে পৌছেছে। শুধু যব নয়। পরে দেখি কটা ধানচারাও আছে ওর মধ্যে। একই সাথে দুরকমের খাদ্য। চোখে যে জল আসবে এটাই তো স্বাভাবিক।

অবাক হয়ে এখনো ভাবি সেই সব কথা। মঙ্গলময় ঈশ্বরের অসীম করুণা পরম। তার প্রমাণ আমি আরো অনেক ক্ষেত্রে পেয়েছি। যেমন ধূরুন সেই থলি বেড়ে ফেলা। যদি ফেলতাম সেটা কোনো মুক্ত জ্ঞানগায়, তবে রোদে পুড়ে কবে থাক হয়ে যেত।

ঈশ্বরের অজ্ঞাত নির্দেশে আমি ফেলেছি তা পাথরের আড়ালে ছায়াময় স্থানে। সেখানে জল বুকে নিয়ে প্রাণ পেয়েছে বীজ। একটু একটু করে বেড়ে উঠেছে। তাতে ধান হয়েছে যব হয়েছে আর কী চাই আমার। আমি কৃতার্থ।

জমিয়ে রেখে দিলাম প্রতিটি দানা। থাক আপাতত মজুত। লাগাব ফের বর্ষকালে। অর্থাৎ জুনে। তা থেকে যা ফসল পাব—এবার তো আর আগের মতো দুটো চারটে হবে না, হবে অজস্র, তা দিয়ে বুটি গড়তে পারব, বাকিটা জমিয়ে রাখলে হবে আমার ভবিষ্যতের সঞ্চয়। তা এই সব হিসেব করে সময় মেপে বীজ ফের পরের মরশুমে ছড়িয়ে দিলাম। সবটা নয় অবিশ্য। কিছুটা। গেল সব নষ্ট হয়ে। সময় হিসেব করতে ভুল হয়ে গেছে। রোদে পুড়ে সব গেল ছারখার হয়ে। এমনি ভাবে চার বছর পার হতে তবে আমি নিজের খাদ্য নিজে চাষ করতে সক্ষম হলাম।

ধানও হল বেশ খানিকটা। মন্দ নয়। মোটের উপর দুরকম ব্যবহার জানি আমি ধানের। গুড়ো করে বুটির মতো করে খাওয়া, কিংবা রান্না করে খাওয়া। সেটা যখন অবিশ্য যেমন যেমন সুযোগ হবে সেই ভাবেই খাব। এখন তো থাক মজুদ। এই অবকাশে আমি আবার আমার দিনপঞ্জীতে ফিরে আসি।

খুব খাটুনি গেল তিন চার মাস। সেই দেয়াল তোলা নিয়ে। শেষ হতে হতে ১৪ই এপ্রিল। বেশ উচু। ঢুকবার কোনো ফাঁক ফোকর নেই। আছে শুধু একটা মই। সেটা দিয়ে বেয়ে উঠি দেয়ালের মাথায় তারপর মই তুলে ভিতরে পাতি। নামি বেয়ে বেয়ে। ব্যস আমি সব দিক থেকে নিরাপদ।

১৬ই এপ্রিল॥ মইটা আজ শেষ হল। মন্দ নয়, ব্যবস্থা হিসেবে চমৎকার। দেয়াল টপকে নামতে পারলে আমার আর দুষ্পিত্তা বলতে কিছুই থাকে না। তা কম জ্ঞানগা তো ঘিরি নি। ঘুরে ফিরে বেশ স্বচ্ছদেই বেড়ানো যায়। আর বাইরের সঙ্গে সব রকম যোগাযোগ ছিল। মন্দ কী। এই তো বেশ।

পরের দিনই সে এক তুলকালাম কাণ। এত খাটুনির দেয়াল আমার। গেল চোখের নিম্নে তচ্ছন্দ হয়ে। আর আমি যেন মানুষটা মরতে মরতে প্রায় বেঁচে গেলাম। সে যা দুর্ভোগ ! ঘটনাটা তাহলে খুলেই বলি।

গিয়েছিলাম বাইরে, মই বেয়ে সবে ভিতরে নেমেছি কি নামি নি হঠাৎ গুড় গুড় গুম চারপাশে একটা অস্তুত শব্দ। আমি তো অবাক। দেখি গুহার উপর পাহাড়ের ঢাল বেয়ে গড়াতে নামছে এক বিশাল পাথর। দেখতে না দেখতে তাঁবুর দুটো খুঁটি ভেঙে যেন দৈতের মতো আমাকে গ্রাস করবে বলে প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে এল। আমি তো থাবড়ে এক লাফে মই বেয়ে পাঁচিলের মাথায় গিয়ে উঠেছি। দেখি পাঁচিল পায়ের নিচ টলছে। ঠিক দুলুনি যে রকম। কেউ যেন নাড়াচ্ছে সমস্ত শক্তি দিয়ে। চটপট মই তুলে বাইরে নামলাম।

নামতে না নামতে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল একটিকে দেয়াল। বলতে গেলে অল্পের জন্যে বিঁচে গেলাম। আর তখনি বিদ্যুৎ চমকের ঘতো কারণটা ঘনের পর্দায় এসে ঝাপট মারল। তবে কি ভূমিকম্প! নইলে এই যে দাঁড়িয়ে আছি আমি ঘাটির উপর, এটা এত দুলবে কেন? তিন তিনবার সে যে কী দুলুনি! আমি তো টাল খেয়ে পড়ে যাবার যোগাড়। এমন নড়চড়ানির হাতে কি আর ঘাটির তৈরি একহারা দেয়াল রক্ষা পায়! বড় বড় দালান অব্দি কাত হয়ে পড়বে দেখতে না দেখতে। সমুদ্রের দিকে চোখ যেতে দেখি জলেও ভীষণ তোলপাড়। ফুলে ফুলে উঠছে জল। চেউ হয়ে প্রচণ্ড বেগে ঝাপট মারছে পাড়ে। সে যেন ফুসিয়ে ওঠা দুরস্ত একটা কালসাপ। আমার ভাগিয়ে ভালো, আমি এখনো এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে বহাল তবিয়তে বিঁচে বর্তে আছি।

তবে একটা কথা। বজ্জ ভয় ধরে গেছে মনে। সেই সাথে বিস্ময় বিমৃঢ় একটা ভাব। সেই যে বলে না বিপদের মুখে পড়ে থ মেরে যাওয়া, ব্যাপারটা ঠিক তাই। বিস্মাস করতে পারছি না এতক্ষণ যা নিজের চেথে দেখলাম। সব এখন শান্ত। তবু আমি যেন কান পাতলে শুনতে পাই সেই পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ। কিংবা সমুদ্রের সেই দুরস্ত তোলপাড় চেউয়ের গোঙানি। বুকের ভেতরটায় এখনো যে হাতুড়ি পিটছে। যেন সাক্ষাৎ যমের হাত থেকে ফিরে এলাম।

বসে রইলাম চুপ করে ঘাটির উপর। ভাঙা দেয়াল ডিঙিয়ে ওধারে যেতে এখন ভয় করছে। আতঙ্ক যাকে বলে। তবে প্রথমের সেই অতটা ভয় এখন আর নেই। কিন্তু কী করব বা করা উচিত সেটা বুঝতে পারছি না। আর অবাক ব্যাপার, এই যে এতক্ষণ ধরে এত উৎকষ্টার মধ্যে কাটল আমার সময়, কই একবারও তো মুখ দিয়ে স্বিন্দ্রের নাম উচ্চারণ করি নি!

বসে থাকতে থাকতেই কালো হয়ে এত আকাশ। সে একেবারে কুচকুচে কালো রঙ। যেন মসীকৃষ্ণ। বৃষ্টি হবে। হল না তখন। আগে উঠল বৃড়। বাতাস বাড়তে বাড়তে সে একেবারে এতপাথাড়ি তুফান যেন। গাছের ডালপালা নাড়িয়ে হু হু বেগে প্রকৃতি ওলট পালট করা ভীষণ তুফান। চলল প্রায় নাগাড়ে তিন ঘণ্টা। তারপর বৃষ্টি নামল।

আমি কিন্তু ঠায় সেইখানেই বসা। একটা জিনিস বুঝতে পারছি, এই তুফান এই বৃষ্টি—সব ভূমিকম্পেরই ফল। তার মানে ভূমিকম্প আপাতত আর হবে না! তবে যিন্দ্যে এখানে বসে বৃষ্টিতে ভিজি কেন? গেলাম তখন তাঁবুর ভেতর। গুহায় এখন যাব না। তাঁবুটা তা-ও বরং নিরাপদ। আসলে আতঙ্ক তখনো আমার পুরোপুরি কাটে নি। ভয় ভয় ভাবটা আছে। কিন্তু তা-ও বা কতক্ষণ! বৃষ্টির ঝাপট যে ভীষণ। তাঁবুর একটা ধারের চালা গেছে পড়ে, সেখান দিয়ে দমকা ছাঁট আসছে হুহু বেগে। তখন সব ভয় ঝেড়ে ফেলে ছুটতে ছুটতে গিয়ে গুহার মধ্যেই ঢুকলাম।

বৃষ্টি হল সারারাত। পরদিনও প্রায় দুপুর অব্দি। আমি তো ঠায় গুহাতে বসা। বাপরে বাপ, বেরই কখনো। আর বসে বসে কেবল তোলপাড় খাচ্ছে নানান চিঞ্চা আমার মনে। এই যে ভূমিকম্পের ভয়াল রূপ দেখলাম, এর পরও কি এখানে থাকা সমীচীন! গুহায় থাকা আর সম্ভব হবে না। কোনোদিন হুড়মুড়িয়ে গোটা পাহাড়টা ভেঙে পড়বে, আমি চাপা পড়ে জ্যান্ত করবে যাব। সে আমার ঘুমের মধ্যেও হতে পারে। তার চেয়ে বরং সময় থাকতে বাইরে কোনো মুক্ত জায়গায় আস্তানা গাড়া ভালো। চারপাশে নয় পাঁচিল দিয়ে বিবে নেব। তাহলে আর চিঞ্চা কী! সেক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিয়ে কোনো সংশয় থাকবে না। এবং যত দ্রুত সে রকম ব্যবস্থা করা যায় ততই মঙ্গল।

ମୋଟମାଟ ସରିଯେ ନିଯେ ଯାବ ଯେ ଆନ୍ତାନା, ଏ ବ୍ୟାପାରେ ଆମର କୋନୋ ଦ୍ଵିଧା ନେଇ।  
ସିନ୍ଧାନ୍ତେ ମୋଟେର ଉପର ଆମି ଅଟଲ । କିନ୍ତୁ କୋଥାଯ ସରାବ ସେଟାଇ ଏଥିନ ପ୍ରଶ୍ନ ।

ଏପ୍ରିଲ ମାସେର ୧୯ ଆର ୨୦ ତାରିଖ ଏହି ଦୂଟୋ ଦିନ ଜାଯଗା ପରିଷେର କାଜେଇ କାଟଲ ।

ଏହିକେ ଘୁମଟାଓ କଦିନ ଧରେ ହୟ ନା ବଲଲେଇ ଚଲେ । ରାତେ ଶୁଯେ ଥାକି ଚୁପ୍ଚାପ କିନ୍ତୁ ସୁଧ  
ଆର ଆସେ ନା । ସେଇ ଆତଙ୍କ ଆର କି । ସଦି ପାହାଡ଼ଟା ଭେଣେ ପଡ଼େ ମାଥାର ଉପର । ସଦି ଜ୍ୟାନ୍ତ  
କବର ହୟ ! ତାହାଡ଼ା ଜିନିସ ପତ୍ର ଯେ ଟେନେଟୁନେ ନିଯେ ଯାବ ନତୁନ ଜାଯଗାଯ ଏଟାଓ ଆରେକ  
ସମସ୍ୟା । କୀଭାବେ ନବୋ କୀ କରବ ଶୁଯେ ଶୁଯେ ସେଇ ସବହି କେବଳ ଭାବି ।

ମୋଟେର ଉପର ଯାଇ କରି ନା କେନ, ସେଟା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ । ଚଟ କରେ ତୋ ଆର ଇଚ୍ଛେ ହଲ  
ଅଧନି ଚଲେ ଗେଲାମ କୋନୋ ଏକଟା ଜାଯଗାଯ, ତାବୁ ଗାଡ଼ିଲାମ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଶୁଯେ ସୁମୋଲାମ, ତା  
ତୋ ଆର ହୟ ନା । ନିରାପତ୍ତା ସବ ସମୟରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ । ଆଗେ ତାବୁ ଖାଟାଲେ ଚଲବେ ନା ।  
ଏଥାନେଇ ମୋଟାମୁଟି ମେରାମତି କରେ ଥାକତେ ହବେ ଏଥିନେ ଅନେକ ଦିନ । ଆଗେ ଦେୟାଲ ତୁଳବ  
ନତୁନ ଜାଯଗାଯ—ଏବାର ଆର ଶୁଧୁ ମାଟି ଦିଯେ ନଯ, ଶକ୍ତ ଖୁଟି ଗେଡେ ତାତେ ତାରେର ବୀଧୁନି  
ଦିଯେ ତାର ଉପର ଦେୟାଲ । ସେଟା ସହଜେ ପଡ଼ବେ ନା । ତାରପର ଦେୟାଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୈରି ହଲେ



..... ଯେନ ଦୈତ୍ୟର ମତୋ ଆମକେ ଗ୍ରାସ କରବେ ବଲେ ଥେଯେ ଏଲୋ ।

ମାଲପତ୍ର ଏକ ଏକ କରେ ନିଯେ ଯାବ । ଶେଷେ କରବ ତାବୁ । ତଥନି ଗିଯେ ଥାକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ।

୨୨ଶେ ଏପ୍ରିଲ ॥ ଆଜ ସକାଳ ଥେକେଇ କାଜେ ଲାଗଲାମ । କିନ୍ତୁ ସେ ଏକ ନତୁନ ସମସ୍ୟା ।  
ଯଦ୍ରପାତି ଯା ଛିଲ ସାଥେ ତାର ତୋ ବଡ଼ଇ ବେହାଲ । ଯେମନ କରାତ ବା କୁଡୁଲ, ଏତଦିନ ତା ଦିଯେ  
କେଟେହି ଅଞ୍ଚଳ ଶକ୍ତ କାଠ, ତାତେ ଧାର ଗେଛେ ନଷ୍ଟ ହୟେ, ଏଥିନ ସବହି ବଲତେ ଗୋଲେ ଭୋତା ।  
ତାଇ ଦିଯେ କି ଆର ପାରା ଯାଯ ନତୁନ କରେ ଗାଛ ଗାଛାଲି କାଟା । ତାଇ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଦରକାର  
ସେଗୁଲୋତେ ଶାନ ଦେଓଯା । କିନ୍ତୁ ଦେବ କୀଭାବେ ? ଯାତା ଏକଟା ଆଛେ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ତାତେ ତୋ  
ଧାର ଦେବାର ଉପାୟ ନେଇ । ନତୁନ ଏକଟା କୋନୋ ପଥ ବେର କରତେ ହବେ । ହବେଇ । ଏବଂ ସେଟାଇ  
ଆମର ସବ କାଜେର ପ୍ରଥମ କାଜ ।

ତଥନ ବିନ୍ଦୁର ଭାବନା ଚିନ୍ତା କରେ ଦୁଦିନ ଥେଟେ ତୈରି କରଲାମ ଏକଟା ଚାକା । ସେଟା  
ପାଥରେର । ତାତେ ଫୁଟୋ କରଲାମ । ତାରପର ଦକ୍ଷିଣ ଗଲିଯେ ନିଲାମ ମାଝଥାନ ଦିଯେ । ଖୁବ ଏକଟା  
ଭାରୀ ନା ଆବାର ବଡ଼ଓ ନା । ପ୍ରାନ୍ତଦେଶ ମସଣ । ବସେ ଦୁପାଯେର ଆଙ୍ଗୁଲେ ଦକ୍ଷିଣ ବେଁଧେ ପାକ ଥାଇୟେ

মোটামুটি সেটা বেশ ঘোরানো যায়, তখন হাত দুটো থাকে আলগা। তাতে কুড়ুল, করাত বা ছুরি নিয়ে স্বচ্ছে ধার দেওয়া যেতে পারে। বলতে দ্বিধা নেই, এ ধরনের যন্ত্র সম্পূর্ণ আমার নিজেরই মগজ খাটিয়ে তৈরি। আগে কোথাও কোনোদিন দেখি নি বা নিজের হাতে তৈরি করব যে কখনো তাও ভাবি নি। নেহাত অবস্থার চাপে পড়ে করতে হল। বলা যায়, আমার উষ্ট্রাবনী ক্ষমতা এখানে মৌলিক আবিষ্কারের পথ ধরল।

২৮ শে ও ২৯ শে এপ্রিল॥ দুদিন ধরে শানালাম আমার যাবতীয় কাজের সরঞ্জাম। শান দেবার বস্ত্রটা বেশ চমৎকার কাজ করছে।

৩০ শে এপ্রিল॥ বুটির সঞ্চয় একটু একটু করে কয়ে আসছে। আজ সময় নিয়ে ভালো করে হিসেব করে দেখলাম যা পড়ে আছে তাতে আমার আর কস্তুরি চলতে পারে। মোটমাটি কমতির পথে এটা ঘটনা। সেক্ষেত্রে আপাতত বেশ কিছুদিন দৈনিক একখানা করে বিস্কুট ছাড়া আমার আর সঞ্চয় থেকে এক কণা খাবারও গ্রহণ করা উচিত নয়।

১লা মে॥ সকাল। আনমনা ঝোজকার অভ্যেস মতো তাকিয়েছি একবার সমুদ্রের দিকে, দেখি কুলের কাছে জলের উপর কী যেন একটা ভাসছে। দেখতে যেন একটু বড় সড়। গেলাম ছুটতে ছুটতে। দেখি একটা পিপে। আশে পাশে কয়েকখানা কাঠের টুকুরো। মোটমাটি ঝড়ের দাপটে যে ভাসতে ভাসতে এখানে এসে ভিড়েছে এটা স্পষ্ট বোৰা যায়। ভেতরে বাবুদ ঠাসা তবে জল ঢুকেছে চুইয়ে চুইয়ে। তাতে শুকিয়ে খটখটে হয়ে গেছে বাবুদ। তবু বাবুদ তো। সে যে অবস্থাতেই ধাক্কুক তার একটা ব্যবহারিক মূল্য অবশ্যই আছে। তাই ঠেলতে ঠেলতে পিপে নিয়ে এলাম কূলে। ডাঙায় তুললাম। যাক, শান্তি। এটাকে নিয়ে যাব আমার তাবুতে।

আর অবাক কাণ্ড, দেখি পাহাড়ের আড়ালে ডাঙা থেকে প্রায় দু আড়াই মাইল দূরে আমাদের জাহাজটাও বালিতে মুখ সুঁজে পড়ে আছে। তবে কি এখানেই ছিল এতদিন, আমি দেখতে পাই নি? হয়ত তাই। প্রায় দু ফুট মতো বালির মধ্যে ডোবানো। ভাঙ্গুর হয়েছে তবে খোলটা আস্ত আছে। আর বালিতে বোঝাই। সে যে কত বালি! টেউ এসে তুলে দিয়ে গেছে পরতে পরতে বালির স্তুপ। তাতে চট করে দূর থেকে বোঝাও যায় না ওটা জাহাজ। কী করি এখন। যেতে যে ভাবি মন চাইছে জাহাজের কাছে। কিন্তু অনেকটা যে জল। আগের মতো আর কী সম্ভব হবে? হোক অসম্ভব, তবু যাবাই যাব। নতুন আন্তর্না গড়ার প্রয়োজনে অনেক কিছু এখন আমার দরকার। দেখা যাক, তার কটটা পারি জাহাজ থেকে নিয়ে আসতে।

কিন্তু যাব যে জাহাজে, রাস্তা কোথায়! চতুর্দিকে যে জল। পাটাতনে উঠব তারও তো উপায় নেই। বালিতে যে গোটা পাটাতন বোঝাই। তবে কি নিরুদ্যম হয়ে ফিরে যাব? মোটেই না। কোনো জিনিসে হতাশ হওয়া আমার অভ্যাসের বাইরে। যাব সাতার কাটতে কাটতে জাহাজের কাছে। ঐ অবস্থাতেই বালি সরিয়ে ওঠার পথ তৈরি করব। ভেঙ্গে চুরে খুলে নিয়ে আসব যা পারি যতটুকু পারি সব। মোটমাটি কোনো কিছুই এবার আর ফেলে আসব না। যা পাই তাতেই আমার লাভ। যা আনব তাইতেই আমার নতুন আন্তর্না গড়ার কাজ হবে।

৩২ মে॥ আজ কাজে হাত দিলাম। করাত নিয়ে এসেছি সঙ্গে। কাটলাম মস্ত বড় একটা খুঁটি। অবিশ্য তার আগে বালি সরিয়ে নিয়েছি। সেটা কাটতে ভিতরে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা দেখা গেল। তবে বালি সেখানেও আছে অল্প বিস্তর। চেষ্টা করলে সেই ফোকর দিয়ে খোলের মধ্যে ঢোকা যাবে। কিন্তু চেষ্টার সুযোগ আর হল না। জল বাড়তে শুরু করেছে। আমি সাতার কেটে খুঁটিকে ভাসাতে ভাসাতে কূলে এসে উঠলাম।

৪ঠা মে॥ যাই ধরতে গিয়েছিলাম। একটাও ওঠে নি। সমস্ত পরিশুম আমার বৃথা। ধরা ঝক্কিও বটে। বড়শি তো নেই, শুধু খানিকটা মোটা সুতো। তাতে টোপ বেঁধে ফেলে দিই জলে। তাই খায়। আলটপকা টান মারলে সটান উঠে আসে কূলে। অনেকগুলো আবার ফসকেও যায়। তবে যা পাই তাতেই আমি খুশি। কাজ চলে যায়। শুকিয়ে রাখি রোদুরে। পরে কখনো কখনো শিকার না পেলে চিবিয়ে থাই। মন্দ লাগে না। হ্যাঁ ভালো কথা, আজ যাই ধরতে গিয়ে মস্ত একটা জলফিন দেখেছি।

৫ই মে॥ আজ ফের জাহাজে। আবার একটা খুঁটি কাটলাম। পাটাতন থেকে পর পর কয়েকখানা কাঠ খুলে আনলাম। বাঁধলাম একসাথে সব দড়ি দিয়ে। ভেলার মতো হল। তাই নিয়ে ভাসতে ভাসতে এলাম কূলে। ঢেউ বাড়ছে।

৬ই মে॥ আজ অনেকগুলো লোহার বল্টু খুলে ফেললাম। আমার খুব কাজে লাগবে। লোহার পাতও অনেকগুলো পাওয়া গেল। আজ খুব পরিশুম গেছে। ফিরে এলাম বেলা থাকতে থাকতে আস্তানায়।

৭ই মে॥ জাহাজে গেলাম কিন্তু কাজের ইচ্ছে নিয়ে নয়। কেমন যেন সকাল থেকেই গা এলানো ভাব। গিয়ে দেখি, বাতাস আর ঢেউয়ের ঝাপটায় আমার কেটে নেওয়া খুঁটি বরাবর সব ভেঙেচুরে ডাই হয়ে পড়ে আছে। সেটা অবিশ্য আমার পক্ষে খুবই মঙ্গল। পরিশুমের আর তেমন দরকার হবে না। আর খোলের ভিতরটাও এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। সেখানে থই থই করা জল আর নিচে বালির স্তুপ।

৮ই মে॥ আজ পাটাতনের সব কাঠ খুলে নিয়ে আসব। সেই মন নিয়ে গেছি খুব সকাল সকাল। কিন্তু সব আনা হয়ে উঠল না। লোহার আঁটা ছাড়িয়ে খুলতে পারলাম মোটে খানকতক। সেগুলোই পর পর দড়ি দিয়ে বেঁধে ভেলার মতো ভাসাতে ভাসাতে কূলে নিয়ে এলাম।

৯ই মে॥ কটা আঁটা এমনই কড়া, কিছুতেই পারলাম না ভাঙতে। সে যে কী পরিশুম সারাদিন। সীসের সেই পাতটার দিকে চোখ পড়ল। প্রচণ্ড ভারী। কীভাবে যে নিয়ে আসব সেটাই সমস্যা।

১০ থেকে ১৪ই মে॥ সব কাঠই প্রায় নিয়ে আসা হল। আর বিস্তর লোহার নাট, বল্টু, আঁটা। সব মিলিয়ে ওজন প্রায় দু তিনশ হ্যাঁ।

১৫ই মে॥ দুটো হাত কূড়ুল নিয়ে আজ জাহাজে গেলাম। সীসের পাতটা আজ কেটে আনতেই হবে। কিন্তু কাটব কীভাবে, জলের নিচে যে ডোবানো। প্রায় দেড় খুঁট মতো জল। কিছুতে পারলাম না জল ভেদ করে কূড়ুলের ঘা মারতে।

১৬ই মে॥ কাল রাতে ঝড়ের খুব দাপাদাপি গেছে। সকালে উঠে বেরলাম শিকারে। পায়রা ধরতে মিথ্যে অনেকখানি সময় নষ্ট হল। ফিরে এসে দেখি, জল বাড়তে শুরু করেছে। এ অবস্থায় জাহাজে যাওয়ার চেষ্টা করাও বৃথা। তাই আর গেলাম না।

১৭ই মে॥ ঢেউ ভাসিয়ে এনেছে বিস্তর কাঠ। পড়ে আছে বালির উপর। কিন্তু সে প্রায় দু আড়াই মাইল দূর। গেলাম ইঁটতে ইঁটতে সেখানে। কিন্তু অসম্ভব ভারী। বয়ে আনা আমার মতো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আনা আর হয়ে উঠল না।

২৪শে মে॥ এই সাতদিন রোজ একবার করে গেছি জাহাজে। বলতে গেলে উদয়ান্ত পরিশুম। খোলাখুলি সব শেষ। কাঠ ছাড়াও পেয়েছি নাবিকের মালপত্র রাখার দুটো পেটি আর কটা মদের পিপে। আজ পিপে আর পেটি দুটো ফেলে দিলাম জলে। চিঞ্চা নেই, ভাসতে ভাসতে ঢেউয়ের তাড়নায় ঠিক কূল অব্দি পৌছে যাবে। কিন্তু কাঠ ভাসাবার সাহস

পেলাম না। হাওয়া ছুটছে ডাঙার দিক থেকে। তাতে ঠেলতে ঠেলতে সব নিয়ে যাবে সমুদ্রের দিকে।

১৫ই জুন অব্দি টানা চলল সব কিছু নিয়ে আসার কাজ। খাটুনি অবিরাম। শুধু দুপুর বেলা গিয়ে দুটি খেয়ে আসি। তখন টেউটাও বাড়ে কিনা। তা এনেছি যতখানি মোটের উপর আমি নিশ্চিন্ত। লোহা আর কাঠ দিয়ে এখন যে কোনো মুহূর্তে চমৎকার একটা নোকো বানিয়ে নিতে পারি। সীসেও অনেকখানি আনতে পেরেছি। তাতে ঝালাইয়ের কাজ হবে।

১৬ই জুন॥ আজ একটা মন্ত বড় কাছিম দেখলাম। ইয়া বিরাট। আগে কখনো কাছিম এতদক্ষলে দেখি নি। আছে বিস্তর। সেটা এপারে নয়, পাহাড় পেরিয়ে ওদিকে। ইচ্ছে হল দিনে একশ দুশ অব্দি ধরা যায়।

১৭ই জুন॥ বেশ করে রাঁধলাম আজ কাছিমের মাংস। পেটে প্রায় ষাটটার মতো ডিম। আর মাংসের সে যা স্বাদ। আহা, অপূর্ব! কতদিন যে খাই নি এ জাতীয় মাংস। শুধু তো ছাগল আর মূরগি। খেতে খেতে জিভ যেন বিস্বাদ হয়ে গেছে।

১৮ই জুন॥ আজ সারাদিন বঢ়ি। বাইরে বেরলাম না। শীত করছে। হাড়গোড়ের ভিতরে কেমন যেন হিম হিম ভাব। অবাক কাণ্ড, আগে তা কখনো এমন হয় নি।

১৯ই জুন॥ শরীর খুবই খারাপ। কাঁপুনি দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে গা হাত পা যেন দুমড়ে মুচড়ে দেয়। আর যা শীত!

২০শে জুন॥ সারারাত ছটফট করে ফাটিয়েছি। মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা। জ্বর জ্বর লাগছে।

২১শে জুন॥ অসহ্য অবস্থা আজ আমার। ভাবি অসুস্থ। মনে হয় এ থেকে আমার আর অব্যাহতি নেই। মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। হায়, কে আমাকে করবে সেবা শুশ্রায়। কে আমাকে পথ্য দেবে, কপালে বুলিয়ে দেবে সাম্রাজ্য হাত। ঈশ্বরকে আকুল কষ্টে ডাকলাম। এই প্রথম। মথার মধ্যে কেমন যেন এলমেল ভাব। তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। পারছি না সুস্থির চিন্তে কিছু ভাবতে।

২২শে জুন॥ সামান্য সুস্থ আজ। অর্থাৎ কালকের তুলনায় একটু ভালো। তবে অসুস্থতা পুরোপুরি কাটে নি।

২৩শে জুন॥ আজ আবারও প্রথম দিনের মতো অবস্থা। কাঁপুনি আর সেই সাথে শীত। মাথার যন্ত্রণা ও ভীষণ।

২৪শে জুন॥ আজ অনেকটা ভালো।

২৫শে জুন॥ কাঁপুনি দিয়ে খুব জ্বর এল। সাত ঘণ্টার মতো বেহুশ হয়ে পড়ে রইলাম। কখনো শীত, কখনো গরম। আর দরদরিয়ে স্বোত্তরে মতো ঘাম।

২৬শে জুন॥ একটু ভালো। একটু কেন বলি, অনেকটা। ক্ষিধে পেয়েছে। কিন্তু খাবার বলতে মজুত যে কিছুই নেই। বন্দুকটা নিলাম। কিন্তু ভীষণ দুর্বল। হাঁটতে যেন পা ভেঙে আসে। ছাগল মারলাম একটা। বয়ে নিয়ে আসা সে যে কী কষ্ট! বলসে নিলাম। খানিকটা দিয়ে একটু ঘোল মতো করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু রাখার যে পাত্র নেই।

২৭শে জুন॥ আজ আবার সেই কাঁপুনি দিয়ে জ্বর। ঠায় শুয়ে সারাদিন বিছানায়। ক্ষিধে খুব। কিন্তু খাব যে কিছু সে সামর্থ্যটুকুও নেই। জল পিপাসাও প্রচণ্ড। কিন্তু ঘরে যে জল নেই। যেতে হবে সেই বাইরে, জল আনতে হবে তারপর খাব। যাব কী ভাবে, আমার কি ওঠার শক্তি আছে। শুয়ে শুয়ে শুধু ঈশ্বরকে আকুল কষ্টে ডাকি।—প্রভু আমাকে বাঁচাও। আমাকে শক্তি দাও, আমাকে দয়া কর। দু তিন ঘণ্টা শুধু এই আকুল প্রার্থনা। তখন বেহুশ ভাব। আর ঘুম ভাঙল তখন মাঝরাত। গলা শুকিয়ে কাঠ। কিন্তু বেশ ভালো লাগছে। সেই ভাবেই চুপচাপ শুয়ে রইলাম। থাকতে থাকতে ফের ঘুম। তখন দেখলাম একটা নিদারণ দৃঢ়শ্বন্ধ।

সে যা ভয়কর। দেয়ালের বাইরে আমি বসা। ঝড় বইছে হু হু করে। সেই ভূমিকম্পের পর। তখন দেখি আকাশে কালো মেঘের বুক চিরে একজন লোক নেমে এল। তার সারা গায়ে দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। সেই আগুনে জ্বলে উঠল সারা মাঠ, ঘাট, বন ও পাহাড়। লোকটাকে দেখতে পাচ্ছি। কী যে বীভৎস তার মুখ! আমার ভাষা নেই আমি সে চেহারা বর্ণনা করতে অপারগ। মাটিতে যখন নামল যেন দুলে উঠল সারা পৃথিবী। ঠিক ভূমিকম্পের সময়কার মতো। আর দাউ দাউ করে চারদিকে জ্বলছে আগুন।

সেই অবস্থাতেই আমার দিকে এগিয়ে এল। হাতে একটা বর্ণা। আমাকে তাই দিয়ে গাথবে। দাঢ়াল এসে একটা উচু জায়গায়। আমাকে বলল, কীরে, তোর মনে তবু অনুত্তপের নামগুর নেই? তবে তোর এখন মৃত্যুই শ্রেয়। জলদপ্তিম সেই কষ্টস্বর। বলে বশিটা আমাকে তাক করে শূন্যে তুলল।

সে যা ভয় আমার! আমি ভাষায় ব্যক্ত করে আপনাদের বোঝাতে পারব না। আমার



তখন দেখলাম একটা নিদানুণ দৃষ্টিম

সাধ্যের বাইরে। যদিও স্বপ্ন, কিন্তু দেখছি যখন আমি, সেটা তো বাস্তবেরই মতোন। ভয়টাও বাস্তব। সেই ভয়ের দাপটেই খড়মড়িয়ে উঠে বসলাম।

সত্যি বলতে কি আমার তো তেমন ভক্তি টক্ষি নেই। আমার বাবা খুব ধার্মিক প্রকৃতির মানুষ। ধর্মসম্পর্কে বিস্তর জ্ঞান তিনি একসময় আমাকে দিয়েছিলেন। কিন্তু তার কি আর লেশমাত্র মনের মধ্যে আছে! আটটা বছর তো দেখতে দেখতে সমুদ্রের বুকেই কেটে গেল। দৃঃসাহসিক সব অভিযান। কত শয়তানি, কত নষ্টামি তার ভাঙ্গে ভাঙ্গে। তাতে কি ধর্মকর্ম বলে কিছু থাকে। নিজেকে নিয়েই যে ব্যস্ত থাকতে হয় সারাক্ষণ। মনে তো পড়ে না, এই দীর্ঘ আট বছরে একটি দিনের তরেও আকাশের দিকে তাকিয়ে আমি ঈশ্বরের নাম স্মরণ করেছি বা অন্তরে ভেবেছি তাঁর কথা। মনটা যেন মন নয়। যেন কাঠখোট্টা আত্মসূর্যী বিবেকবর্জিত একটা পদার্থ। তাতে ঈশ্বরকে ভয় করা তো দূরের কথা, বিরাট একটা ঝঝাট থেকে মুক্তির পর সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ যে নিদেন পক্ষে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয়, সে বোধটুকুও আমার মধ্যে নেই।

মেই বলেই হয় তো এত দিন ভাবতে পারি নি, এই সব যাবতীয় অবস্থা দুর্বিপাকের মধ্যে ঈশ্বরের হাত আছে কিংবা এই যা ঘটছে আমার জীবনে—একের পর এক বিপর্যয়, তা আমার অতীতের কৃতকর্মেরই ফলাফল। অতীত বলতে এখনে আমি বাবার প্রতি যে অন্যায় আচরণ করেছি তার কথাই বলতে চাই। তাঁকে যে অগ্রহ্য করেছি, মানি নি তাঁর উপদেশ, তাঁর জন্যে শাস্তি তোলা ছিল আমার ভাগ্যে, এখন একের পর এক তাই ফলতে চলেছে—এমন বোধ কখনো আমার মনে স্থান পায় নি। কিংবা সেই যখন গিয়ে পড়লাম শাস্পানে করে ভাসতে ভাসতে আফ্রিকার উপকূলে—একবারও মনে হয় নি, কী হবে আমার! আমি কি সুস্থ জীবনের আর দেখা পাব! ঈশ্বরের নাম ভুলেও মুহূর্তের জন্যে মনে উদয় হয় নি। বলি নি একবারও, হে ঈশ্বর, আমাকে এই সংকট থেকে মুক্তি দাও। এমনকি সেই যখন বর্ষের মানুষদের মুখোমুখি হয়েছিলাম কিংবা জন্মের সাথে লড়াইয়ে মেতেছিলাম তখনো। শুধু উপস্থিত বুদ্ধি তখন আমার সহায়। আর মনের জোর। আপনারা হয়ত শুনলে বলবেন, আমি নৃশংস, আমি মহাপাপী। কিন্তু এতটুকু বানিয়ে বলছি না। উপস্থিত বুদ্ধি আর মনের জোর যদি নৃশংসতা হয়, তবে এছাড়া অন্য কারো উপর আমি সেই মুহূর্তে ভরসা করতে পারি নি।

পতুগিজ জাহাজের কাপ্টেন যখন আমাকে তুলে নিলেন, তখনো মোটামুটি আমার একই মনের অবস্থা। অপূর্ব তাঁর ব্যবহার, আমার প্রতি দয়া ভালবাসা আন্তরিকতা, সে জন্যে তাকেই আমি জানিয়েছি হাজারো ধন্যবাদ, ভুলেও বারেকের তরে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই নি। ফের যখন জাহাজড়ুবি হয়, যখন অনিবার্য মৃত্যুর কবল থেকে আমি বেঁচে এই দ্বীপে এসে উঠি, তখনো ঈশ্বরের কথা এক লহমার জন্যেও আমার মনে উদয় হয় নি। বরং নিজেকে ভেবেছি আমি মন্দভাগ্য এবং তাঁর জন্যে সম্পূর্ণত নিজেকেই আমি দোষী সাব্যস্ত করেছি।

ডাঙায় ওঠার পর চিত্রটা অন্যরকম। আমি সেই প্রথম বুঝতে পারলাম আমার সহযাত্রীরা সকলেই হত, কেবল একলা আমিই বেঁচে আছি। তখন এক অস্তুত বিস্ময়বোধ আমার মধ্যে। বা আনন্দের অপ্রাকৃত এক অবস্থা। আর কেউ হলে একে ঈশ্বরের মহান অবদান বলে চিহ্নিত করতে কালক্ষেপ করতেন না। আমি সেটা পারি নি। আমার পক্ষে সন্তুষ্ট হয় নি। বিশ্বল ভাব কাটিয়ে তখন আমার মধ্যে ভীষণ এক আনন্দের ভাব। আমি যে জীবিত এটা আমার কাছে তখন অনেকখানি। এটা প্রায় প্রতিটি নাবিকের ক্ষেত্রেই সাধারণ ঘটনা। জাহাজ নিরাপদে তৌরে ভেড়ার পর সবাই এভাবেই আনন্দ প্রকাশ করে থাকে। তখন আর নিজেকে ছাড়া অন্য কারো কথাই মনে আসে না। আমার ক্ষেত্রেও স্বাভাবিক ভাবে ঈশ্বরের কথা মনে আসার সুযোগ হয় নি।

এমনকি পরেও না। এই যে বিজন দ্বীপে আমার নির্বাসন, এই যে জন্মানবের সঙ্গে সংযোগবিহীন একক-একাকী এই জীবন, যার থেকে হয়ত সারা জীবনে আমার মুক্তি নেই, নিষ্ঠার নেই—কই তাঁর জন্যে তো ঈশ্বরকে আমি কখনো ডাকি নি। বরং কীভাবে স্বাভাবিক করতে পারি একে, কীভাবে বেঁচে বর্তে সুস্থ হয়ে থাকতে পারি, সেটাই আমার মধ্যে প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। আমার বাঁচাটাই এখন প্রধান ব্যাপার। তাঁর জন্যে ঈশ্বরের সাহায্য বা দূর থেকে তাঁর অনুপ্রেরণা পাবার কোনো প্রয়োজন আমি বোধ করি নি।

আর ঐ যে যখন ফেলে দেওয়া শস্য কণা থেকে গাছ গজাল প্রথমবার, আমি ঈশ্বরের নাম হয়ত করেছি, কিন্তু তেমন একটা আহামরি ভাবে নয়। প্রথম প্রথম ব্যাপারটা আমার

মনে আদৌ কোনো রেখাপাত করতে পারে নি। সেটা হয়েছে পরবর্তী কালে। তখন এর মধ্যে অলৌকিক যে একটা কিছু আছে আমি তাই ভাবতে শুরু করেছি। শুধু ঈশ্বরের অনুগ্রহ নয়, অতিপ্রাকৃত কিছুও। তবে সে চিন্তা বেশি দিন আমার মনে স্থান পায় নি। ব্যাপারটা যখন সহজ হয়ে এসেছে, তখন সেই সব অবিশ্বাস্য চিন্তাও ধীরে ধীরে মন থেকে লুপ্ত হয়েছে।

ভূমিকম্পের ব্যাপারটা আমি আগে আপনাদের কাছে বলেছি। তার ভয়ঙ্করতা আশাকরি আপনাদের বোকাতে পেরেছি। সে যা মনের অবস্থা আমার! তখন ঈশ্বরের নাম করেছি এটা ঘটনা, কিন্তু ঐ অব্দিই। এ অবস্থায় সকলেই হয়ত এরকম করে থাকেন। বেশি যা করেন তা হল তাঁকে নিয়ে মাতামাতি। সেটা আমি করতে পারি নি। একবারও ভাবি নি এ তাঁরই মহিমা কিংবা অপরাধীকে শাস্তি দেবার কোনো বীভৎস ব্যবস্থা। মোটমাট ভূমিকম্পের প্রথম চোট কেটে যাবার পর আমি এ থেকে পরিত্রাণের কী উপায় আছে তাঁরই চিন্তায় মশগুল হয়ে পড়েছি।

শুধু এই মুহূর্তে সব ওলোটপালোট। এই যে অসুস্থ আমি, ভীষণ দুর্বল, পারি না হাঁটতে কি চলতে, পারি না প্রচণ্ড ত্বক পেলেও জল নিয়ে আসতে—এখন এই দুর্বল মুহূর্তে বারে বারে মনে পড়ছে আমার পুরানো দিনের কথা। নিজেকে অপরাধী বলে ভাবতে মন চাইছে। ঈশ্বরের কাছে বার বার প্রার্থনা করছি—হে ঈশ্বর, আমাকে বাঁচাও, আমাকে দয়া কর। এটা সম্পূর্ণ আমার স্বাভাবিক চিন্তার বাইরে। এবং এর জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী আমার অসুস্থতা। এই যে প্রচণ্ড জ্বর, এই বিকার, এই মাথার যত্নণা, আমার ধারে কাছে পরিচিত কেউ নেই, সেবা শুশ্রাব করার কেউ নেই, না আছে একটা ওষুধ কি আর কিছু—মন যে দুর্বল হবে এসময়, ঈশ্বরের সহানুভূতি যে চাইবে এটা ঘটনা। আমার মুখ, চোখ, ঘন, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যে আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সব তালগোল পাকিয়ে আছে মাথার মধ্যে। মরার কথাটা বারবার ঘুরে ফিরে চিন্তার মধ্যে পাক খাচ্ছে। ঠেট যে এসময় অসহিষ্ণু হয়ে ঈশ্বরকে ডাকবে এটা তো স্বাভাবিক।—প্রভু আমাকে এই দুর্গতির হাত থেকে রক্ষা কর—প্রভু দুঃখী মানুষ আমি!—প্রভু আমার অসুস্থ না সারলে আমি আর বাঁচব না। মারা যাব, তুমি আমাকে নীরোগ কর। আর চোখ ফেটে বেরয় জল। সে-ও তো নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এক্ষেত্রে আমি মানুষটা কি-ই বা করতে পারি?

আর ঘুরেফিরে বারে বারে মনে পড়ে বাবার উপদেশের কথা। আমাকে বাবার সাবধান করেছিলেন যেন আমি বোকার মতো সমুদ্র যাত্রায় না যাই, এভাবে ভাগ্য পরিবর্তনের যেন চেষ্টায় আমি না করি। এতে ঈশ্বরের দয়া লাভে আমি বক্ষিত হব, কিছুতেই পারব না একক চেষ্টায় আমার দুর্দশা থেকে মুক্ত হতে। সত্য তাই। আমি চিৎকার করে মাঝে মাঝে আপন মনেই বলে উঠি—হ্যা বাবা, তোমার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। ঈশ্বরের করণা আমি লাভ করতে পারি নি। কেউ নেই এই দূর বিদেশে যে আমাকে সাহায্য করে, একটা দুটো পরামর্শ কি বুদ্ধি দেয়। আমি তোমার সদুপদেশে কর্ণপাত করি নি। আমি নির্বোধ। আমি মৃত্যু আমি পাপী। আমি তোমার কথা শুনলে সুখে স্বচ্ছন্দে স্বদেশে জীবিকা নির্বাহ করতে পারতাম। আমার কোনো দুঃখ থাকত না। সব হেলায় পায়ে ঠেলে বাঁপিয়ে পড়েছি আমি অজ্ঞানার ডাকে। এখন শুধু তাঁর জন্যে আক্ষেপ আর অনুত্তাপ। এছাড়া আমার আর করার কিছু নেই। কেউ নেই আমাকে এতটুকু সাহায্য করার। আমি একো, সম্পূর্ণ একো। আমি দুঃখী। ঈশ্বর, তুমি আমাকে দয়া কর।

প্রার্থনা বলতে এটাই প্রথম। বহু বছরের মধ্যে এই প্রথম আমি দয়া ভিক্ষা করে

ঈশ্বরকে তলব করলাম। কিন্তু সেকথা থাক। আমি আবার আমার দিনপঞ্জীতে ফিরে আসি।

২৮শে জুন॥ মোটামুটি ঘূম ভালোই হয়েছে। আজ অনেকটা সুস্থ। উঠে পড়লাম বিছানা ছেড়ে সকাল সকাল। গতরাতের দুঃস্মনের ঘোর এখনো পুরোপুরি কাটে নি তবু মন অনেক প্রফুল্ল। জ্বর পাছি এখন অনেকখানি। কেমন যেন বিশ্বাস, কাল আর জ্বর হবে না। আপাতত পেট ভরাবার মতো কিছু দরকার। যদি ফের কোনো কারণে অসুস্থ হই, তার জন্যে যোগাড় তো রাখতে হবে। তবে সবার আগে চাই জল। একটা বোতলে করে পাশের ঝর্ণা থেকে জল নিয়ে এলাম। মদের বোতল খুলে খানিকটা মদ মিশিয়ে নিলাম জলে। এটা এখন আমার দরকার। চাঙ্গা হতে হবে সবচেয়ে আগে। কিন্তু খালি পেটে খাওয়াটা তো উচিত নয়, তাই খানিকটা মাংস নিলাম। সেই ছাগলের মাংস। বলসে নিলাম। মুখে দিতে মুখটা যেন বিশ্বাদ। ইচ্ছে করছে না খেতে। বোতল থেকে খানিকটা তরল ঢেলে দিলাম গলায়। একটু সুস্থ লাগছে। তখন ইটলাম একটুখানি। ভারি দুর্বল শরীর। টাল খেয় পড়ে যাই বারবার। ফের সামলে নিই। আর মন দুঃখে ভরে ওঠে। শুয়েই রইলাম। আতঙ্কটা ফের একটু একটু করে মনের আনাচে কানাচে ফিরে আসছে। হয়ত কাল আমার ফের জ্বর হবে। নির্ধারণ উপায়! মৃত্যু কি আসল!

রাত্রে কটা কাছিমের ডিম আগুনে বলসে খেলাম। ইটলাম খানিকটা। কষ। বন্দুকটা হাতে নিলাম। যেন ভীষণ ভারী। বসে পড়লাম মাটিতে। চাদ উঠেছে। সমুদ্র স্পষ্ট দেখা যায়। ছবির মতো নীল শান্ত নির্বাক সমুদ্র। নানান ভাবনা ঘূরপাক খেয়ে বেড়াতে লাগল মনে।

আচ্ছা, এই যে পৃথিবী এবং এই সমুদ্র—কোথা থেকে এর জন্ম? আমরাই বা এলাম কোথা থেকে?

আমাদের জন্মের পিছনে শুনি আছে এক অলৌকিক শক্তি। তাঁরই মধ্যে এই জগৎ, এই সমুদ্র, এই সব কিছু? তিনি কে?

এর একটিই উত্তর। তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। কিন্তু সৃষ্টির একমাত্র অধিকারী যদি তিনিই হয়ে থাকেন, তবে নিয়ন্ত্রণেরও একাধিপত্য তাঁরই। অর্থাৎ এই জল স্তুল আন্তরীক্ষ সব তাঁরই তত্ত্বাবধানে নিয়ন্ত্রিত, সেক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে নিশ্চয়ই তাঁর কোনো সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা আছে। এবং যদি সত্য হয়, তবে জগতে কিছুই তাঁর অজ্ঞাতসারে ঘটতে পারে না।

সেটাকে যদি সত্য বলে মনে নিই, তাহলে এই যে আমি এখানে, এই অজ্ঞান অব্যাক্ত দ্বাপে এটা আর কেউ না জানুক, তিনি ঠিকই জানেন। আমার ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে সঠিক ভাবে তিনি অবহিত। এবং যদি ধরে নিই তাঁর নির্দেশ ভিত্তি কোনো কোজ হবার সুযোগ হয় না, তবে এই যে আমি এখানে এটাও তাঁর নিজেরই নির্দেশ।

এত অলি বলতে গেলে নির্ভুল চিন্তা। নিজের কাছে নিজেরই একের পর প্রশ্ন। একে প্রতিবাদ করার শক্তি বা সাহস আমার নেই। তবে একটিই সাম্রাজ্য, যা করেন তিনি জীবের মঙ্গলের জন্যেই করেন। সেক্ষেত্রে আমার এই নির্বাসনের পিছনেও নিশ্চয় কোনো মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে। কী সেই মঙ্গল? যদি তাঁর অমোঘ নির্দেশেই সব ঘটনা ঘটে থাকে, তবে কী সেই নির্দেশ?

এবং কেন সেই নির্দেশ তিনি দিলেন? কী করেছি আমি যে এই নির্দেশ আমার উপর

## বর্তাবার সুযোগ হল ?

সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়েছি আমি। এ প্রশ্ন করার অধিকার আমার নেই। দৈন্যরের উপর খবরদারী করতে পারে কোন্ মূর্খ? যেন জবাবটাও সাথে সাথেই পেয়ে গেলাম। কে যেন ভিতর থেকে বলে উঠল—হতভাগা, তোর এতবড় সাহস, কী করেছিস তুই জানতে চাস? তবে নিজেকেই নিজে প্রশ্ন কর, জবাব পাবি। তোর তো আগেই সংহারের অবস্থা হয়েছিল, মনে নেই সেকথা? ইয়ারমাড়োথে ঝড়ের পর সেই ঘর্মাণ্ডিক অবস্থা, তার মধ্যেও তোকে বাঁচিয়ে রাখলাম। ভুলে গেলি সেই কাহিনী? জলদসূরা জাহাজ দিল তছন্মছ করে, কত মানুষ মারা পড়ল, তুই রইলি জীবন্ত? তোর লজ্জা হয় না! আফ্রিকার উপকূলে হিংস্র জন্ম মুখে ঘরতে ঘরতে তুই বেঁচে গেলি! এখানেও তো একই হাল। ডুবে ঘরতিস তোর সাথীদের মতো। একমাত্র তোরই জীবন রক্ষা পেল। এত কিছুর পরেও ফের জবাবদিহি চাস?

সত্যি বলতে কি আমি তখন থ। মৃক হতবাক, বিস্ময়ে শুক্র। একটি কথা বলার শক্তিও আমার নেই। ভীষণ বিমর্শ ভাব। সেই অবস্থাতেই ধীরে ধীরে উঠলাম। গেলাম



এই তো তামাক

তাবুর ধারে। ঘুমোব এবাব কিঞ্চ ঘুম যে ছুটি নিয়েছে চোখ থেকে। চেয়ারে বসলাম। আলো আললাম। ভয় করছে বুব। মনের মধ্যে অঙ্গুত একটা আতঙ্কের ভাব। যদি ফের আমার অৱ হয়। যদি কাল আবার পড়ি বেহুশ হয়ে। তখন মমে পড়ল ব্রাজিলের কথা। অসুখ বিসুখ হলে সেখানে সকলে যায় তামাক। তাতেই নাকি সব রোগ সেবে যায়। তামাক তো খানিকটা আমার সাথেও আছে। কিছুটা তার শুকনো, কিছুটা কাঁচা। দেখা যাক না, যদি কোনো উপকারে পাই।

সে যেন দৈন্যরেই অদৃশ্য নির্দেশ। উঠলাম ঘোরগুহ্য মানুষের মতো। পেটি খুললাম। এই তো তামাক। পাশে জাহাজ থেকে আনা সেই বই ক'খানা। তার মধ্যে বাইবেলও আছে। সেটাও নিলাম। সঙ্গে তামাক। তারপর ফের এসে বসলাম চেয়ারে।

তামাকে কি সারে কতটুকু সারে আমার জানা নেই, তবু এইটুকুই ভরসা, খেয়ে দেখতে

হবে আমাকে, সারবে যে এটা নির্ধারণ। একটা পাতা মুখে ফেলে চুষতে লাগলাম। সে যা তেজ। মুহূর্তে যেন টলতে লেগেছে আমার মাথা, সঙ্গে সারা শরীর। কাঁচা পাতা কিনা, তাই তেজ পাকা পাতার চেয়ে বেশি। এদিকে আমি তো আর তামাক টামাকে অভ্যন্ত নই। তখন আরো খানিকটা নিয়ে সেই বোতলের তরলে ভিজিয়ে রাখলাম। তা প্রায় দুটা দুই। মিশল তেজ। এবার এক অনুপান এই বোতল থেকে থাব। এটা আমার ওমুধ। খেলাম তাই। শুকনো পাতাটা নিয়ে আগুনের কাছে ধরলাম। দেখি ঝাঙ্গ বেরচ্ছে। তখন নাকটা এগিয়ে নিলাম পাতাটার কাছে। তক করে খানিকটা ধোয়া চুকল নাকে। সরালাম না। মোটমাট যতক্ষণ সহ্য হয় আমি স্বাণ নেব। দেখি ফল কী দাঢ়ায়।

বাইবেল ততক্ষণে খুলে ফেলেছি। পড়তে শুনু করলাম। কিন্তু মাথা যে এখন দেখি টলে যায়। সেই তামাক পাতা চুষে খাওয়ার ফল। পারছি না পড়ার দিকে মন বসাতে। বই কিন্তু খোলা। ঘুরে ফিরে চোখে পড়ে শুধু একটা মাত্র ছত্র— বিপদের দিনে আমার স্মরণ নিও। আমি তোমার পরিত্রাতা। আমাকে মহিমাধিত করবে তুমি।

প্রতিটি শব্দ প্রতিটি অক্ষর গভীর তাৎপর্যে মণিত হয়ে আমার হাদয় স্পর্শ করল। অপূর্ব সঙ্গীতের মতো এর শুভি, কানের পর্দায় অনুরূপন সৃষ্টি করে। কিন্তু সব কথা কি ঠিক? আমার বাস্তব অবস্থায় প্রতিটি কথার কি মূল্য আছে? যেমন: আমি তোমার পরিত্রাতা। কিন্তু কীভাবে তিনি আশ করবেন আমাকে এই অস্তুত পরিবেশ থেকে? এ কি আদৌ সন্তুষ্ট? আমি তো আশার লেশমাত্র দেখতে পাই না। তবে কেন এই প্রবক্ষনা?

সে যাই হোক, রাত বাড়ছে। কিম মেরে আছে মাথার মধ্যে। আমাকের প্রতিক্রিয়া আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি। ঘুম পাচ্ছে। শুয়ে পড়লাম। আলো নেভলাম না। ছলুক। যদি রাত্রে কখনো উঠি দরকারে লাগবে। কী মনে হতে ফের উঠে বসলাম শয়ে ছেড়ে। ইঁটু গেড়ে বসলাম। করি নি এমন কোনোদিন। আজ ভাবি ইচ্ছে করছে। প্রার্থনা করব আজ। ঈশ্বরকে বলব তার সব প্রতিশুভি যথাযথ ভাবে পূরণ করতে। আমাকে যেন মুক্তি দেন এই দুর্দশা থেকে। যেন আশ করেন।—ঈশ্বর তুমি আমাকে রক্ষা কর।... তারপর বোতল থেকে ঢকচক করে খানিকটা পানীয় গিলে ফেললাম। খুব কড়া লাগছে। তামাকটা মিশেছে বেশ চমৎকার ভাবে। মনে এবার বেশ জোর পাচ্ছি। আমার আর ভয় নেই। নেই কোনো দুর্ভাবনা। এবার শুয়ে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম। গভীর গাঢ় নিদ্রা। ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে সেই বিকেল। তখন তিনটে প্রায় বাজে। ঝলমল করছে রোদ। তবে পরে চিন্তা করে দেখেছি, পরদিন নয়, ঘুম ভেঙেছে তারও পরের দিন। অর্থাৎ ঘুমিয়েছি আমি মোট দেড়দিন এক রাত। নইলে কি করে আমার একটা দিন হিসেব থেকে কমে যায়। পরে হিসেব মেলাতে গিয়ে এটা নজরে পড়েছে।

ঘুম ভাঙ্গতে আমি তো পুরোপুরি সুস্থ। কী যে তাজা লাগছে শরীর! ভিতরে বেশ একটা খুশি খুশি ভাব। মনও প্রফুল্ল। কাজ করতে উৎসাহ লাগছে। আর ক্ষিধে পেয়েছে ভীষণ। মোটের উপর সুস্থ লোকের যা যা হয় তাই। আমার হিসেব মতো সেটা ২৯ তারিখ।

পরদিন যথারীতি বন্দুক নিয়ে বেরলাম। শরীরে তেমন ক্লাস্তি নেই, মোটের উপর সুস্থ স্বাভাবিক আমি। বেশ ভালো লাগছে। তবে বেশি দূর যাবার দরকার হল না। পথে দেখি একটা মুরগি। মারলাম। পরে আরো একটা। তাকেও প্রাণ দিতে হল। নিয়ে এলাম তাঁবুতে। কিন্তু ঝাঁধতে আজ আর ইচ্ছে করছে না। তখন কাছিমের ডিম ছিল কটা, তাই খেলাম। বেশ লাগছে খেতে। ওমুধ বানালাম আরো একটা বোতল। সেই মদ, তাতে

তামাক, মিলে মিশে তামাকের আরক, খেলাম একটুখানি। অর্থাৎ অনুপান মতো। তবে কাঁচা পাতা আর চিবিয়ে বা চুম্বে খেলাম না। তামাকের ধোয়াও নিলাম না আজ। জানি না সেই জন্যে কিনা, পরদিন অর্থাৎ ১লা জুলাই শরীর আবার গোলমাল করল। সেই অসুস্থ ভাব। তবে ততটা প্রবল নয়। হিম হিম ঠাণ্ডা ভাব আছে, কিন্তু তার দাপট প্রথম দিনের মতো ততটা নেই।

১রা জুলাই॥ ওষুধ চলছে। অনুপান আগের তুলনায় আরেকটু বাড়িয়েছি। প্রায় দু গুণ। মাথায় বিষ ধরা ভাবটা আছে।

৩রা জুলাই॥ সূস্থ বলতে পারি না, তবে বিষ বিষ ভাব। বেঙ্গল মতো অনেকটা। ওষুধের ক্রিয়া কিনা কে জানে। শরীরে তাগদণ্ড আজ কম। পরিপূর্ণ বল ফিরে পেতে আরো অনেকদিন লাগবে এটা স্মানি। তবে এই দুদিন ধরে সমানে বাইবেলের সেই লাইনটা ফিরে ফিরে আমার মনে শুরুপাক থাচ্ছে।—আমি তোমার পরিত্রাতা। অসার অহেতুক এই ভাষ্য। তবু একে কেন্দ্র করে মনের গভীরে কোথায় যেন আশার এক চিলতে আলো দেখতে পাই। কে জানে, হয়ত ত্রাণ পেলেও পেতে পারি। উদ্ধার পেতে পারি এই সংকট থেকে। কিন্তু কী সেই উপায়? যোটমাট প্রশ্ন দিই না একদম। চিন্তা এলেই মন থেকে দূর করে দিই। যা অসম্ভব তাকে নিয়ে কী আর অহেতুক কল্পনাবিলাস ভালো! তবে পুরোপুরি কল্পনাই বা বলি কী করে। কোনোরকম ত্রাণ কি আমি পাই নি? সংকট থেকে এতটুকু মুক্তি কি পরিত্রাণ? এই তো অসুখ হয়েছিল আমার। নেই কেউ কাছে যে একটু সেবা করে বা দেখাশোনা করে। ঈশ্বরই তো অদৃশ্য দু হাতে আগলে রেখেছেন আমাকে সারাক্ষণ, সংকট থেকে মুক্তি দিয়েছেন। অসুস্থতাকে কেন্দ্র করে মনে যে তবের জন্য হয়েছিল তা থেকে তিনিই তো আমাকে উদ্ধার করেছেন। সে ভয় এখন আমার মনে কোথায়? পাশাপাশি, পারি নি তো আমি তাকে গৌরবাদ্বিত করতে। অন্তত এ সবের জন্যে একটু কি ধন্যবাদ প্রাপ্ত ছিল না তাঁর? আমি এমনই অবোধ, পারি নি তাকে ধন্যবাদ দিয়ে মুখ উজ্জ্বল করতে।

মরমে মরে যাওয়া যাকে বলে। আমার অবস্থা ঠিক তাই। হায় হায়, এ আমি কী করেছি! অমনি বসে পড়লাম হাঁটু গেড়ে প্রার্থনায়। নিজের অন্যায়ের জন্যে মার্জনা ভিঞ্চা করলাম। সববে জানলাম ধন্যবাদ। মনটা একক্ষণে হালকা লাগছে।

৪ঠা জুলাই॥ সকালে বাইবেল খুলে বসলাম। গভীর মনোযোগে শুরু করেছি পড়া। এবার থেকে নিয়ম করে সকালে রাত্রে আমি বাইবেল পড়ব। পড়বই। কেউ পারবে না আমাকে এই নিয়ম থেকে চুত করতে। তা ঐ এক গোল। যেই শুরু করি অমনি মন অনুত্তাপে দগ্ধ হয়। মনে পড়ে সেই বিকটদর্শন স্বপ্নের কথা। সেই ভয়ঙ্কর মানুষ। হাতে তার বশি। আমারই বুক লক্ষ্য করে উদ্যত। বলছে—এত সবের পরেও তোর মনে একটু অনুত্তাপ নেই?..... ঈশ্বর, তুমি আমাকে অনুত্তাপ দাও। আমি যেন আমার কৃতকর্মের জন্যে অনুত্তপ্ত হতে পারি। এই ভাবি সারাক্ষণ। আর দু চোখ অধীর আগ্রহে পাতার পর পাতা ছত্রের পর ছত্র পড়ে যেতে থাকে। পড়তে পড়তে হঠাত থমকে গেলাম একটা ধ্যায়গায়।— অনুত্তাপ পারে মানুষকে মহান করতে, ঈশ্বরকে মহান করতে, রাজাকে সম্মানের আসনে উন্নীত করতে।

অমনি ছুড়ে ফেলে দিলাম বই। আর পড়তে মন চাইছে না। মনে এখন এক গভীর উল্লাস। আমি হাঁটু গেড়ে বসে আকাশের দিকে দুহাত তুলে ধরলাম।—পড়ু, তুমি আমাকে অনুত্তাপ দাও, আমার মন দৃঢ়ৈ তাপে জজ্জরিত কর। তুমি মহান ত্রাতা। অনুত্তাপে দগ্ধ

হয়ে আমি তোমাকে আরো মহান করব।

এ আমার অস্তরের প্রার্থনা। এমন ভাবে ঈশ্বরকে আর কখনো ডাকি নি। আমার বাস্তব অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে, আমার অতীত আমার ভবিষ্যৎ সব কিছুই সঙ্গে মিশ খাইয়ে এ এক অনবদ্য অপরূপ বর্গের সুষমা মাঝা প্রার্থনা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ঈশ্বর এ প্রার্থনার প্রতিটি শব্দ শুনতে পেয়েছেন।

নতুনভাবে এখন থেকে সব কিছু আমি বুঝতে পারছি। এতদিনে ‘আমি তোমার পরিত্রাতা’ কথাটির সারমর্ম আমি অনুধাবন করতে পারছি। এ আর কিছুই নয়, মানুষ যে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বন্দী হয়ে পড়ে, তার নিজস্ব ভূল ভাস্তির গম্ভৰে,—এ তারই থেকে ত্রাণ। দ্বিপ আমার কাছে কারাগার আমি জানি। সেখানে আমি বন্দী, তা-ও আমার অজ্ঞাত নয়। কিন্তু সে বন্দীত্ব আমার কাছে বড় নয়। তার চেয়েও বড় হল আমার নিজের চেতনা, আমার অতীতের ভূল ত্রুটি পাপ অন্যান্য প্রভৃতির কাছে দাসত্ব। এর হাত থেকে মুক্তি তো আসল মুক্তি। তবে না মন আমার শুন্দ হবে, পাপ স্থালন হবে। সেটাই মানুষের কাম্য। মনকে শুন্দ করাই সব চেয়ে বড় ব্যাপার। আমি বন্দী দশা থেকে ত্রাণ পাবার আগে চাই নিজেকে শুন্দ করতে।

কিন্তু সে অনেক পরের কথা। অনেক গভীর অনেক তাৎপর্যে ভরা চিন্তা। সেটা আপনাতত স্থগিত থাক। আমি ফিরে আসি আবার আমার বিবরণীতে।

মনের দিক থেকে এখন আমি অনেকটা মুক্ত। যদিও অবস্থার খুব একটা হের ফের হয় নি। যেমন পরিবেশে ছিলাম তাই আছি। তবু ভাবতে পারি এখন স্বচ্ছন্দে। জীবনের প্রতিটি বিষয়ে ঈশ্বরের হাতের ছোয়া দেখতে পাই। যেন তাঁরই নির্দেশে আমার প্রতিটি পদক্ষেপ, তাঁকে অগ্রহ্য করে এক পা চলার শক্তি আমার নেই। রোজ পড়ি তাঁর নির্দেশাবলী। প্রার্থনা করি। মন উন্নীত হতে চলেছে প্রকৃতির উর্ধ্বে অচেনা অজ্ঞান এক জগতে। তাতে অসীম ত্ত্বপুরুষ বোধ। জানি না কোন সে দেশ, কী সেই স্থান। তবু ভাবতেও চমৎকার লাগে। আমার শরীরে একটু একটু করে হত বল আবার ফিরে আসছে। সম্পূর্ণ সুস্থ বলতে যা বোঝায় তাই। যা চাই আমি সবই এখন ঘোটামুটি পেয়ে থাকি। জীবনের গতিও এখন অনেকটা স্বাভাবিক।

৪ঠা থেকে ১৪ই জুলাই অন্দি প্রধান কাজ আমার নিয়মিত বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়া। খুব একটা দূর আব্দি যেতে পারি না, এখনো পুরো তাগদ ফিরে পাই নি। তবে রোজই একটু একটু করে বাড়াই যাতায়াতের সীমা। তাতে সুস্থতা একটু একটু করে ফিরে আসে। আগে হলে জানি না এই ভাবে করতাম কিনা। অবিশ্য সে প্রশ্নও আসে না, কেননা আগে তো আমি ভয়ের কবলে কখনো পড়ি নি। ঘোটামুটি কী করতে হবে করা উচিত সেটা এখন ঠিকঠিক অনুধাবন করতে পারি। এটাই লাভ। মন মুক্ত হলে পারে বোধহয় মানুষ এমন করতে। মাঝে মাঝে কাজ একটু নিয়মছাড়া হলে ভিতরে ভিতরে কাহিল লাগে। তবে সে মুহূর্তের জন্যে। মনে স্থান দিই না সে সব ভাবনা। আশা যে মনে এখন বিস্তর। আশাই আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়।

এরই মধ্যে কতগুলো জিনিস আমি বুঝতে পেরেছি। বৃষ্টি আমার একদম সহ্য হয় না। বিশেষ করে ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাত সহ শুকনোর দিনের বৃষ্টি। ভিজলে নির্ধারণ আমার শরীর খারাপ হবেই। বরং সেপ্টেম্বর অক্টোবরের বৃষ্টি অনেক ভালো। ঝড় বিদ্যুতের বালাই নেই। ঝরঝর করে খানিকটা ঝরে তারপর শেষ হয়। বছরে এখানে দুটো বর্ষাকাল।

দশ মাস তো হল আমি আছি এই দ্বীপে। মুক্তির চিন্তা আর করি না। স্থানও দিই না

মনে। মুক্তি আমার নেই এটাই ধরে নিয়েছি। আমি বোধহয় প্রথম মানুষ যার পায়ের ছাপ এতদিনে এই দ্বীপে পড়ল। বোধহয় বলি কেন, এটাই ঠিক। আর কেউ এলে তার কোনো না কোনো চিহ্ন আমার ঠিকই নজরে পড়ত। তবু একটা কাজ এখনো বাকি। তা হল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দ্বিপটাকে একবার পর্যবেক্ষণ করা।

এবং সে কাজে পনেরই জুলাই থেকেই লেগে পড়লাম। প্রথমে যাব খাড়ির দিকে। আমার ভেলা এনে ওখানেই প্রথম ভিড়িয়ে ছিলাম। হাঁটিতে হাঁটিতে চলে গেলাম মাইল দুয়েক পথ। দেখি টেউ এদিকটায় কম। নদীটাও এদিকে খুবই সঙ্কীর্ণ। কুল কুল করে বয়ে চলেছে আপন খেয়ালে। জল এখন হাঁটু সমান। এটা তো টানের সময় তাই। এই যা জল, এতে মৌকো বাওয়া অসম্ভব।

আর কী চমৎকার মাঠ নদীর ধারে! ঘাসের যেন মখমল বিছিয়ে রাখা। খোলা আকাশের নিচে উদার উন্মুক্ত বিশাল এক ক্ষেত্র। মনে হয় বর্ষার দিনে এই মাঠে জল ওঠে। তবে পুরোটাতে নয়। ধীরে ধীরে উচু হয়ে উঠেছে প্রান্তদেশ। সেখানে কত বিচ্ছিন্ন যে গাছ গাছলি। বিস্তর তামাক গাছ। আকারে বেশ বড় বড়। সচরাচর এমন তামাক নজরে পড়ে না। আরো সব কত কি গাছ, তরতরে সবুজ তাদের পাতা। চিনি না আমি। দেখি নি আগে কোনোদিন।

ক্যাসাভা গাছের মূল থেকে অদিবাসীরা বুটি বানায়। খুঁজলাম তাই আঁতিপাতি। পেলাম না। দেখি আখ হয়ে রয়েছে বিস্তর। মন্ত বড় বড়। কেউ তো আর চাষ করে নি, তাই বুনো বুনো ভাব, আর গায়ে গায়ে লেগে যেন গভীর এক জঙ্গল। আজ এইটুকুই থাক। মেটামুটি যা আবিষ্কার হল আমি খুশি। এতটা যে দেখতে পাব এমন আশা করে তো বেরই নি। আরো দেখার প্রয়োজন আছে। তবে চিনি না যে বিশেষ কিছু। ব্রাজিলে থাকতে খেয়াল করে তো দেখি নি কোনোদিন। কোনটা কোন গাছ, কী তার উপকার এগুলো জেনে রাখা অনেক ভালো। তাহলে বিদেশ বিভুয়ে অনেক সময় উপকার হয়।

পরদিন ষোল তারিখ। একই পথ ধরে এগোলাম। তবে এগিয়ে গেলাম আজ আরো খানিকটা পথ। এদিকে প্রকৃতির ভিন্ন বৃপ্তি। ঘাস কমতে কমতে ঘন সবুজ বনানী। বড় বড় গাছ। তাতে অঙ্গসূ ফল। কত যে মৌসুম কত আঙুর আরো কত কী আমি বলে বোঝাতে পারব না। খোকায় খোকায় অঙ্গুর, আর কী মিষ্টি। খেলাম কয়েকটা। বেশ স্বাদ। তবে বেশি নয়। নিজেকে সংযত করলাম। শুনেছি এই জাতীয় ফল খাবার পরিপামের কথা। বন্দীদের ছেড়ে দিত এমনই সব নির্জন দ্বীপে। আঙুর খেত খুব। তারপর জ্বর হত। সে জ্বর আর কমার নয়। তবে আমার তো আর অত খাবার প্রয়োজন নেই। এটা শুকনোর দিনের সংঘর্ষ। পানীয় জলের অভাবে গলা ভেজাতে পারব, ত্বক যিচিবে আকষ্ট। কিছুটা কিছুটা করে তুলে নিয়ে রেদে শুকিয়েও রাখতে পারি। তখন হবে কিসমিস। দু এক দানা মুখে ফেলে চুরব। সেও তো একটা অন্য ধরনের খাবার।

সারাদিন সেখানেই কাটল। অঙ্ককার ঘনিয়ে আসছে। আসুক, আজ আর বাড়ি ফিরব না। দরকার কী ফেরার। এই তো ফলফলাদি মজুত। একটা রাত কাটাবার পক্ষে যথেষ্ট। বরং বাড়ি ফিরলে কাল আবার এতদূর উজিয়ে আসতে হবে। তারপর ফের এগোনো। দরকার কী অনর্থক বেশি হাঁটার। তখন কাছের একটা গাছে উঠলাম। বাঁধলাম শক্ত করে নিজেকে গাছের সঙ্গে। তারপর ঘূম। তাবু গাড়ার পর এই প্রথম আমি বাইরে ঘুমোলাম। পরদিন ভোরে ঘূম ভাঙল। শুরু হল ফের হাঁটা। এগিয়ে গেলাম আরো থায় মাইল চারেক। চলেছি উত্তর মুখো। ডাইনে পাহাড়ের রেখা। দক্ষিণ থেকে উত্তর আগামোড়া

বলতে গেলে পাহাড়।

এদিকটা মোটামুটি ফাঁকা। গাছপালা বিশেষ নেই। একটা মোটে ঝরনা। তাতে টলটল করছে সুস্থাদু পানীয় জল। পাহাড়েরই বলতে গেলে লাগেয়। আর অবাক কাণ্ড। এত সজানো গোছানো এই দিক! এটা পশ্চিম। মনে হয় যেন কেউ গাছগুলোকে হাতে করে বসিয়েছে। কোনো নিপুণ যালী। আমার ভারি অবাক লাগছে।

উপত্যকা এটা। দেখতে দেখতে চলেছি। অপূর্ব এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। আর মনে খুব খুশি খুশি ভাব। এই সারা দ্বীপ, এই পাহাড়, এই উপত্যকা, এই ঝর্ণা এই গাছগাছালি—সব কিছুর, আমি একচ্ছত্র অধিপতি। কেউ পারবে না এর মালিকানা আমার হাত থেকে কেড়ে নিতে। ইংল্যান্ডের যে কোনো সামন্ত প্রভুর চেয়ে আমার জমিদারীর পরিমাণ কম নয়। দেখি বিস্তর কোকো, কমলালেবু, লেবু, আর জামির গাছের ছড়াছড়ি। ফল ধরে নি। বুনো গাছ তো। তাই ফল ধরে না। বা ধরলেও তেমন সুস্থাদু হয় না। বাতাপি পেলাম অনেক। কাঁচ। মাটিতে ঝড়ে পড়ে আছে। কুড়িয়ে নিলাম ভিতরটা দেখি টকটকে লাল। জলের সঙ্গে মিশিয়ে পরে অনেক খেয়েছি। অপূর্ব স্বাদ। আঃ প্রাণ যেন ঝুঁড়িয়ে যায়।

এবার ফেরার পালা। সঙ্গে বিস্তর বাণিজ্যের পশরা। বাণিজ্যই বলব একে, না অন্য কিছু? আঙুর প্রচুর, সেই সাথে বাতাপি, আর বিস্তর মৌসুম্বি লেবু। কিন্তু নিহ কীভাবে? তখন টাল দিয়ে সাজিয়ে রাখলাম পাশাপাশি। নিলাম অল্প স্বল্প। যতটা পারা যায় জামায় বেঁধে। থাক আজ বাকিটা এই অবস্থায়। কাল আসব থলি নিয়ে। তাইতে করে সব নিয়ে যাব।

প্রায় তিনিদিন পর বাড়ি ফিরলাম। সে যা আনন্দ আমার। তাঁবুটাকেই আপাতত বাড়ি বলতে শুবু করেছি। আর সেই গুহা। এসে দেখি আঙুরগুলো সব পচে গেছে। পাকা তো ছিল খুব। বেঁধেছি জামায় শক্ত করে। সে চাপ আর সহজ করতে পারে নি। বাতাপি আর মৌসুম্বির কোনো বিকার নেই। তবে দুঃখ এই—এত বড় বড় ফল, পারি নি একসাথে অনেকগুলো আনতে।

পরদিন উনিশ তারিখ। গেলাম ফের। সঙ্গে দুটো থলি। অবাক কাণ্ড, পৌছে দেখি কাল যে টাল দিয়ে সাজিয়ে রেখে গিয়েছিলাম ভাগে ভাগে ফল—কে যেন দিয়েছে সব তছনছ করে। লঙ্ঘণ বলতে যা বোঝায়। ঠিন যেন দাপাদাপি করে পায়ে পিষে দলিয়ে দেওয়া। নির্ধারণ কোন জানোয়ারের কাজ। আমি হলফ করে বলতে পারি। আমার অঙ্গাতসারে এসে এই কাণ্ড করে গেছে।

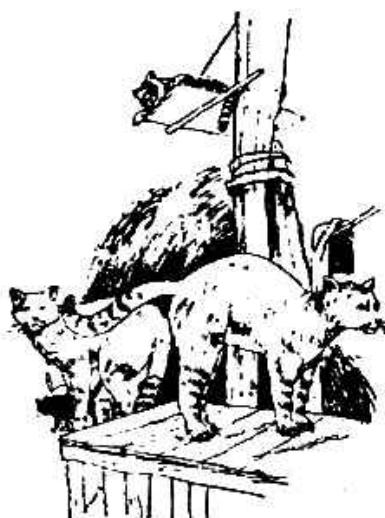
আর তো ওগুলো নেওয়া যায় না। তখন চলল নতুন করে আর এক দফা সংগ্রহের পালা। বিস্তর আঙুর নিলাম। সঙ্গে বাতাবি আর মৌসুম্বি। বেদম ভারী। তবে এক কাজ করা যাক। আঙুর আর বাড়ি অন্দি নিয়ে যাব না। দেখেশুনে উচু মতো একটা গাছে থলিটা ঝুলিয়ে দিলাম। রোদ পাবে এখানে। তাতে শুকোবে। তারপর সময় সুযোগ বুঝে একদিন এসে নিয়ে যাব। আজ বরং বাতাবি আর মৌসুম্বিই নিয়ে যাই।

মোটামুটি বেশ লাগছে এখন। সাম্রাজ্য আবিষ্কারের কাজ শেষ। খাদ্যেরও সর্কান পাওয়া গেছে। এখন নতুন করে আস্তানা গড়ার সমস্য। কোথায় করি সেটা। মন ছুটে যায় পশ্চিমের সেই অংশে, সাজানো বাগানের মতো সেই যে দিক। ইচ্ছে করে ফাঁকা মাঠে তাঁবু গেড়ে সুস্থির হয়ে বসবাস করি। কিন্তু তাতে সমস্যা অনেক। প্রথমত মালপত্র টেনে নিয়ে আসা এক ঝামেলা। তার উপর যদি সমুদ্রের কাছ থেকে সরে অন্য দিকে যাই তবে সমুদ্র দেখার যে একটা প্রয়োজন আছে—কোনোদিন যদি দেখা পাই কোনো জাহাজের, কিংবা আমারই মতো কোনো হতভাগ্য যদি ভাসতে ভাসতে এসে দ্বীপে ঠেকে— তার আর

পরিচর্যা করা হবে না। কিংবা জাহাজ এলে সেটা দেখাও যাবে না। মোটমাট এ জাহাগা ছেড়ে আমার পক্ষে অন্য কোথাও যাওয়া মোটেই সমীচীন নয়।

তবে হ্যাঁ আলাদা একটা ডেরা করা দরকার। বাসা যেরকম। একটু দূরেই নতুন একটা তাঁবু গাড়া হল। মোটের উপর খোলামেলা চারধার। চারপাশে বেড়া দিলাম। গাছের ডাল কেটে সারি সারি তাই পুতে দেওয়া। তাঁবুর চারধারে পাল আর মাথার উপর ত্রিপল। গোটা ব্যাপারটাই একটা মাচার উপরে। অর্ধাং তাঁবুতে টুক্তে গেলে আমাকে মই হেয়ে প্রথমে শাথায় উঠতে হয়, তারপর তাঁবু। নিরাপত্তার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। বেশ নিশ্চিন্ত। সব মিলিয়ে খাটতে হল আমাকে ঝুলাই মাসের বাকি কটা দিন। আগস্টের শুরু থেকে নতুন তাঁবুতে রাত কাটানো শুরু করলাম।

কিন্তু কদিন কাটতে না কাটতে তুমুল বৃষ্টি। সে কি আর তাঁবুর ত্রিপল পারে বুঝতে। তখন ঢুকলাম গিয়ে ফের গুহায়। আমার তো বৃষ্টিতে ভেজা বারণ। ভিজলেই না আবার জ্বরের কবলে পড়ি। জ্বর নিয়ে আমার আতঙ্ক কিন্তু এখনো আছে।



এদিকে বলতে ভুলে গেছি, ঘড় বাদলের সম্ভাবনা দেখে তিন তারিখ গিয়েছিলাম সেই আঙ্গুর বাগানে, খোলানো সেই থলি নিয়ে এসেছি। শুকিয়েছে চমৎকার। যদি বৃষ্টি পড়ত তবে তো পচে গলে যাচ্ছতাই কাণ। ভালোই হল। বর্ষার দিনে তো বাইরে বেরনো ঝঞ্চাট। চলবে প্রায় অক্টোবর অন্তি। তখন এগুলো দিয়েই যেমন করে হোক শুধু নিবৃত্তির কাজ হবে।

এদিকে পরিবার পরিজন ক্রমশ কিন্তু বাড়ছে। দুটো বেড়ালের মধ্যে একটা আছে, আরেকটা পালিয়ে গিয়েছে সেই কবে। তারপর থেকে সে আর আসে না, বা বনে বাদাড়ে ঘুরি দেখাও পাই না কোনোদিন। ধরে নিয়েছি সে আর জীবিত নেই। ওমা, দেখি বর্ষা পড়তে না পড়তে শ্রীমতি বিড়ালনি তিন তিনটা বাচ্চা সমেত গটগটিয়ে সঁটান গুহায় এসে হাজির। আমি তো হতবাক। আমার বাকি বিড়ালটাও মাদী। এ তাহলে বাচ্চার মা হল কোথেকে? একটা বনবিড়াল মেরেছিলাম একদিন এটা ঘটনা। কিন্তু বাচ্চাদের মধ্যে তো বুনো ভাব এতটুকু নেই। তবে নির্ধাং এখানে এমনি বিড়ালও আছে।

দেখতে না দেখতে বছর দুইয়ের মধ্যে গুহা আমার বেড়ালে বেড়ালে ছফলাপ। সমানে দুটোতে বাচ্চা বিয়োয়। এদিকে পুরানো বাচ্চারাও ক্রমে সাবালক হচ্ছে। তাদেরও পড়ে গেছে বাচ্চা দেবার ধূম। আমার তো আহি আহি হাল। তাড়িয়ে দিলেও যায় না। শেষে কটাকে মেরে ফেলতে বাধা হলাম। দূরে পার করে দিয়ে এলাম কটাকে। তবে যা শাস্তি।

১৪ই আগস্ট থেকে ২৬ তারিখ অব্দি সমানে বৃষ্টি। যেন মুহূর্তের জন্যেও কামাই নাই। আমার তো বেরনো একদম বন্ধ। বাপরে বাপ, ভূলেও আর বৃষ্টিতে ভিজি! এদিকে খাবারের আকাল। তখন বাধ্য হয়ে বৃষ্টি একটু থামতে বেরিয়ে পড়লাম। একবার নয়, মেট দুবার। একদিন মারলাম একটা ছাগল, আরেকদিন আস্ত এক কাছিম। সঙ্গে কিসিমিস তো আছেই। তোফা ব্যবস্থা। সকাল ঝলসানো ছাগলের মাংস, সঙ্গে একমুঠো কিসিমিস, বিকেলে কখনো মাংস নয়ত কাছিমের ডিম। রান্না করার উপায় নেই, কেননা বাটি নেই একটাও আমার সাথে। যদি থাকত তবে খোলটোল যাহোক রেঁধে কদিন বেশ দারুণ আয়েস করা যেত।

তাই বলে বসে নেই চুপচাপ। বসে থাকলে হাত আমার নিশপিশ করে। গুহাটাকে একটু একটু করে বড় করছি। খুড়ছি রোজ। একদিন দেখি খুড়তে খুড়তে সটান বাইরে এসে উঠেছি। আমার বেড়াটা ছাড়িয়ে আরেকটু ওপাশে। ভালোই হল। এটাকে এবার থেকে দরজা বলে ব্যবহার করব। তবে বেড়ার বাইরে হল দরজাটা। এটাই যা একটু দুচিন্তা। মুখ আগলাতে হবে। নইলে এভাবে খোলা মেলা রেখে নিশ্চিন্তে তো আর ঘুমোনো যায় না। জীবজন্তুর ভয়টাই সবচেয়ে বড় কথা। তবে তেমন কিছু হিংস্র জন্তু নেই বলেই আমার বিশ্বাস। এতদিনে দেখেছি মোটে কটা ছাগল আর ভাষ। এছাড়া অন্য কিছু আছে বলে তো মনেও হয় না।

৩০শে সেপ্টেম্বর॥ আমার জীবনের সেই চরমতম দুর্ভোগের দিন। আজ ঠিক একবছর পূর্ণ হল এখানে আসার পর। দাগ মিলিয়ে দেখলাম ঠিক তিনশ পঁয়টি দিন। সারাটা দিন ছিলাম অনাহারে। কূলে পড়ে ছিলাম বেইশুশের মতো। তারপর ডাঙ। তারপর অচেতন। মত্তুর মুখেমুখি হ্বার যে কত যন্ত্রণা সেদিন আমি যর্মে যর্মে অনুভব করতে পেরেছি। আজও একইভাবে আমি অনাহারে কাটালাম। সারাদিন প্রার্থনা করলাম দৈশ্বরের কাছে—হে করুণাময়, আমাকে ক্ষমা কর, মুক্তি দাও। আমি পাপী। আমি বহু অন্যায় করেছি। তুমি আমার সব পাপ স্পৰ্শালন কর। এইভাবে রাইলাম টানা বার ঘট্ট। এক আঁজলা জল অব্দি মুখে তুলি নি। তারপর সঞ্চ্যা ঘনাতে বিস্কুট খেলাম, আর কিসিমিস। মাংস সেদিন আর স্পর্শ করলাম না। তারপর সটান বিছানায়। শোবার সঙ্গে সঙ্গে চোখ জুড়ে ঘুম নামল।

দিনের হিসেব রাখতে গিয়ে মন্ত একটা ভুল হয়ে গেছে। রবিবার উপাসনার দিন। দাগ কাটার সময় সেটা আর আলাদা ভাবে মার্কো রাখি নি। বস্তুত প্রথম দিকে রাখবার প্রয়োজন আছে বলেও বোধ হয় নি। ধর্মের দিকে তেমন তো মতিগতি ছিল না। এখন যেহেতু রোজ প্রার্থনা করি, রোজ পড়ি বাইবেল, তাই মনটা কেবলই উসখুস করে। তখন গোড়া থেকে ফের হিসেব করে করে রবিবারগুলো ঠিক করলাম। এবার থেকে রাখতে হবে রবিবারের হিসেব। দাগটা একটু বড় করে দিলেই বুঝতে পারা যাবে। মোটমাট উপাসনার দিন এবার আর একটিও আমি বাদ যেতে দেব না।

এদিকে কালির সঞ্চয় ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছে। সেটা আমার কাছে নিদারুণ

আশকার বিষয়। এখন থেকে শুধু দিনপঞ্জী ছড়া অন্য কিছু লেখা চলবে না।

কোনটা টানের সময় আর কোনটা বর্ষাকাল সেটাও এতদিনে আমি বুঝতে পেরে গেছি। সেইভাবেই মোটামুটি নিজের কার্যক্রম রচনা করি। কিন্তু শুধু দেখে তো আর হয় না, ঠেকেও অনেক কিছু শিখতে হয়। একেকটা ঘটনা ঘটে আর মানুষ অভিজ্ঞতা দিয়ে তাকে বুঝতে শেখে, জানতে শেখে। যেমন আমার চাষের সেই প্রথম বার। ঘটনাটা কী বলি।

একদম প্রথম বারের ফেলে দেওয়া সেই বীজ, তার যা ফসল আমি তো রেখে দিয়েছি জমিয়ে। ভাবলাম, আসছে বর্ষাকাল, এবার একটু হিসেবে মতো চাষবাস করি।

জায়গা ঠিক করলাম। খুড়লাম নিজের যা যন্ত্রপাতি আছে তাই দিয়ে। যব আর ধান মিলিয়ে সঞ্চয় আমার প্রায় দু মুঠো। একবার ভাবলাম সবই ছড়িয়ে দিই। পরে ভাবলাম থাক, বরং এক মুঠো সঞ্চয়ে থাকুক। যদি কোনো কারণে ফসল না ফলে।

তখন এক মুঠো রেখে বাকি এক মুঠো ছড়ানো হল। দিনের পর দিন যায়, দেবি অঙ্কুর গজাবার আর লক্ষণ মাত্র নেই। হবে কোথোকে? তারপর কি আর বৃষ্টি হয়েছে? রোদের তেজ যে ভীষণ। মাটির বুকে যেটুকু জল ছিল তাও নিয়েছে শুষে। সব চেষ্টা আমার বিফলে গেল।

তারপর এল বর্ষাকাল। নতুন একটা জায়গা ঠিক করলাম। আমার মাচানের ঠিক কাছ বরাবর। জমি তৈরি হল। বীজ ছড়লাম। দেবি কদিনের মধ্যেই অঙ্কুর গজিয়েছে। সে যে কী আনন্দ আমার! দেখতে দেখতে বড় হল গাছ। আতে দানা হল। যব আর ধান মিলিয়ে সে অনেকখানি। আমি সব জমিয়ে রেখে দিলাম।

ততদিনে আমি যথেষ্ট অভিজ্ঞ বনে গেছি। ঐ যে বলে না, ঠেকে মানুষ শেখে। একবার বীজ নষ্ট হল বলেই না আমি প্রকৃত বর্ষাকাল কোনটা জানতে পারলাম। খরার সময় বাদ দিয়ে দুই বর্ষায় আমি এর পর থেকে দুবার করে বীজ বুনতাম। তাতে মোটামুটি প্রচুর ফসল হত।

আরো একটা আবিষ্কার হল। আবিষ্কারই বলব, কেননা আচমকা যে উপপত্তি জন্মে তাকে আবিষ্কার বলতে কোনো বাধা নেই। মাচান ঘিরে সেই যে বসিয়েছিলাম নানাম গাছের ডাল, দেখি তাই কটা থেকে বর্ষার জল পেয়ে বেশ চমৎকার ডালপালা বেরিয়েছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় একটা কুঞ্চ। অঙ্গুত সেই আবিষ্কার। কিন্তু পাতা তো পুরোপুরি তখনো হয় নি। কদিন ধরে দেখে দেখে আমি মোটে হাদিশ করতে পারি না কোনটা কোন গাছ থেকে কাটা, কোনটার নাম কী। শেষে দেবি উইল গাছ। বেশির ভাগই তাই। দু একটা আলাদা। তখন চটপট আরো কটা ডাল কেটে বসিয়ে দিলাম আমার তাঁবুর দেয়াল ছেড়ে বেশ খানিকটা দূরে সার বেঁধে। বছর তিনেকের মধ্যে সে এক রীতিমতো বেড়া। গাছগাছলিতে যেরা অঙ্গুত মনোরম এক পরিবেশ।

ছায়ায় ছায়াও আছে আবার বেড়া বলতে যা বোঝায় অনেকটা তাই। রোদের তাপ বাড়লে এখন আর আগের মতো কষ্ট হয় না।

অভিজ্ঞতার কষ্টপাথরে ফেলে এবার বসলাম খাতা কলম নিয়ে। মাসগুলোকে ঝর্তু মাফিক সাজিয়ে ফেলতে হবে। ইউরোপে যেমন দুটো প্রধান ঝর্তু—শীত আর গ্রীষ্ম, এখানে তো তা নয়। এখানে বর্ষা আর গ্রীষ্ম। জলের সময় আর টানের সময়। তালিকাটা মোটামুটি এই রকম :

ফেরুয়ারির শেষার্ধ  
মার্চ  
এপ্রিলের প্রথমার্ধ } বর্ষাকাল। সূর্যের অবস্থান বিষুবরেখার বরাবর বা  
কাছাকাছি।

এপ্রিলের শেষার্ধ  
মে  
জুন  
জুলাই  
আগস্টের প্রথমার্ধ } গ্রীষ্ম। খরার সময়। সূর্যের অবস্থান বিষুবরেখার  
উত্তরে।

আগস্টের শেষার্ধ  
সেপ্টেম্বর  
অক্টোবরের প্রথমার্ধ } বর্ষাকাল। সূর্যের অবস্থান আবার বিষুবরেখা বরাবর।

অক্টোবরের শেষার্ধ  
নভেম্বর  
ডিসেম্বর  
জানুয়ারি  
ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধ } গ্রীষ্ম। খরা। সূর্যের অবস্থান বিষুবরেখার দক্ষিণে।

বর্ষাকালটা যেমন আমি দেখালাম তালিকায়, হুবহু সেই মতো নয়। কখনো তালিকার চেয়ে আরো বেশি দিন স্থায়ী হয়, কখনো বা স্থায়িত্ব কিছুটা কমে। সব নির্ভর করে বাতাসের উপর। তবে মোটের উপর গড় হিসেব মতো দ্বাপে বর্ষাকাল বলতে বছরের চারটে মাস। আমি আর তখন বাইরে বেরই না। গুহার মধ্যে থাকি, আগে থেকে সংগৃহ করে রাখি আমার খাদ্য সামগ্রী। তাছাড়া বসে বসে করার মতো কাজও কিছু রেখে দিই এই কটা মাসের জন্যে। সময় দেখতে দেখতে কেটে যায়।

যেমন এই এবছর। করার মতো বিস্তর কাজ হাতের গোড়ায় যজুত। শুধু উপকরণের অভাব এটাই যা বড় কথা। ঝুড়ি বানাতে হবে কয়েকটা। তার জন্যে চাই বেত বা বেতের মতো অন্য কোনো গাছ। বানানোর কৌশল আমি ছোটো বেলা থেকেই জানি। বাড়ির কাছে ছিল একটা ঝুড়ি তৈরীর কারখানা। যাতায়াতের পথে দাঙিয়ে দেখতাম তার সৃজন কৌশল। আর বালক বয়েসের যা ধর্ম—নিশ্চিপশ করত নিজের দুহাত, আগ বাড়িয়ে সাহায্য করতাম, এগিয়ে দিতাম এটা ওটা। তাতে জ্ঞান বেশ ভালোই জন্মেছে। কিন্তু ঐ যে অভাব—উপকরণ নেই। সারা দ্বাপে নেই কোনো বেত গাছ। এ অবস্থায় কী করে ঝুড়ি বানাই।

তখন ভাবতে ভাবতে মাথায় একটা ফন্দি খেলে গেল। আচ্ছা, ঐ যে উইল গাছের কচি কচি ডাল—আমার মাচানের পাশে জন্মেছে বা দেয়ালের ধারে,—ফন্দি তাই দিয়েই বানাবার চেষ্টা করি! ইচ্ছে মতো দোমড়ানো যায়, ভাঙে না—আর সব ডালের মতো ঘট করে, শুধু ডালগুলো ছোটো ছোটো আকারের হবে, এটাই যা অসুবিধে। বেশ তো, নয় একবার চেষ্টা করেই দেখি।

তখন কেটে আনলাম একবাশ কচি কচি ডাল। বেতের চেয়ে সামান্য একটু মোটা। তাকে ফালি ফালি করে কষি মতো করলাম। বিস্তর কষি এইভাবে জমা হল। এবার তৈরির পালা। নেমেছে বর্ষা। চেষ্টা করে দেখি—বারে, চমৎকার, ঝুড়ি তো সত্যি সত্যি একটা তৈরি হল! তখন আরো একটা, তারপর আরো, আরো। সুঠাম বুনুনি। সূবিধে হল খুব। ঘাটি বইতে হয়, এটা ওটা রাখার দরকার পড়ে—কোথায় পাব অত বাসনপত্র। পরে ধান আর যবও এই ঝুড়িতে করে রেখে দিতাম।

মিটল একটা সমস্যা। এবার আরেকটি সমস্যার দিকে নজর দিতে হবে। একটি নয়, বলতে ভুল হয়েছে, দুটি। জল জাতীয় কোনো কিছু রাখব—মাত্র কটা বোতল আর একটা কেটলি ছাড়া আমার আর কিছু নেই। অর্থাৎ সর্বপ্রথম জল রাখার একটা পাত্র চাই আর চাই দু একটা বাটি বা ঐ জাতীয় কিছু। বলসানো মাংস খেতে খেতে মুখ একেবারে বিস্বাদ হয়ে গেছে। দু একদিন খোল টোল রেখে খেতে সাধ চায়। নিদেন পক্ষে সেক্ষে বা ঐ রকমই অন্য কিছু। কিন্তু পাত্রের অভাবে পারি না সে ব্যবস্থা করতে। চটপট আমার কিছু পাত্র চাই।

দেখতে দেখতে গ্রীষ্ম। বিস্তর ডাল পালা কেটে লাগিয়ে দিলাম দেয়ালের কিছুটা দূরে সার বেঁধে। আগে যে কটা লাগিয়েছিলাম এ তারই সম্প্রসারণ। বলতে গেলে কটা মাস এই কাজেই কাটল।

তখনো হাতে কিছু সময় আছে। ফের আসবে বর্ষা। এখনো সারা দ্বীপ ঘুরে দেখা আমার শেষ হয় নি। পাহাড়ের একটা দিকই মাত্র ঘুরে এসেছি। আরেক দিক এখনো বাকি। তাই বেরিয়ে পড়লাম।

সঙ্গে বন্দুক, কুঠার, বেশ খানিকটা বাযুদ আর আমার কুকুর। বিস্কুট আর কিসিমিও নিয়েছি অনেকখানি। বলমল করছে রোদ। পশ্চিম নয়। এবার যাব পুবের দিকে। যতদ্ব অনুমান গোটা দ্বীপের পরিধি প্রায় পঞ্চাশ মাইলের মতো।

কোথায় যে দ্বীপের প্রকৃত অবস্থান সেটা আমি এখনো অনুমান করতে পারি নি। কখনো মনে হয় আমেরিকার অংশ বিশেষ। স্পেনের কাছাকাছি। যদি সেটা ঠিক হয়, তবে নিকটের স্থলভাগে যে সব মানুষ বসবাস করে তারা আদিম প্রকৃতির। সভ্যতার ছোয়াচ এখনো লাগে নি তাদের গায়ে। আমার সাজ্জনা এই, তাদের মাঝখানে গিয়ে পড়ি নি। তবে যে কী বিপদে পড়তাম তা আমি কল্পনাও করতে পারি না। সবই ঝীঝরের অনুগ্রহ। এখন সেকথা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি।

যদি স্পেনের উপকূলস্থ কোনো দ্বীপ এটা হয়, তবে জাহাজ আমি অতি অবশ্য দেখতে পাব। স্পেনের সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আছে। কিন্তু জাহাজ যে কখনো পড়ে না নজরে। তবে কি এটা স্পেন এবং ব্রাজিলের ঘণ্যবত্তী কোনো উপকূলস্থ দ্বীপ? সে ক্ষেত্রে বিপদের আশঙ্কা প্রবল। এরকম অন্যান্য দ্বীপে আমি শুনেছি নরবাদক বর্বর মানুষ বসবাস করে। তারা অপরিচিত মানুষ দেখলে কেটে কুটে থায়। নশংসতায় তাদের ঝুড়ি মেলা ভার। আমার সৌভাগ্য আমি সেই জাতীয় কোনো দ্বীপে গিয়ে পড়ি নি।

এই সব চিন্তা করতে করতেই চলেছি এগিয়ে। পশ্চিম থেকে সোজা এবার পুবে। ভারি মনোরম সে অঞ্চল। রাশি রাশি ফুল গাছ। তাতে কী মিটি কী সুন্দর দেখতে ফুল। কত তার রং! আর কাকাতুয়া। সে যেন অগুণতি। আর টিয়া। কথা বলতে পারে কাকাতুয়া। আমার ভারি ইচ্ছে হল একটা ধরে নিয়ে যাই। তাক করে লাঠি ছুড়ে একটা বাঢ়া কাকাতুয়া জখম করলাম। নিয়ে এলাম বাড়িতে। পোষ মেনেছ আমার। তাকে পরে আমি কথা বলা

শিখিয়েছি। তবে এমন কিছু নয়। আমার নাম ধরে ডাকত। হ্যাত শেখাতে পারতাম আরো অনেক কিছু। কিন্তু ঐ যে গোড়ায় সেই বাধা। লাঠি ছুড়ে আমি যে ওকে জখম করেছিলাম। সেটা হ্যাত মনে রেখেছে। তাইতেই গড়ে উঠেছে দুজনের মধ্যে ব্যবধান।

আরো অনেক কিছু দেখতে পেলাম এ যাত্রায়। দেখি পুবের মাঠে হাজারে হাজারে খরগোশ আর অজস্র শিয়াল। সচরাচর যেমন দেখি আমরা সেরকম নয়। মাংসও তেমন একটা সুস্থাদু হবে মনে হয় না। গুলিতে মারা পড়ল অজস্র। মাংসের প্রয়োজনে নয়। এমনি খেয়াল গেল। চালিয়ে দিলাম গুলি। মাংসের প্রয়োজন মেটাবার মতো জীব আমি আবিষ্কার করেছি। ছাগল আর কাছিম। সঙ্গে কিসমিসের মতো মুখরোচক খাদ্য। আর কী চাই।

হাঁটলাম দীর্ঘ পথ। তবে একদিনে নয়। প্রতিদিন দু মাইল হিসেবে একটু একটু করে। আসলে পথ পরিক্রমা আমার উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য প্রতিটি অংশ খুঁটিয়ে দেখা। কী নতুন জিনিস পড়ে দৃষ্টির নিরিখে, তাকে ভালো ভাবে যাচাই করে দেখা। দেখতে দেখতে দিন ফুরিয়ে সঞ্চ্যা নামে। তখন গাছের উপরে উঠে বিশ্রাম করি। নিজেকে বৈধে নিই অংশপঞ্চে। তারপর ঘূর্ম।

হাঁটতে হাঁটতে এলাম একদিন সমুদ্রের ধারে। দেখে তো আমি অবাক। হায় হায়, এমন মনোরম জায়গা থাকতে আমি কিনা বেছে নিয়েছি বন্ধ্যা খটখটে শুকনো একটা পাহাড়ি এলাকা। এত দেখি হাজারে হাজারে কাছিম। কী বড় বড় আর অগণিত পাখি। মুরগি বলব না। তবে অনেকটা ঐ জাতীয়। পেঙ্গুইনও আছে। কী অপূর্ব তাদের বাহার। জানি না মাংসের স্বাদ কীরকম।

নিশ্চিপ করছে হাত। চালিয়ে দেব নাকি গুলি। মরবে ঝাঁকে ঝাঁকে এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। কিন্তু লাভ কি। বরং এর চেয়ে একটা ছাগল মারলে আমার অনেক লাভ। মাংস অচেল, চলে দুচার দিন। দেদার খাও। তবে হাঁ, মারাটাই যা ঝকমারি। কাছে মোটে পারি না ধৈষতে। আসতে দেখলেই অমনি পালিয়ে যায়। তখন ওঠো পাহাড়ের উপর, তাক কর, তারপর টেপো ঘোড়া। তবে না পরিশ্রম সার্থক।

স্বীকার করতে বিধি নেই এদিকটা আমি যে অঞ্চলে থাকি তার চেয়ে অনেক বেশি মনোরম। সুখ স্বাচ্ছন্দ্যও প্রচুর। অর্ধাং সুবিধে যাকে বলে। কিন্তু তথাপি আমি আমার আস্তানা ভেঙে এখানে এসে উঠতে রাজি নই। ওটা যে ঘর আমার। পাকাপাকি ব্যবস্থা। হোক তাঁবু, তাতে কী এসে যায়। তবু তো গোড়া থেকে ওখানেই আছি। মায়া পড়ে যায় না। পারে কেউ মায়া ত্যাগ করে ছেড়ে যেতে? অসম্ভব। আর কেউ পারুক কি না পারুক আমি পারব না। এই নির্জন পরবাসে এই একটা জিনিসই তো আমার নিজস্ব। এই ঘর। আমি এসেছি এখানে, মনে হয় যেন বেড়াতে এসেছি। কদিন পরে আবার ফিরে যাব বাড়িতে। প্রায় মাইল বাব দূর তো বটেই। আর ভালো লাগছে না। এবার ফিরতে হবে। তা এলাম যে এতদূর, একটা খুঁটি নয় কোথাও গেড়ে রেখে যাই। সমুদ্রের পাড়ে। সেটা হবে আমার এতদূর পরিমাণের চিহ্ন বিশেষ। পরের বাব ঘূর পথে আবার আসব এদিকে। চিহ্নটা দেখে বুবাতে পারব এর পরের জায়গাগুলো আমার আগেই ঘোরা হয়ে গেছে।

আর ফেরার ব্যাপারেও ভিন্ন একটা সিদ্ধান্ত করে ফেলেছি। এসেছি যে পথে, সে পথে আর ফিরব না। যাব নাক বরাবর। দেখি কত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে পারি।

খুঁটি পুঁতে আমি তো সেই ভাবেই রণন্ধা হলাম। দুতিন মাইল হাঁটার পর দেখি মন্ত্র একটা উপত্যকা আমার সামনে, এখান থেকে কোন্ পথে যে বেরব সেটা আর ঠিক করতে

পারি না। অর্থাৎ পথ ভুল। এদিকে পাহাড়ে বনও বেশ গভীর। সূর্য দেখে একমাত্র এ অবস্থায় পথ ঠিক করা যায়। কিন্তু আকাশে সকাল থেকেই আজ মেঘলা ভাব। সূর্য ঢাকা পড়েছে মেঘের আড়ালে। ফলে চিনবার রাস্তাও বন্ধ।

দুর্ভোগের সে যেন চরম অবস্থা। তিনিদিন ধরে সমানে মেঘলা। তিন তিনটে দিন আমি সেই উপত্যকায় অঙ্কের মতো পাক খেয়ে ঘুরে বেড়ালাম। শেষে মরিয়ার মতো সামনে যে রাস্তা তাই ধরেই সটান বেড়িয়ে পড়লাম। বেশ খানিকটা পথ গিয়ে দেখি সমুদ্র। খুঁজতে খুঁজতে খুঁটিটা পেলাম। তের হয়েছে বাপু। কাজ নেই আর অভিযানে। এবার ভালোয় ভালোয় যে পথে এসেছি সেই পথেই ফিরে যাই বাড়িতে।

হল তাই। এদিকে গরমও পড়েছে খুব। ভ্যাপসা ভাব। ইঁটতে চলতে ভারি কষ্ট। সঙ্গে আবার আমার বন্দুক বারুদ আর এটা ওটা নানান যন্ত্রপাতির বোঝা। বোঝা বয়ে নিয়ে ইঁটা যেন আরো কষ্টকর।

ফেরার পথে কুকুরটা গিয়ে তেড়ে ধরল একটা ছাগলছানাকে। আমি ইঁই-মাই করে



জল আসতে চায় চোখ ফেটে। কিন্তু আসে না।

জুটে গিয়ে ছাড়িয়ে দিলাম। নইলে নির্ধার্থ জানে মারত। দেখি পায়ে বেশ চোট। কামড়ে ধরেছিল যে ঠ্যাং খানা। তা মন্দ কি। নয় নিয়েই যাই বাড়িতে, পুষ্ট। আমার তো বহুদিনের সাধ এরকম কটা ছাগল টাগল পুষ্টি। তাতে লোকসানের চেয়ে লাভই বরং বেশি। অনটনের দিনে আয় দেবে। মাহসের দৱকসারটাকে তো আর অবহেলা করা যায় না।

তখন গলায় বাধবার মতো একটুকর দড়ি পাকিয়ে নিলাম। আর বেড় দেবার জন্যে একটা ফিতে মতো। সেটাও দড়ির মতো ঘাস পাকিয়ে তৈরি। বাধলাম গলা। টানতে টানতে নিয়ে চললাম। দেখি ইঁটতে আর পারে না। তখন কোলে নিলাম। কিন্তু তাই বা কতক্ষণ সন্তুষ। বোঝার উপর যে শাকের আটি। বাড়িতে পৌছবার আগে পড়ল আমার গৌয়ের বাড়ি, অর্থাৎ সেই মাচান। তার চারপাশে ঘন গাছের বেড়া। তারই মধ্যে দিলাম ছেড়ে। আমি বাড়ির দিকে ইঁটা দিলাম।

ওঁ, ফিরে অঙ্গি সে যা আনন্দ আমার। একেই বোধহয় বলে বাড়ির টান। সটান শুয়ে

পড়লাম বিছানায়। যেন দুহাত বাড়িয়ে নরম উষ্ণ আদর আমাকে বুকে টেনে নিল। প্রায় একমাস শুই নি নরম বিছানায়। বাইরে বাইরে কাটিয়েছি রাত। আজ ঘুমোব নিশ্চিন্তে। কোনো উদ্বেগ থাকবে না আমার ঘনে। দৃষ্টিও ভারি চমৎকার হবে।

এক ইঞ্চি বলতে গেলৈ টানা বিশ্রাম। ঘর থেকে যেন মোটে বোরতেই ইচ্ছে করে না।  
শুয়ে বসে আলসে কেটে যায় সময়, শুধু কাকাতুয়ার জন্যে একটা খাচা বানালাম।  
বানাবার অবিশ্য দরকার নেই, কেননা এ কদিনে রীতিমতো পোষ মেনে গেছে আমার।  
আদুর করে নাম দিয়েছি পোল। এখন না ডাকলেও কাছে চলে আসে, কাঁধের উপর উঠে  
বসে থাকে চুপটি করে। খাচা বানাতে বানাতেই হঠাতে যেন হুশ হল আমার। —তাহত,  
ছাগল ছানাটাকে যে সেই থেকে বেঁধে রেখে এসেছি আমার ঘাচান বাড়িতে, তার খবর তো  
আর নেওয়া হয় নি। অঘনি ছুটলাম পড়ি কি মরি করে। পৌছে দেখি, আহারে বেচারা  
করুণ চোখে জুলজুল করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। নাগালের মধ্যে একটা পাতা কি  
একটু ঘাসও নেই। রোগা হয়ে গেছে খুব। ইস, কী ভীষণ পাপী আমি? না জানি কবে  
থেকে এই হাল! অঘনি চটপট কটা পাতা দিলাম এনে ছিড়ে। ঝাঁচলা ভরে জল এনে  
দিলাম। ধরলাম মুখের কাছে। সো সো করে এক টানে খেয়ে নিল। আর পাতা তো চোখের  
নিমেষে উধাও। এনে দিলাম আরো। মোটমাট এইভাবে খানিকটা সুস্থ করে দড়ি ধরে নিয়ে  
চললাম বাড়ির দিকে। দড়িটা এখন বাহ্যিক। কেননা পোষ ইতোধৃদ্যেই মেনে গেছে। ক্ষুধার  
মুখে খাবার দিলে কে না যানে পোষ! আমাকে টানতে হচ্ছে না, দেখি নিজের থেকেই  
লাফাতে লাফাতে চলছে আমার পিছন পিছন।

এদিকে বর্ষাকাল ততদিনে সমাপ্ত। এটা মরশুমের দ্বিতীয় বর্ষা। ফের সেই ৩০ শে  
সেপ্টেম্বর। আমার এই দ্বিপে অবস্থানের দ্বিবার্ষিকী। অবস্থা একই রকম আছে। আমার  
মুক্তির আশা ক্রমশই মন থেকে উধাও হতে শুরু করেছে। তবু দিনটিকে আগের বারের  
মতোই উদযাপন করলাম। অনাহারে রাইলাম বার ঘণ্টা। ঈশ্বরকে প্রার্থনা জানালাম বারে  
বারে।—ঈশ্বর, আমাকে ক্ষমা কর। আমি মুক্তি আর চাই না। এখানেই থাকতে চাই।  
জানি না মানুষের যাবৎখানে গেলে আমি আর এই দুর্ভিত সূখ পাব কি না। আর সত্তি  
সত্তি কৌসেরই বা দরকার আমার মুক্তির। এই তো আছি বেশ। এই একাকীভু একটু একটু  
করে আমার সহ্য হয়ে গেছে। অভাব বোধটাও এখন আর নেই। কৌসের অভাবই বা  
এখানে, আছে তো সব কিছুই। অচেল ধাংস, অচেল কাছিমের ডিম, পাখি, পায়রা,  
মুরগি, বিড়াল, শেঁয়াল আরো কত কী। গাছে আছে থোকা থোকা আঙুর আর বাতাপি  
আর মৌসুমি আরো কত নাম না জানা ফল। আছে তামাক; আরো কতরকম উল্লিঙ্গ।  
সর্বশেষ যে অভাব তা-ও ঈশ্বরের অনুগ্রহে পূর্ণ হয়েছে। আমি নিজেই এখন খাদ্যশস্যের  
চাষ করতে সক্ষম। সৃতরাখ কেন তবে আর ফিরে যাবার জন্যে আকুলতা!

এ এক অপার অনস্ত শাস্তির রাজস্ব। তুলনা করি মাঝে মাঝে আমার পুরানো দিনের সাথে। দুইয়ের মধ্যে ফারাক যেখানে সেখানে, যতখানি বা যত বিশাল, সব হিসেব করে দেখি। ও জীবনে আর আমার কোনো মোহ নেই। থাকবেই বা কেন, কী আছে আমার দেশে যে মোহ থাকবে? আমার জীবনের উদ্দেশ্যটাই এখন সম্পূর্ণ পালটে গেছে। আমি আর আগের মতো ভাবতে পারি না। পারি না আগের মতো নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামাতে তার যে কোনো মূল্য নেই এই নির্জনতার মধ্যে। নেই কোনো প্রয়োজন। তবে কেন আর সভ্য দুনিয়ার জন্যে আকৃলি বিকলি!

ତୁ ପାରି ନା ନିଜେକେ ଘାଁଥେ ଘାଁଥେ ବାଗ ମାନିଯେ ରାଖିତେ । ଛଟଫଟ କରେ ଓଠେ ମନ । ହୃଦୟ

বেরিয়েছি রোজকার নিয়মমতো বন্দুক কাঁধে, হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মতো দুখড়ে শুচড়ে গুমড়িয়ে উঠল মনের ভিতরটা। যেন অদ্য অব্যক্ত যন্ত্রণা এক। আমি যে কন্দী, এ তারই যন্ত্রণা। এই বন্দীদশা আমার আর ঘৃতবার নয়। কেউ পরায় নি হাতে শৃঙ্খল, পায়ে দেয় নি বেড়ি, বা কোনো কারাগারে আটকও করে নি, তবু এ যেন দুনিয়ার সব কারাগারের বাড়া। চারপাশে ঐ অসীম অনন্ত জলরাশি যেন কারাগারের দুলভ্য এক পাঁচিল। পারব না কিছুতে হাজার চেষ্টা করেও ঐ পাঁচিল ডিঙেতে। এই নির্জনতার মধ্যে থাকতে থাকতেই একদিন আমার আয়ু ফুরিয়ে আসবে। জানতে পারবে না কেউ আমার কথা। এ ভারি দুঃখের চিন্তা। তখন কান্না পায়। বুক ফাটিয়ে গলা ছেড়ে কাঁদতে মন চায়। কিন্তু পারি না কাঁদতে। কেন্দে লাভই বা কী। কে শুনবে আমার কান্না? কে করবে এর প্রতিকার? তখন গুটিগুটি নিজের বাড়িতে ফিরে আসি। ছুড়ে ফেলে দিই বন্দুক। বসে থাকি ঘাসের দিকে তাকিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা। জল আসতে চায় চোখ ফেটে, কিন্তু আসে না। তবু আসত যদি আমি খানিকটা শাস্তি পেতাম। আমার দুঃখের বোৰা অনেকটা লাঘব হত। হবে না তা। আমি নিশ্চিত ভাবে জানি।

এটা আগের ভাবনা। এই আমি যা বললাম এতক্ষণ। এখন আমার মনের পরিবর্তন হয়েছে। এখন বাইবেল পড়ি আমি নিয়ম করে। বাইবেলের নিদেশের মধ্যে খুঁজি আমার মনের সাম্মানার কথা। সব আছে সেখানে আমি জানি। প্রতি ছত্রে নানান উপদেশ। নিজেকে মিলিয়ে নিয়ে সেই উপদেশের বিচার করি। এখন মোটামুটি আমি নিশ্চিন্ত।

এই যেমন সেদিন। মন ভীষণ খারাপ। বসেছি বাইবেল নিয়ে। দেখি চোখ আটকে গেল একটা কথার উপর,—আমি কোনোদিন তোমাকে ত্যাগ করব না, কোনোদিন না, কেউ পারবে না তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে। ..... অবাক কাণ্ড, একি আমাকে উদ্দেশ করে লেখা! আমি ভাবতে শুরু করলাম। প্রতিটি শব্দের সঙ্গে আমার দেখি অন্তু মিল। সারা দুনিয়া যখন দিয়েছে আমাকে নির্বাসন, প্রভু বলেছেন, তিনি আমার সঙ্গে আছেন। কোনোদিন ত্যাগ করবেন না আমাকে! তার মানে কি তাহলে এই, যদি এই নির্জনতা ত্যাগ করে আমি আবার সভ্য জগতে ফিরে যাই, অন্তত যাবার মতো কোনো উপায় বের করি—তখন কি তিনি আমাকে দূরে সরিয়ে দেবেন?

হয়ত তাই। সেক্ষেত্রে আমার সভ্য জগতের মায়া অতএব ত্যাগ করতে হচ্ছে। চাই না আমার ঐ সভ্যতা। আমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ চাই। চাই তার করুণার ডালি। আমি ভালবাসা চাই। ঈশ্বরের প্রেম। তার জন্যে এই নির্জনতা আমার পরম প্রিয়। সভ্য জগতের কোলাহল এখন আমার কাছে বীতিমতো দুঃসহ।

ভাবি এখন, পর মুহূর্তেই একরাশ প্রশ্ন এসে আমার মনে ভিড় জমায়। সত্যিই কি সভ্য জগতে আর আমি ফিরে যেতে চাই না? সত্যিই কি তার প্রতি আর আমার কোনো মোহ নেই? নাকি আত্মপ্রবঞ্চনা এসব; নিজেরই সঙ্গে কারচুপি? বেকায়দায় পড়েছি বলেই কি এই নতুন পরিবেশকে আমি ঘেনে নিতে বাধ্য হয়েছি? যদি না পড়তাম এমন অবস্থায়, তবে কি ঈশ্বরকে এমনভাবে ডাকতাম? প্রার্থনা করতাম তাঁর কাছে আমাকে এই অবস্থা থেকে সরিয়ে না নিয়ে যাবার জন্যে?

তখন আবার নতুন করে ভাবতে বসি। ঈশ্বরকে আর ধন্যবাদ জানাতে ইচ্ছে হয় না। শুধু বলতে মন চায়, প্রভু এই অবস্থায় তুমি আমাকে ফেলছ, তাই আমার ভালোমন্দ বিচারের বুদ্ধি জ্ঞান্বত হয়েছে। এক্ষেত্রে নিজেকে খতিয়ে দেখবার ক্ষমতা। বরং সব কৃতিত্ব তোমার। আমি তোমার অনুগ্রহ লাভে ধন্য। চির কৃতার্থ আমি।

ধীপে এই ভাবেই দুটি বছর আমার কেটে যায়। শুরু হয় ত্তীষ্ণ বছর। মনের আনাচে কানাচে নতুন নতুন প্রশ্ন জাগে। কিন্তু প্রশ্ন কখনো থমকে রাখে না আমায়। অলসের মতো পারে না বসিয়ে রাখতে। কাজ করি নিয়মিত। দৈনন্দিন প্রতিটি কাজ। এখন তো আর আগের মতো নয়, সময় এখন ভাগ করে নিয়েছি প্রতিটি কাজের জন্যে। যেমন সকালে উঠে প্রথম কাজ আমার ইম্বরের আরাধনা, তারপর বাইবেল পাঠ। মোট তিনবার পড়ি দিনে বাইবেল। ঘুমের প্রাক মুহূর্তে একবার, আর একবার দুপুরে। সকালে আরেকটি প্রধান কাজ বন্দুক সহ খাদ্যের অব্দেশণে বেড়িয়ে পড়া। এতে ঘন্টা তিনেকের মতো সময় যায়। তারপর রঞ্জনাদি পর্ব। শিকারের ছাল ছাড়ানো থেকে শুরু করে তার মাংস কাটা, তাকে রান্নার উপযোগী করে তোলা। এতেও সময় যথেষ্ট ব্যয়িত হয়। দেখতে দেখতে বেলা দুপুর। তখন খাই পেট ভরে। সূর্য ওঠে মাথার উপর। তখন তো আর বাইরে বেরনো সম্ভব নয়। একটু বিশ্রাম নিই তখন বিছানায় শুয়ে। তারপর উঠি আবার। শুরু হয় বৈকালিক কাজ। তার জন্যে সময় পাই চার ঘন্টার মতো। সেটাই যথেষ্ট। বৃষ্টি হলে বা প্রচণ্ড গরম পড়লে দৈনন্দিন কার্য তালিকায় যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটে। তখন সকালের বদলে কোনো কোনো দিন বিকেলে বেড়িয়ে পড়ি খাদ্য অব্দেশণে।

বিকেলের ওই চার চারটে ঘন্টা কাজ করার যে কত জ্বালা! করতে চাই অনেক কিছু, সম্ভব আর হয়ে ওঠে না। একদিনের কাজে লাগে পাঁচ দিন। করব কী। আমি যে এক অর্থে অসহায়। না আছে কাজের কোনো উপযুক্ত হাতিয়ার, না তার উপযুক্ত পরিবেশ। সাহায্য পাব যে কারুর কাছ থেকে, এমন আশাও নেই। শুধু নিজের দুখানা হাত সম্বল। এই তো দেখুন না, বানাব তাকের জন্যে চওড়া একফালি কাঠের তঙ্গা, সময় লাগল তাতে মোট দশ দিন। শেষ যেন আর হতে চায় না। কিছুতে হয় না মনের মতোন। অথচ কী-ই বা এমন কাজ। করাতির হাতে পড়লে লাগত বড় জোর দেড় থেকে দু ঘন্টা।

এবার তঙ্গা বানাতে কী কী করতে হল আমাকে শুনবেন? প্রথমে তো বেশ চওড়া দেখে একটা গাছ বাছলাম। চওড়া এই কারণে কেননা আমার তঙ্গটা করতে হবে বেশ চওড়া মাপের। গুঁড়িটা কেটে ফেললাম। বলতে যত সংক্ষেপ কাজের বেলা মোটেই নয়। লাগল সর্বমোট তিনটে দিন। পড়ল অতঃপর সেটা ঘড়মড়িয়ে মাটিতে। তখন ডালপালা ছাঁটতে হল। তাও কম পক্ষে তিন চার দিনের কাজ। এবার হল্কা হল খানিকটা। অর্থাৎ ঠেলে একধার থেকে আরেক ধারে নেওয়া যেতে পারে। নিয়ে গেলাম সরিয়ে। তারপর উপরের দিকটা চাঁচলাম। মোটামুটি মসৃণ হল সেই ধার। তখন দিলাম ফের উলটে। সে ধার গেল নিচে, উঠে এল উপরে আরেক ধার। এবার চাঁচলাম সেই দিক। তাতে ঝড়তি পড়তি সব বাদ দিয়ে হল তিন ইঞ্চি চওড়া একখানা তঙ্গ। সব মিলিয়ে মোট বেয়াল্পিশ দিন।

তবে একটা কথা। এই যে করি নানান কাজ, এতে একই সাথে আমার ধৈর্য আর কাজের নিপুণতার প্রমাণ মেলে। ধৈর্যটা এক্ষেত্রে প্রধান প্রশ্ন। সময় সাশ্রয়ের তো কোনো ব্যাপার নেই। হাতে আমার অভিল সময়। অমনি নৈপুণ্যের দিকেও নজর পড়ে। দেখি না, কতটা নিপুণ করতে পারি কাজ! হয়ও মোটামুটি। এটা অবিশ্য ধীরে ধীরে আয়ত্ত হচ্ছে। তাড়াতাড়ি হবে যে, সে আশা আমি করি না। ঢাল নেই তরোয়াল নেই। আমি যে এক অস্তুত নিধিরাম সর্দার।

আসলে প্রয়োজনটা সেক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ব্যাপার। প্রয়োজন আমাকে সব শিক্ষা দিচ্ছে। আমার নিজের দরকার মতো আমি সব তৈরি করে নিছি। বা বাধ্য হচ্ছি তৈরি করে নিতে। এর জন্যে যতটা ধৈর্য যতটা নৈপুণ্যের প্রয়োজন, তা আমাকে আয়ত্ত করতেই

হবে।

এবার ফলনও খুব ভালো পেয়েছি। এটা নভেম্বর মাস। ডিসেম্বরে আমি শস্য ঘরে তুলতে পারব। যব হয়েছে। অচুর ধানও। জমিতে সার দিয়ে মোটামুটি চাষ যোগ্য করে তুলেছি। তা এবার সব মিলিয়ে আধ বস্তা তো হবেই। আরো হত যদি না সেবারের অতগুলো বীজ আমার নিজেরই ভুলে নষ্ট না হত। কিন্তু নতুন এক সমস্যা দেখা দিয়েছে এবার। চারা বাঁচিয়ে রাখাই দেখি এক সমস্য। শত্রুর অস্ত নেই। একাধারে ছাগল এবং খরগোশ। কচি পাতার কী যে মধুর স্বাদ তারা পেয়েছে। ঘুর ঘুর করে সারাদিন ক্ষেত্রের ধারে। যেই না পাতা বেরয় অমনি কুটকুট করে খেয়ে নেয়। ফলে চারা থেকে আর শস্য বেরবার সুযোগ হয় না।

মহা সমস্য। করি কী এখন! ভাবতে ভাবতে চারধারে বেড়া তুললাম। তাতে খাটনি গেল খুব। কাজও করতে হল খুব দ্রুতগতিতে। কেননা যত সময় যাবে, ততই আমার লোকসান। তা-ও লাগল ঘোট তিন হপ্তা। বেড়া তৈরি হল। ছোটো জমি বলে রক্ষে। বড়



যেন ধোঁয়ার এক মন্ত কুণ্ডলী

হলে না জানি আরো কত দেরি হত। ইতোমধ্যে বন্দুক ছুটিয়ে কটা খরগোশ মেরে ফেললাম। কুকুরটাকে ছেড়ে রাখতাম রাত্রে পাহারা দেবার জন্যে। সে কী যেউ যেউ সারারাত জুড়ে! সাধ্য কি সেই ডাক আগ্রাহ্য করে কোনো জীব ত্রিসীমানায় দ্বিষ্ঠে। ফলন বেশ ভালোই হল। তোলার সময় হয়ে এল প্রায়।

তখন এক নতুন উৎপাত। এবার পাখি। পাখি বলব, না বনম্মেরগ? সে যে কত এল উড়ে তা আর বলবার নয়। পাকা ফসলের গন্ধ যেন টানতে টানতে নিয়ে এল সকলকে চারধার ঝেঁটিয়ে। আর এমনই তাদের গায়ের রং— মিশে থাকে গাছ-গাছালির আড়ালে, আমি বুঁুতেও পারি না। হ্যত দেখলাম, একটা ধান খাচ্ছে। অমনি হাই হাই করে বন্দুক নিয়ে ঝাপিয়ে পড়লাম। ওমা, দেখি এ যে অসংখ্য। চারপাশ থেকে ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে শুধু উড়ে পালাতে থাকে। উপরে উঠে মিলে মিশে যেন ধোঁয়ার এক মন্ত কুণ্ডলী। বা ঘোলাটে এক টুকর মেঘ। উড়ে গেল সাময়িক ভাবে, কিন্তু আমি জানি, ফাঁক পেলেই ফের এসে

বসবে। কিন্তু কীভাবে তো আর আমার এত দিনের সব পরিশ্রম নষ্ট হতে দেওয়া যায় না। তাহলে যে আমার খাদ্য বলতে কিছুই আর থাকবে না। তাছাড়া যদি সব ফসল ওরাই থায়, তবে আগামী দিনে আমি চাষ করব কী দিয়ে। মোটমাট বাঁচাতে হবে। কিন্তু কীভাবে বাঁচাব? কী যে করব আমি মোটে দিশা পাই না। এখনো যেগুলো পাকে নি, তা কিছু কম নয়, সেগুলো ওরা থায় নি। জমাতে পারলে আগামী মরশুমে ভালো আয় দেবে। কিন্তু কীভাবে জমাই?

কিছু ঠিক করতে না পেরে ঘর থেকে বন্দুকটা নিয়ে এলাম। ভিতরে ভিতরে সত্য তখন আমার খুব রাগ। এসে দেখি যে কে সেই। এক মুহূর্ত আমি চোখের আড়াল হতে ফের এসে বসেছে গাছের মাথায়। পুরো একটা দঙ্গল। আসছে আরো সমানে। চারধারে শুধু ডানার ঝটপটানির শব্দ। আর ধৈর্য ধরতে পারলাম না। এক একটা দানা খাবে ওরা, আর আমার মনে হবে দানা নয়, যেন আমার বুকের একেকটা পাঁজর। তখন বন্দুক চালিয়ে দিলাম। মারা পড়ল একসাথে তিনটে। বাকিরা উড়ে পালাল। তখন সেই তিনটেকে তুলে এনে টাঙিয়ে দিলাম খুঁটির গায়ে গায়ে দড়ি বেঁধে। এটা ইংল্যান্ডে ঘানুষের মনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার একটি বিশিষ্টতম পদ্ধতি। একজনকে শাস্তি দিয়ে বাকি দশজনকে দেখায়। তাদের মনে ভয় সঞ্চার করে। আমারও উদ্দেশ্য তাই। তাতে ফলও হাতে নাতে পেলাম। খেতে তো আর এলই না একটাও মুরগি, উপরস্তু সারা এলাকা ছেড়ে রাতারাতি সবাই যেন পিঠটান দিয়ে বাঁচল।

এতক্ষণে আমি নিশ্চিন্ত। আর আমার ভয়ের কোনো কারণ নেই। খরগোশ তাড়িয়েছি, তারপর ছাগল, সবশেষে মুরগি। ফসল পাকল নিরাপদে। সেটা ডিসেম্বর। বলতে গেলে আমার এই দ্বিপে দু নম্বর ফসল চাষ। আরো কয়েকটা দিন দেখে আমি ধান যব কেটে ঘরে তুললাম।

হায়রে, কাটতে সে যা কষ্ট! কাস্টে তো নেই। কাস্টে ছাড়া কি আর ফসল কাটা সম্ভব। শেষে তলোয়ার এনেছিলাম একখানা জাহাজ থেকে, তাই দিয়েই কাস্টের কাজ সারলাম। আগের বার এ অসুবিধে বোধ করি নি কেননা তখন ফসল ছিল কম। এবার যে অনেকখানি। কেটে আনলাম শুধু শস্যের গোছাগুলো। গাছ দাঁড়িয়ে রইল মাটিতে, যেমনটি তেমন। মস্ত একটা খুড়ি বুনেছিলাম, সেটা একেবারে বোঝাই। তারপর ধান আর যব আলাদা করলাম। মাপবার তো কোনো সরঞ্জাম নেই। আন্দাজে বুবলাম প্রায় দশ সের মতো যব আর দশ সের মতো ধান পেয়েছি। মোটমাট আগামী মরশুমে ফসল বুনতে আমার আর কোনো চিন্তা নেই।

আজ্ঞাদে যাকে বলে আমি একেবারে আটখানা। আর সৈক্ষণ্যকে জানলাম যে কত ধন্যবাদ!—আপনি কৃতার্থ করেছেন আমাকে। ঠিক সময় মতো আমার ভাঁড়ারে যখন টান পড়েছে, জুটিয়ে দিয়েছেন খাদ্যশস্য। আপনার দয়ার তুলনা নেই।

কিন্তু তা নয় ঠিক, এবার যে ধান যব ভাঙ্গার ব্যবস্থা করতে হয়। কী করে ভাঙ্গাব বা কেমন করে এ সব দিয়ে খাদ্য বানানো হয় কিছুই যে জানি না। নয় ভাঙ্গলাম যেন তেন প্রকারে, কিন্তু বুটি গড়ব কীভাবে? কিংবা হয়ত গড়লাম বুটি, তাকে ভাঙ্গব কেমন করে? আগামী মরশুমের জন্যেই বা কতটা রাখব? এই সব নানান সমস্যা। তখন ভাবলাম, থাক, এক কাজ করি, একটি দানাও খরচ করে লাভ নেই। রেখে দিই বরং আগামী মরশুমের জন্যে। বীজ হবে। তা থেকে আরো বিস্তর ফলন হোক। ততদিনে মাথা খাটিয়ে কেমন করে বুটি গড়তে হয় বা কেমন করে তাকে সেঁকতে হয়, আমি একটু বিচার

বিবেচনা করে দেবি।

পাঠক হয়ত অবাক হচ্ছেন আমার অবস্থা দেখে। ভাবছেন বুটি গড়—এ আর এমন কী সমস্যা? আমিও জানি, সমস্যা আদৌ/নয়। কিন্তু আমার বিশেষ পরিস্থিতিতে সমস্যা তো বটেই। কোনো যে উপকরণ নেই। না চাকি বেলুন, না তাওয়া, না আর কিছু। সে অবস্থায় আমাকে যে নতুন কোনো উপায় বাণ্ডাতে হবে, এছাড়া দ্বিতীয় আর রাস্তা কোথায়!

কিন্তু ভেবে ভেবে যে কোনো কূল আর পাই না। ভাবছি তো প্রথমবার শস্য পাওয়া থেকে সমানে। কোনো যে সুরাহা হয় না। খানিকদূর এগিয়ে বাতিল করতে বাধ্য হই। এবারও কি তাই হবে?

নেই একটা খস্তা কি খুরপী যা দিয়ে মাটি খুড়তে পারি। নেহাঁ প্রয়োজনের তাগিদে কাঠ দিয়ে খস্তা মতো একটা বানিয়ে নিয়েছি। কিন্তু তার কাজ আর লোহার খস্তার কাজ! —আকাশ পাতাল ফারাক। কাঠের যন্ত্র দিয়ে কাঠের মতোই কাজ পাই। মাটির গভীর অন্দি তা আর পৌঁছতে পারে না। আর সময়ও লাগে বিস্তর। উপকরণ ঠিক ঠিক মতো পেলে আমার কি আর এত সময় নষ্ট হত!

তবু ঐ যে বলে ধৈর্য,—আমি যার দীক্ষা নিয়েছি, বলা চলে, একটু একটু করে ধৈর্যশীল হতে পেরেছি, তাই আমাকে বাঁচিয়ে রাখে। কাজে তাই আমার কোনো ক্লান্তি নেই। নিপুণ করে তুলতে চাই প্রতিটি কাজ কিন্তু উপকরণ যে নেই। এই তো জমিটা যখন তৈরি করলাম। কোপানো টোপানো শেষ, এবার যে মই দিতে হবে। কিন্তু কোথায় পাব মই। বাঁশই বা এখানে কোথায়। তখন মন্ত একটা গাছের গুঁড়ি এনে তাই গড়িয়ে নিয়ে গেলাম এমাথা থেকে শুমাথা অন্দি কয়েকবার। তাতে কাজ হল ঠিকই, কিন্তু নিপুণ হল না। না হোক, আমার তো কিছু করার নেই।

যখন ফলল ফসল, তখনো কত কি জিনিস আমার দরকার। যেমন ধূমুন বেড়া দিতে হবে চারধারে, ফসল রক্ষা করতে হবে, কাস্তে লাগবে ফসল কাটার সময়, তাকে ঝাড়তে হবে, মাড়াই করতে হবে, তারপর তুলে রাখব গোলায়। কী আছে আমার যে এত কাজ নিপুণ ভাবে করতে পারব! তার পরেও তো আরো অনেক কিছু দরকার। যেমন যব পেষাই করার জন্যে যাতা, তাকে চালবার জন্যে চালুনি, বুটি তৈরির জন্যে প্রয়োজনীয় মশলা আর নূন, তাকে সেঁকবার জন্যে তাওয়া—কে দেবে এনে আমার হাতের কাছে! পাব কোথায়! এসব ছাড়াই তাই চেষ্টা করতে হল। তাতে যা এল তাই লাভ। নিপুণ না হোক, তাতে ক্ষতি কী! মোটমাট ফসল যে পেয়েছি বিস্তর এতেই আমি খুশি। জমিয়ে রাখব বেশির ভাগ, খাব যৎসামান্য, জীবন যাপনের মূল একটা চিন্তা থেকে তো অব্যাহতি পেতে পেরেছি। এটাই লাভ। নয় সময় কিছু ব্যয়ই হল। নয় মনমতো ফল পাওয়া গেল না। আমার তাতে ঘেঁচু। আরো সময় লাগিয়ে আগামী মরশুমের মধ্যে দরকারী কিছু কিছু বাসন কোসন আমাকে বানাতে হবে। আরো হাবিজ্বাবি এটা ওটা। সংসার যখন ফেঁদে বসেছি তখন তো আর কিছু বাদ গেলে চলবে না।

তবে ইঁয়া, বাসন কোসন তৈরির আগে যেটা দরকার, তা হল চাষযোগ্য অঢেল জমি। এবার তো আগের মতো ট্রাক্যু জায়গায় চাষ করলে চলবে না। এবার বীজ বেশি, সুতরাঁ জায়গাও চাই বেশি। প্রায় এক একব মতো জমি আমার দরকার। আমি হিসেব করে দেখেছি। আর দরকার একটা কোদাল। এত বড় জমিতে কোদাল ছাড়া এবার আর চাষ সম্ভব নয়। তো কোদালটাই আগে বানাই।

লেগে গেলাম কাজে। প্রায় সাত দিন টানা পরিশুম। তৈরি যা হল সেটা কোদাল ঠিক নয়, তবে কোদালেরই মতো। বাঁটটা ভীষণ ভারী। তুলতে রীতিমতো কষ্ট হয়। তবু সাজ্জনা, কিছু তো একটা পাওয়া গেছে। এই দিয়েই আপাতত শুরু করা যাক কাজ।

জমি বাছাই হয়ে গেছে। গুহার গা ঘেঁষেই ঢালা একটা মাঠ। সাফ সূতরো করে আগাছা ছেঁটে ফেলার পর রীতিমতো জমি বলেই যেন মনে হচ্ছে। তখন সেই ভারী কোদাল দিয়ে মাটি কোপাতে শুরু করলাম। শেষও হল।

তখন বেড়া দিলাম চারধারে। খোপের মতো ছোটো একধরনের গাছ। এনে বসিয়ে দিলাম গা ঘেঁষাধৈরি করে চারধারের লাইন বরাবর। তোফা ব্যবস্থা। মোট লাগল তিন মাস। অবিশ্য এতটা লাগার কথা নয়। কিন্তু বর্ষা যে নেমে গেছে। গায়ে জল লাগানো যে আমার বারণ। হিসেব করে এখন তাই পা ফেলতে হয়।

তা বৃষ্টির দিনে আমি যখন গুহায় কি তাঁবুতে থাকি, ভাববেন না, চুপচাপ হাত পা গুটিয়ে আমি বসে আছি। বসে থাকা যে আমার অভ্যসের বাইরে। তাছাড়া নতুন কাজ তখন— পোলকে ভাষা শেখাতে হবে। পোল আমার কাকাতুয়ার নাম। পাখিকে দিয়ে কথা বলতে সে যা অসীম ধৈর্য আমার। প্রথমে নামটা দিনরাত মন্ত্র জপবার মতো কানের কাছে পড়ে পড়ে চিনিয়ে দিলাম। তারপর তাকে উচ্চরণ শেখাবার পালা। শুমা, দেখি কদিনের মধ্যে শিখে গেছে! প্রায়ই আর্তকষ্টে চেঁচিয়ে ওঠে—পোল, পো-ল! আর বুকটা আমার টিপ টিপ করতে থাকে উত্তেজনায়। দীর্ঘ তিনবছরের মধ্যে এই প্রথম শুনলাম আমি মানুষের মতো উচ্চারণ, আমি ছাড়া দ্বিতীয় একজনের ভাষা। হোক সে পাখি, কী আসে যায়। আমার নিঃসঙ্গতা তো ঘোচন হল! সঙ্গী পেলাম আরেক জন। কাজ যখন করব একাকী বসে, ও আমাকে শোনাবে মুখের ভাষা। এই না আমার কাছে অনেক! ইত্যবসরে বাসন কোসন বানাবার কাজ শুরু করে দিয়েছি। সে কি কম ঝকঝারি! মাটি দিয়ে চেপে চুপে বানাই হয়ত একটা কিছু—হয় কলসী, নয় থালা, বা গ্লাস—দেখতে দেখতে চোখের সামনে ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ে। কিছুতে আর আকৃতিতে আসতে চায় না। সে এক বিরক্তিকর অবস্থা যাকে বলে। এবৎ এরকম বেশ কয়েকবার হ্বার পরে এই জ্ঞান আমার হয়েছে যে এই মাটিতে কাজ হবে না। চাই আঁঠাল ধরনের মাটি। তাতে জল রাখলে জল গলে বেরিয়ে যেতে পারবে না। অর্থাৎ এককথায় তার ধারণ ক্ষমতা অনেক বেশি।

তা খুঁজে পেতে নিয়ে এলাম অবশ্যে সেই রকম মাটি। পাওয়া গেল। বানালাম তা দিয়ে অনেক কিছু। রোদে দিলাম। ফেটে ফুটে তো যাচ্ছেতাই অবস্থা তাদের। আর সে যা তৈরির নিপুণতা আমার! দেখতে প্রতিটা জিনিস এমনই কিন্তুকিমাকার যে গোমডামুখো লোক অল্প এক নজর তাকালে হেসে ফেলবে। হাসুক। আমার তো কাজ চলা নিয়ে কথা। এই তো দুটো বানিয়েছি কলসীমতো। অর্থাৎ কলসীই বানাব বলে ভেবেছিলাম, এখন দেখি হয়েছে কিমাকার একটা জিনিস। কী নাম দেব এর ভেবে পাই না। তবু যাহোক, যদি না ফাটত, আমার জল রাখার কাজ তো ঠিকই চলত।

তখন মাটি দিয়ে ফের ফাটা জ্যায়ায় জোড়া লাগিয়ে শুকিয়ে নিলাম। এবার আর ফাটল না। শুকিয়ে একেবারে খটখটে। তখন কলসী দুটো তুলে খুব আলগোছে বসিয়ে দিলাম দুটো ঝুঁড়ির মধ্যে। মাপ মিলিয়ে তৈরি কিনা। সেগুলোতে শস্য ভর্তি করে রাখলাম। বেশ চমৎকার ব্যবস্থা হয়েছে বলা যায়। শুকনো থাকবে এতে ধান আগাগোড়া। আগামী মরশুমে পোকা লাগবে না বা কোনো ক্ষতি হবে না।

হাতটাও ইতোমধ্যে একটু পেকেছে। কাজ করতে করতে যে জ্ঞান আর কি মানুষের

জন্মায়। পটাপট আরো কয়েকটা বাসন বানিয়ে ফেললাম। দিলাম রোদে। এদিকে হয়েছে কি—একদিন ভেঙে গেছে বাসনের টুকরো, আমি তো সেটা তুলে ফেলে দিয়েছি আগুনে। দেখি কদিন পরে পুড়ে একেবারে টকটকে লাল। তখন বুদ্ধিটা হঠাতে করেই মাথায় এল। —আচ্ছা আমি যদি এইভাবে আমার সবকটা বাসন পুড়িয়ে নিই! অমনি দিলাম এনে সব উনুনে। বেশ খোলামেলা উনুন তো, বেশ বড়সড়, আর নিভবার কোনো ব্যাপার নেই। আগুন কিছুতে নিভতে দিই না। জলুক না ঘতদিন খুশি। তা তাতেই পুড়ে চমৎকার হল থালা বাসন। মায় রান্না করার একটা ডেক্টী অব্দি। মুখে বলছি ডেক্টী, আসলে সঠিক করে সেটাকে কী বলা যায় আমি জানি না। থালা পেলাম অনেক কটা। আর কটা বাটি। আমার তো আঙ্কাদ আর ধরে না! এক টিলে কত পাখি যে একসাথে মারলাম! থালা বাসন তো হলই মাঝখান থেকে কাজটা আমি পাকাপোক্ত ভাবে শিখে নিলাম। এবার থেকে দরকার পড়লে এভাবেই যতখুশি বানিয়ে নেব।

আর শুরু হয়েছে তারপর থেকে দারুণ দারুণ সব রান্না। খোল বানাই, খাল বানাই, মাংস নিয়ে সে তো বলতে গেলে একের পর এক চলছে আমার পরীক্ষা নিরীক্ষা। তবে ঐ যে একটা কথা। থেতে পেলে মানুষ চায় একটু আরাম করতে। আমারও মন কেবল হাঁকু পাঁকু করে একটু মশলার জন্যে। আহা, দুটো একটা রকমও যদি পেতাম! তাহলে দেখিয়ে দিতাম মাংস রান্না কাকে বলে।

সব তো মোটামুটি হল, এবার একটা ভালো যাতা। যব ভাঙবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কিন্তু কীভাবে তা সন্তুষ্ট? আর যাই পারি না কেন—সে ছুতর হোক, কুমোর হোক—পাথর কাটার কাজ যে কখনো শিখি নি। ভাবতে কি পেরেছি ছাই আমাকে এ অবস্থার মুখোমুখি কোনোদিন হতে হবে। তবে নয় আগে ভাগে এটাও শিখে রেখে দিতাম। কিন্তু এ যে দেখি নিরূপায় অবস্থা। পাথর আছে বিস্তর কিন্তু সবই পাহাড়ের শক্ত মজবুত পাথর। মস্ত বড় বড় খণ্ড থেকে শুরু করে বিশাল বিশাল পাথরের চাই। কেমন করে ঐ থেকে আমি আমার প্রয়োজন মাফিক কেটে নেব। যন্ত্র কোথায় আমার! কাজের প্রয়োজনীয় উপকরণ! খুঁজতে খুঁজতে দেখেছি এই পাহাড়েই আরেক অংশে অন্য এক জাতীয় পাথর আছে তা বজ্জ নৱম। একটু ঘা দিলে, ঝুরঝুর করে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে করে পড়ে। তাতে কি আর যাতা তৈরি হয়। চাপ যে মোটে সহজ করতে পারবে না। তাহলে উপায়!

শেষ অব্দি অনেক ভেবে চিন্তে পাথরের ব্যাপারটা বাদ দিয়ে ফের কাঠের দিকে নজর ঘোরালাম। এটা এখন মনে হচ্ছে তুলনায় যথেষ্ট সোজা। চ্যাটাল একটা অংশ গুড়ি থেকে তৈরি করে নেব, তাতে গর্ত থাকবে ভিতরে বেশ খানিকটা, আর একটা কাঠের কুঁদো দিয়ে পেটাই করব। বা সামান্য জ্বের লাগিয়ে নাড়াচাড়া করব। তাতে সব আটায় পরিণত হবে আর ধান থেকে হবে চাল। অমনি বসে গেলাম কুড়ুল টুড়ুল নিয়ে। খাটুনি হল খুব। আগুনে পুড়িয়ে পুড়িয়ে গুড়ির মাঝখানটা বেশ খানিকটা গর্তও করলাম। বানালাম কাঠের একটা হামন। ভাঙা বা ফাটার তো আর ভয় নেই। দুটোই লোহা কাঠ দিয়ে তৈরি। এবার আর কি। গুঁড়ো হবে যব, ধান ভাঙা হবে। মোটমাট বুটি কি ভাত তৈরির ব্যাপারে আরো একধাপ এগিয়ে গেলাম।

কিন্তু চালুনি একটা দরকার। এর প্রয়োজনীয়তা অসীম। চালুনি দিয়ে যবের গুঁড়ো সেইকব, তবে না বেরবে শয়দা। ভূষি যে আলাদা করতে হবে। কিন্তু কী দিয়ে করি চালুনি! চাই শুষ্ক ফুটো ফুটো সিঞ্চ ধরনের একফালি কাপড়। তেমন কাপড় কোথায়! বিকল্প

কিছু সারা দীপ খুঁজেও আবিষ্কার করতে পারলাম না। ফলে মাসের পর মাস ভেবে আমি আর কূল পাই না। এদিকে আমার পোশাকের সঞ্চয় বলতে গেলে শুন্যের দিকে। যা আছে কিছু ছেড়া খেড়া শত তালি দেওয়া এক একটা অস্তুত দর্শন জিনিস। তবে হ্যাঁ, ছাগলের ছাল আছে কিছু। আর ছাগলের গায়ের পশম। ওগুলো আমি আলাদা করে জমিয়ে রেখেছি। জানি না তো কবে কী দরকার পড়ে যায়! কিন্তু পশম দিয়ে বুনে যে একটা কিছু তৈরি করব সে কোশল যে জানি না। বা চেষ্টা যে করব সেজন্যে প্রয়োজনীয় যে সব উপকরণ দরকার, তা-ই বা কোথায়। তখন ভাবতে ভাবতে হঠাত মনে পড়ল—তাইত কটা টাই তো পোশাক আশাকের সঙ্গে জাহাজ থেকে এনেছিলাম। মখমলের কাপড় দিয়ে তৈরি। তার একটাকে খুলে মাঝখানে দু-একটা সুতো সরিয়ে দিলেই তো চালুনি হয়ে যায়। দেখাই যাক না।

সফলই হলাম বলা যায়। সমস্যা মিটল। ভূষি আর ময়দা হল আলাদা। এবার আর কি!—পরের কাজ বুটি তৈরি।

কিন্তু গড়ব কীভাবে বুটি! প্রথমত যে উন্মনে দিয়ে ফেলাব, ফাঁপাব যেমন পাওয়া যায় ইংল্যান্ডের বাজারে—সেই মশলা আমার কোথায়! নয় ধরে নিলাম, অতটা ফেলাবার দরকার নেই, ভাজা ভাজা যা হোক একটু হলেই হল—কিন্তু তার জন্যে দরকার তো তাওয়া। আমার কি সেই তাওয়া আছে! বলব কি সে যা মনের অবস্থা আমার—যেটাই করতে চাই, খানিকটা এমিয়ে আর এগোতে পারি না। এটা ওটা নানারকম সমস্যা এসে হাত চেপে ধরে। ভিতরে ভিতরে ভোগ করি নিবুচ্ছার এক যন্ত্রণ। শেষে মাসের পর মাস ভাবনার ফলে সমাধানে পৌছলাম। মাটির পাত্র বানালাম মন্ত একটা। অনেকটা বাটির মতো কাঁধ উচু। পরিসীমা প্রায় দু ফুটের মতো। গভীর প্রায় নয় ইঞ্চি। সেটিকে আগুনে নিলাম পুড়িয়ে। ব্যস, নিশ্চিন্ত এবার। এই তো আমার তাওয়া। সেকবার সময় আগুন তুলে নিই চুল্লী থেকে। চারপাশে ছড়িয়ে দিই। মাঝখানে রাখি ময়দা আর জল দিয়ে তৈরি করা মণ। উপরে চাপা দিই চৌকো মতো পোড়া মাটির টালি। ব্যস, একের পর এক বুটি সেঁকা হয়ে যায়।

তবে এ ব্যবস্থা প্রথম দিককার। কাজ করতে করতে যেমন ঘানুষের অভিজ্ঞতা জন্মায়, আমারও তাই। পরের দিকে তাওয়ার মধ্যে আর আগুন তুলি না। তাওয়াটা নিয়ে আসি চুল্লীর কাছ গোড়ায়, ফলে গরম হয় পোড়া মাটি, চারধারে গনগনে লাল কাঠকয়লা দিই টাল করে। তারপর সরিয়ে নিই সে সব। এবার এই তাওয়ায় দিই ময়দার মণ। উপরে চাপা দিই। সে একেবারে আদর্শ বুটি যাকে বলে। ভাপে সেঁকা হয়ে অপূর্ব তার স্বাদ। আর কী মিষ্টি খেতে! জানি না নিজের হাতে গড়া কিনা তাই। তবে একটা জিনিস বুঁতে পারি। কালে দিনে আমি একজন পাকা পাচক ঠাকুর বনতে চলেছি। এ ব্যাপারে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। চালের গুঁড়ো দিয়েও এখন নানান ধরনের খাবার বানাই। তার মূল উপাদান ছাগলের মাংস, জল আর চালগুঁড়ো। মুরগির মাংস দিয়েও যাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাই। মোটমাট খাদ্য প্রস্তুতের ব্যাপারে আমি এখন পুরোদস্তর নিশ্চিত।

তৃতীয় বছরের বেশির ভাগ সময় আমার এসব কাজেই কাটল। এ এক নেশা যেন। চাষবাস, পশুপালন, সেই সাথে একের পর এক নতুন নতুন খাবার তৈরি। ফসল তুলেছি এবার ভালো। কেবল মরশুমের শুরুতেই বুনে দিয়েছিলাম বীজ। ফসলের ভারে গাছ ভেঙে পড়ার দাখিল। তুলে এনে জমিয়ে রেখে দিয়েছি শুহার এক ধারে। এছাড়া তো উপায় নেই। জায়গা প্রথমত কম, দ্বিতীয়ত ঝাড়াই মাড়াই করব এমন উপকরণের অভাব।

যেমন যেমন দরকার হয় তুলে নিয়ে আসি মুঠো ভরে। হামনে ফেলে গুঁড়ো করি।

কিন্তু না, এরপর থেকে আর এভাবে ফসল রাখা চলবে না। গোলা বানাতে হবে অবশ্যই। সামনের বছর তো আরো বেশি ফলন পাব। কোথায় রাখব তখন! তাছাড়া সঞ্চয় হিসেবেও কিছুটা থাকা দরকার। ঘরশুম্বের আগেই দেখি ফুরিয়ে আসে দানা। মোটমাট বুঝতে হবে আমাকে সারা বছর থেকে কতটা ঘোট ফসলের দরকার হয়।

হিসেব করে দেখা গেল চাল আর যব মিলিয়ে সারা বছরে আমার দরকার প্রায় চল্লিশ বুশেলের মতো খাদ্যশস্য। কি লাভ অহেতুক বেশি চাষ করার! বীজের জন্যে যেটুকু বেশি দরকার তাই হলেই চের। মিথ্যে খাটুনির প্রয়োজন কী! ঠিক করলাম এবার থেকে হিসেব করে চল্লিশ বুশেলের একটু বেশি যাতে পাই সেরকম বীজই বুনব।

চাষবাস করি, খাবার বানাই, মাথার মধ্যে ঘোরে কেবল এপার থেকে দেখা ওপাশের ঐ যে দ্বীপ তার কথা। যেতে ইচ্ছে করে বারবার সেখানে; দখল নিতে ঘন চায়। ইচ্ছে করে ওপারে গিয়ে ইঁটা দিই নাক বরাবর। যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাই। তবে হয়ত



#### পারলাম না একে কেনমতে স্থানচ্যুত করতে

বাসস্থানের নিকটবর্তী হব। হয়ত কেউ না কেউ থাকে সেখানে। নিশ্চয়ই কোনো গোষ্ঠী কি জাতি। তাদের সাহায্য নিয়ে রওনা দেব একদিন স্বদেশের দিকে। এই বন্দীদশা আমার ঘূচবে।

কিন্তু বিপদের সন্তাননা হিসেব করে সঙ্গে সঙ্গে ফের নিজেকে গুটিয়ে নিই। সম্পূর্ণ অজ্ঞান অচেনা একটা দ্বীপ—কে জানে যদি পড়ে যাই কোনো নরখাদক বর্বরের হাতে! যদি দেখামাত্র আমাকে তারা হত্যা করে। জ্যান্ত কেটে কেটে শরীরের মাংস খায়! এলাকাটা যে বর্বর নরখাদকের, এ আমি অনুমানে বুঝতে পারছি। হিংস্র জন্মও আছে প্রচুর। তবে তাদের থেকে নরখাদক মানুষকেই আমার বেশি ভয়। পাশাপাশি এমন যদি ধরে নিই, এরা নরখাদক নয়, কোনো সভ্য জাতি, সেক্ষেত্রেও আমার বাঁচবার আশা কম। অনেক ইউরোপীয়েরই এই দুগতি হয়েছে আমি শনেছি। ভাসতে ভাসতে এসে পড়েছে এই ধরনের কোনো গোষ্ঠী বা জাতির হাতে। দেখা মাত্র তারা তাকে হত্যা করেছে। কোনো কারণ নেই। এমনিই হত্যা। সভ্য দুনিয়ার মানুষকে এরা বরদাস্ত করতে পারে না।

দেখলেই মনের মধ্যে ঘৃণা আর ভয় মুথিয়ে ওঠে।

তবু হাল ছাড়ি না। অর্থাৎ মন থেকে পারি না ইচ্ছেটাকে তাড়াতে। বারবার যেতে মন চায়। জল ডিঙিয়ে চলে যেতে ইচ্ছে করে ওধারে। দেখি না, কী আছে ভাগ্যে। আমি যে এখন পূর্ণ মাত্রায় ভাগ্যে বিশ্বাসী।

জুরি সঙ্গে থাকলে এসময় খুব ভালো হত। কত যে ভাবি তার কথা! দুজনে মিলে বানিয়ে নিতাম একটা নৌকো। তাতে করে পাড়ি জমাতাম। কিন্তু নেই যখন নিজেকেই ভাবতে হবে উপায়। নতুন করে নৌকো বানাবার প্রশ্ন ওঠে না। একার পক্ষে তা অসম্ভব। সেক্ষেত্রে যাই না দেখি গিয়ে জাহাজের নৌকোটা আছে কিনা।

গিয়ে দেখি আছে। স্বোতে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল যেখানে সেখানেই পড়ে আছে। তবে সোজা অবস্থায় নয়, উলটো ভাবে। বালি ছেয়ে ফেলেছে প্রায় অনেকটা অংশ। কিন্তু জল নেই। সেটাই সাম্ভনা। জল থাকলে নির্ধার্ত কাঠ পচে যেত।

কিন্তু মানুষ যা চায় তা কি হয় সব সময়। তবে তো পৃথিবীতে হতাশা বলে কোনো কথাই থাকত না। নৌকো তো কমদিন ধরে ওখানে পড়ে নেই। তা প্রায় তিন বছর পূর্ণ হতে চলল। গিয়ে দেখি গেঁথে আছে বালির মধ্যে। একেবারে পাথরের মতো ভারী। পারি না একটু নড়াতে কি সরাতে। আর এমনিতে ওজন তো বুব। দু এক জায়গায় সামান্য ঢেট লেগেছে। সারিয়ে নিলে মোটামুটি নিশ্চিন্ত। চাই কি এই নৌকোয় চেপে ব্রাজিল অঙ্গি স্বচ্ছন্দে পাড়ি জমাতে পারতাম। সবই দুরাশা। বিশ্র ঠেলাঠেলি ধাক্কা ধাক্কি করেও পারলাম না একচুল টলাতে। তখন গাছের ডাল কেটে নিয়ে এলাম। তাই দিয়ে চেষ্টা করব। চাড় দিয়ে দেখব পারি কি পারি না। হায়রে, সে যে কী ঝকমারি। এর থেকে গোটা দীপটা ঠেলে নড়ানোও যেন সহজ। পারলাম না একে কোনোমতে স্থানচূত করতে।

চেষ্টার কোনো ত্রুটি নেই। আপনারা শুনে হয়ত বলবেন—এটা করেন নি কেন, ওটা করা উচিত ছিল। সবিনয়ে জানাই, আমার সাধ্যে যতটুকু কুলোয় তার এতটুকু কসুর আমি করি নি। প্রায় চার হাত্তা একটানা করেছি পরিশৰ্ম। শেষমেশ বালি অঙ্গি চারপাশ খুড়ে ফেলেছি। যদি কোনোমতে একটুখানি নিচে ঢোকার উপায় থাকে। বা নিদেন পক্ষে একখণ্ড কাঠ ঢেকবার অবস্থা থাকে। তবে একবার শেষবারের মতো চেষ্টা করে দেখব।

সে চেষ্টাও বিফল। সেভাবেও পারি নি। এতটুকু নড়াতে। নিচে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। আগাগোড়া পেট বোঝাই বালি। আমার সাধ্য কি সেগুলো সরিয়ে ভিতর থেকে ঠেলা মারি। শেষে হতাশ অবস্থায় হাত গুটিয়ে নিতে বাধ্য হলাম। থাক পড়ে যেমন আছে তেমন। আমার এতে আর দরকার নেই। তবে হ্যাঁ, এতে করে পরপারের যাবার ইচ্ছেটা একদম কমে নি। সেটা বরং বলতে গেলে আগের তুলনায় আরো বেড়েছে।

তখন হঠাৎ মাথায় খেলে গেল নতুন একটা চিন্তা। আচ্ছা, ছোটো একটা ডিঙি যদি নিজের হাতে তৈরি করে নিই। শালতি বলে থাকে। গাছের গুড়ি কেটে তার মাঝখানটা খুড়ে দিলেই হল। অনেকে একে বলে ডোঁ। মোটমাট আমার যা বর্তমান অবস্থা—যন্ত্রপাতি নেই, সাহায্য করার একটা লোক নেই—আমার পক্ষে অন্য কিছু বানানো ঝকমারি। তা ভাবতে যে পেরেছি তাতেও ভারি খুশি খুশি লাগল।

কিন্তু সমস্যার কি আর অন্ত আছে। ডোঁ নয় শেষ অঙ্গি বানালাম, কিন্তু জলে টেনে নিয়ে যাব কীভাবে। ধরা যাক মন্ত একটা গাছ বাছলাম, কাটলাম সেটাকে, পেটটা খুড়ে বা প্রয়োজনবোধে পুড়িয়ে বানালাম দুর্ধর্ষ সুন্দর একখানি ডোঁ। কিন্তু সেটাকে জল অঙ্গি টেনে নিয়ে যাব কীভাবে। সে কি একলা হাতে সম্ভব। তবে তো সব প্রচেষ্টা আমার বিফল

যাবে। সে অবস্থায় করণীয় কী।

করণীয় কি হবে কি না হবে সেটা পরে বিচার্য। সব কিছু অত হিসেব কষে আগে ঠিক করা যায় না। নিজের মনকেই নিজে দিলাম প্রচণ্ড ধমক।—এখন কাজটা মানে মানে শুরু কর তো বাছাধন!

তখন খুজে পেতে বের করলাম মন্ত এক সেগুন গাছ। কূলেরই খানিকটা কাছাকাছি। তার গুঁড়ির পরিধি নিচের দিকে পাঁচটু দশ ইঞ্চি আর উপর দিকে চার ফুট এগার ইঞ্চি প্রায়। দৈর্ঘ্যে বাইশ ফুট। শুরু হল কাটার কাজ। একদিনের তো আর কাজ নয়। লাগল মোট বানাতে বাইশ দিন। তবে গাছ মাটিতে শয়্যা নিল। তখন ডালপালা ছাঁটা। সে-ও প্রায় চৌদ্দ দিনের টানা পরিশুম। তারপর শুরু হল ভিতরের কাঠ খুড়ে ফেলা। কী অসীম কষ্ট আপনারা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন। হাত তো মোটে দুখান। তার উপর দৈনন্দিন নিয়ম মাফিক অন্যান্য কাজও করতে হয়। সব ফিলিয়ে সময় লাগল পাকা তিনটি শাস। নৌকো বলেই মনে হচ্ছে। বরৎ ডোঁঙা বা শালভির চেয়ে দেখতে অনেক চমৎকার। ভিতরে যা জায়গা তাতে ছার্কিশ জন লোক অনায়াসে বসতে পারে। তাতেও ফাঁকা থাকে বেশ অনেকখানি। আর একা আমি হলে তো চিঞ্চাই নেই। আমার যাবতীয় যালপত্র সমেত আমি স্বচ্ছন্দে ডোঁঙায় চেপে পাড়ি জমাতে পারব।

শুরু আনন্দ তখন আমার। কাজ মোটামুটি নিখুতই বলা চলে। আগুনের সাহায্য নেবার দরকার হয় নি। যা করেছি সব নিজের হাতে। কুড়ুল আর করাত দিয়ে। আর যা শক্ত কাঠ! কত যে ক্লাস্টি জমা হয়ে আছে এর পরতে পরতে! তবু হল ছাড়ি নি। এটাই সাম্ভন্না যে শেষ করে তবে ইস্তফা দিয়েছি কাজে।

তবে ট্রিটুকুই। পারলাম না হাজার চেষ্টা করে তাকে জলে নিয়ে যেতে। অসীম কষ্ট করলাম। আর নানান চেষ্টা। মাত্র জলের থেকে শাখানেক গজ দূর। কিন্তু পারব কীভাবে, এদিকে যে পাহাড়ী এলাকা। কূল অনেকটা উচুতে। ডোঁঙা পড়ে আছে নিচের দিকে। সেখান থেকে ঠেলে উপরে তুলে ফের জলে নামানো একেবারেই অসম্ভব। তখন ভাবলাম, এক কাজ করি বরৎ— মাটি খুড়ে ফেলি—শুরু করলাম কাজ। কিন্তু কিছুদিন পরে ইস্তফা দিলাম। কোনো লাভ নেই। মাটি খুড়লেও কিছুতে পারব না আমি একার চেষ্টায় ডোঁঙাটাকে একচুল গড়তে। আমার শক্তির সম্পূর্ণ বাইরে।

তখন ফের একদফা জমি মাপলাম। নতুন বুদ্ধি উদয় হল মাথায়। আচ্ছা যদি এক কাজ করি! যদি মন্ত গভীর একটা নালা কাটি জল থেকে শুরু করে ডোঁঙা অর্দি। তাতে স্বাভাবিক নিয়মে জল চলাচল করবে। সেক্ষেত্রে ডোঁঙা নিজেই জলের নাগাল পাবে। আমার শুরু একটা ঠেলাঠেলির দরকার হবে না।

শুরু করব কাজ, তার আগে বসলাম একদফা হিসেব নিয়ে। পাহাড়ী এলাকা। নালা কাটা মানে আগাগোড়া পাহাড় কাটা, তার পাথর ভাঙ। তাতে সময় লাগবে আমার মোট বার বছর। কেননা মুখের দিক থেকে ডোঁঙার কাছ বরাবর অব্দি খুড়তে হবে প্রায় বিশ ফুটের মতো গভীর করে। আমার মতো একলা মানুষের পক্ষে সেটা বার বছরেরই পরিশুম। দরকার কী অহেতুক পরিশুমে। বরৎ ডোঁঙার ব্যাপারটাকেই পুরো বাতিল করি।

ভারি দুঃখ পেয়েছিলাম সেবার। এতদিনের যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল দেখে। আসলে নিরূপায় যে আমি। এ অবস্থায় একা মানুষের পক্ষে নতুন কী-ই বা করার থাকতে পারে।

এই সব কাজের মাঝে একদিন চার বছর পূর্ণ হল। দ্বীপে আসার এই আমার চতুর্থ বার্ষিকী। সেই ৩০ শে সেপ্টেম্বর। দিনটি যথারীতি উদ্ঘাপিত হল। সারাদিন ধাকলাম

অঙ্গুক্ত অবস্থায়। ঈশ্বরকে ডাকলাম। তবে একটা কথা, মনে কিন্তু আমার কোনো দৃঢ়থ, কি তাপ, কি শোক বলতে কিছু নেই। ঈশ্বরের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞ আমি এবং কৃতার্থ। আমাকে তিনি এই চার বছরে যথেষ্ট জ্ঞানী করে তুলেছেন। আগে বুঝতাম না এখন সব কিছুই বুঝি। আগে যা যেমন ভাবে দেখতাম এখন অন্য চোখ দিয়ে দেখি। সব কিছু সম্পর্কে ধারণা এখন আগের তুলনায় অন্যরকম। পৃথিবীকে আমি মনে করি এখন দূর গ্রহের মতো কোনো একট গুহ। তার কাছে আমার আর কিছু আকাশক্ষা নেই। কোনো চাহিদা নেই। বাস্তবিক চাইলে লাভই বা কি। আমি তো আর কোনোদিন সভ্য জগতে ফিরে যাব না। এখানেই থাকতে হবে চিরকাল। সভ্য জগতের দিকে আঙুল দেখিয়ে বাইবেলের ভাষায় এখন শুধু বলতে ইচ্ছে করে—তোমার আর আমার মাঝে এখন দুন্তর ব্যবধান।

ব্যবধান সব দিক থেকেই। এই যে এখানে আছি আমি—পৃথিবীর নানারকম ছল চাতুরী থেকে আমি মুক্ত। আমার মোহ বলতে কিছু নেই, না আছে চোখে দেখার মোহ, না আছে জীবন নিয়ে কোনো রকম অহংকার। ঈর্ষা করার মতোও কিছু নেই। আর সত্যি—ঈর্ষা করার আমার দরকারই বা কী! কীসের অভাব আমার! আমি তো নিজেই এই গোটা ভূখণ্ডের মালিক। সে অর্থে আমি রাজা, বা আরেকটু বড় করে বললে, আমি সম্রাট। আমার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, নেই কোনো প্রতিযোগী। এমনকি আমার সার্বভৌমত্ব নিয়ে আবি কারো মনে কোনো প্রশ্ন জাগার কারণ নেই। ইচ্ছে হলে আমি জাহাজে জাহাজে মাল বিদেশে পাঠাতে পারি। কী হবে আমার এত জিনিসপত্র দিয়ে! আমি তো আর অত ধানচাল, অত যব একলা খেয়ে ফেলে ছড়িয়ে নষ্ট করতে পারব না। সেক্ষেত্রে বাকি সব চালান দেওয়াই উচিত। শুধু ধান চাল যব নয়, কাঠ চালান দিতে পারি আমি। কাছিম আঙুর আরো কত কি! কিন্তু দেব কীসে! আমার কি কোনো জাহাজ আছে। আছে সভ্য দুনিয়ার সঙ্গে কোনোরকম যোগাযোগ?

কিছুই নেই। সেক্ষেত্রে নিজেই আমি এসবের ভোগ দখলের অধিকারী। ব্যয় করি পরিমিত। অহেতুক অপব্যয় আমার একদম পছন্দ হয় না। ধরুন যদি মারি মন্ত একটা ছাগল—কী হবে অত মাংস দিয়ে আমার? আমি তো আর একলা সব একদিনে খেয়ে শেষ করতে পারব না। সেক্ষেত্রে ফেলা যাবে। কুকুরটা খেয়ে নেবে, নয়ত নষ্ট হতে পারে। তখন পোকা ধরবে। পোকা খাবে পেট পুরে। তাতে আমার কী লাভ! বা ধরুন প্রচুর ফসল ফলালাম। আমার লাগবে যতটা তার চেয়ে চের চের বেশি। নয় কিছুটা রেখে দিলাম বীজ করবার জন্যে। কিন্তু বাকিটা? সেটা তো নষ্টই হল। কিংবা হয়ত কেটে আনলাম মন্ত বিশাল একটা গাছ। অত কাটে আমার তো দরকার নেই। তখন মাটিতে পড়ে পড়ে জলে কাদায় পচবে। নষ্ট হবে। নয় রোদের তাপ খেয়ে খটখটে শুকনোই হল। কিন্তু কী হবে অত শুকনো কাঠ দিয়ে আমার। অত আঙুন কি আমার জ্বালাবার দরকার হয়!

অর্থাৎ বোধ জন্মেছে আমার মনে। এটা আমি নিজেও বুঝতে পারি। শিখিয়েছে সব আমাকে এই প্রকৃতি। এই নিঃশব্দ নির্জন পরিবেশ। অনেক সত্য আমি এই একক একাকীত্বের মধ্যে উপলব্ধি করতে পারছি। যেমন প্রাচুর্য এবং স্বল্পের মধ্যে সম্পর্ক। প্রাচুর্যের কোনো দরকার নেই। ঠিক যতটুকুর দরকার সেটুকু হলেই দুনিয়ায় মানুষের প্রয়োজন মিটে যায়। যা বাড়তি তাই আমরা দিয়ে দিই অপরকে। নিজেরটুকু ভুলেও কখনো হতভাড়া করি না। ঈর্ষা মানুষের একটা ব্যাধি বিশেষ। আমার খুব ইচ্ছে হয়, পৃথিবীর জ্যোতির্যতম ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিটি এই নির্জন বিজ্ঞে এসে কটা বছর কাটিয়ে যাক।

তবে আর সৈর্বা বলে তার মনে কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকবে না। এখানে সে সৈর্বা করার লোক পাবে কোথায়! চারদিকে তো অনন্ত প্রাচুর্য। নিক না তার যতখানি দরকার লাগে ততখানি। দুহাত ভবে নিক। শেষে নিতে নিতে তারও নির্ধার্ণ আমার মতো বিত্তক্ষণ হবে। তখন মিতব্যযী হতে শিখবে। সংশয়ও করতে শিখবে মিতভাবে। সব রকম আকাঙ্ক্ষা তার মন থেকে বিদায় নেবে। যেমন আমার এখন আর নেই কোনো আকাঙ্ক্ষা। আমার সঙ্গে টাকা পয়সাও তো বিস্তর রয়েছে। আছে সোনা অনেকখানি আর রূপো। সত্যি বলতে কি, সেগুলো যে আছে আমার কাছে, তা-ও মাঝে মাঝে বিস্মরণ হয়ে যায়। এখানে কী তার মূল্য বলুন দেখি! কী কাজে লাগবে আমার ঐ সোনা রূপো বা টাকা! সব নির্থক। সব মূল্যহীন। আমাকে যদি কেউ এসে বলে, তোমাকে আমি তামাক দেব খানিকটা, তুমি বিনিময়ে আমাকে সব সম্পদ দিয়ে দাও, আমি একটুও ইতস্তত না করে সম্পূর্ণ থলিটা এনে তার হাতে তুলে দেব। এক বোতল কালি দিলেও দিয়ে দেব সব। কালিটা আপাতত খুব দরকার। ফুরিয়ে এসেছে প্রায়। এখন মাত্র তলানি। বিনিময়ে নিয়ে যাক না আমার সব সম্পদ। আমার তাতে অক্ষেপ মাত্র নেই।

মেট্রোট মনের দিক থেকে এখন আমি যথেষ্ট মুক্ত। খুব স্বাভাবিক বলতে যা বোঝায়। জীবনটাকে এই স্বাভাবিকত্বের ছাঁচেই ঢেলে নিয়েছি। দৈনন্দিন সংগৃহীত মাংস নিয়ে যখন দুপুরের আহারে বসি, তখন মনে করি এই যে মাংস আমি পেয়েছি, এটা যথেষ্ট স্বাভাবিক। সৈম্বরের অপরূপ করুণার ফলেই আমি আজ এই জীবটিকে বধ করতে সক্ষম হয়েছি। তাকে ধন্যবাদ জাননোটাই এক্ষেত্রে স্বাভাবিক। জানাই তাই। হৃদয়ে অসীম ত্রুটি অনুভব করি। জীবনের ভালোটুকুর দিকেই এখন আমার সবচেয়ে আগে চোখ যায়। অর্থাৎ এক অর্থে আমি আশাবাদী। আগে দেখতাম শুধু কষ্টের দিক, দুঃখের দিক। এখন দুঃখ কষ্টের কথা তেমন আর বিরাট ভাবে মনে পড়ে না। যা পাই তা তো অচেল। সে অর্থে বলতে গেলে আমি রাজসূয়ে আছি। খোশ মেজাজে কাটছে আমার একটির পর একটি দিন। আমার তো কোনো কিছুর অভাব নেই। পারবে এভাবে সভ্য দুনিয়ার কোনো মানুষ ভাবতে? অসম্ভব। যা দেন সৈম্বর তাতে কিছুতে তারা সন্তুষ্ট হতে পারে না। মনের মধ্যে কেবলই জয় করে অসম্ভাবের কালো ধোয়া। তা থেকে জন্ম নেয় সৈর্বা আর পরশুরীকাতরতা। আমার সৌভাগ্য আমি সে সব থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত।

আর ঘুরে ফিরে কেবলই আসে সৈম্বরের করুণার কথা! মনকে বলতে গেলে আচম্ভ করে রাখে। কী বিপদেই না পড়েছিলাম প্রথম দিকে ভাবুন দেখি! নির্জন নিরিবিলি একটা জায়গা, সেখানে এসে উঠলাম অপ্রত্যাশিত ভাবে। ভেবে দেখুন সহায় সম্বলহীন একটা মানুষ। জুটিয়ে দিয়েছে সব কিছুই সৈম্বর। ভাঙা জাহাজটা টেলতে টেলতে এনে ফেললেন কূলের কাছে। দূরে থাকলে জানি না সে জাহাজে আমি যেতে পারতাম কিনা। কূলের কাছে বলে স্বাচ্ছন্দ্যে তাতে গেলাম, প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিস একটি একটি করে নিয়ে এলাম। আনলাম কাজ করবার মতো যন্ত্রপাতি, সঙ্গে আত্মরক্ষার অস্ত্র, তার রসদ হিসেবে বাবুদ আরো কৃত কী!

অবাক বিস্ময়ে সে কথাই ভাবি সব সময়। তবে দেখুন, যদি না পেতাম বন্দুক কি গোলা বাবুদ। কী হত তবে আমার অবস্থা! পারতাম আমি এইভাবে বেঁচে থাকতে। খাদ্য হিসেবে জুটত আমার তখন শুধু কাছিম আর মাছ। তাও জোটাতে পারতাম কিনা সন্দেহ। শুধু তো হাত দুখানা সম্বল। তা-ও পারতাম না রাখা করে খেতে। কোথায় পেতাম এখানে আগুন! কাঁচা খেতে হত সব চিবিয়ে। বর্বর আদিম মানুষেরা যেভাবে খেয়ে বেঁচে

থাকে। হয়ত তিল বা পাথর ছুড়ে দুটো একটা ছাগল মারতাম। কিন্তু ছাড়াতে পারতাম কি তাদের ছাল? সেক্ষেত্রে সামনে খাদ্য নিয়ে অনাহারে বসে থাকতে হত আমায় আর তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে এগোনো ছাড়া উপায় থাকত না।

সবই করুণা। ঈশ্বরের অনন্ত অসীম করুণার ফল। আমি স্পষ্ট সে কথা উপলব্ধি করি। যাদের উপর এই করুণা বর্ষায় না তাদের জীবন দুঃখের। এবং পৃথিবীতে এই জাতীয় দুঃখী মানুষের সংখ্যা কম নয়।

আমার সৌভাগ্য ঈশ্বরকে আমি এই বিজ্ঞ নিরালায় এসে চিনতে পারলাম। এ আমার জীবনের পরম সুখ। এখানে আমি আগে কখনো তো ভাবি নি এমন করে তাঁর কথা, কখনো তো চিনি নি তাঁকে এমন করে। বাবা চেষ্টা করেছিলেন আমাকে ধর্মপ্রাণ করে তুলতে, পারেন নি। বাড়ির সব নির্দেশ অগ্রহ্য করে পরে বেছে নিয়েছিলাম আমি নাবিকের জীবন। সেখানে ধর্মের কোনো চল নেই। নাবিকেরা ধর্মকে পারোয়া করে না। তাদের কাছে সম্মুদ্র একমাত্র বাস্তব। এছাড়া আর কিছু তারা বোঝে না বুঝতে চায় না। ধর্ম নিয়ে কাবুকে বাড়াবাড়ি কিছু করতে দেখলে উপহাস করে, যা-তা গালাগালি দেয়। সেক্ষেত্রে ঐ পেশায় নিযুক্ত থাকলে কোনোদিন যে ঈশ্বরে আমার আসক্তি জন্মাত এখনো মনে হয় না। আমার সৌভাগ্য আমি সে জীবন থেকে নির্বাসিত হয়ে মনের দিক থেকে ঈশ্বরের একান্ত কাছাকাছি হতে পেরেছি।

কত না নির্বোধ ছিলাম আগে। ভাবি এখন, আর অনুত্তাপে জজরিত হতে থাকে হৃদয়। কত সৌভাগ্যের মুখোমুখি হয়েছি কতবার। দস্যুদলের হাত থেকে পালিয়ে এসেছি। পতুগিজ জাহাজের কাষ্টেন আমাকে উদ্ধার করেছেন অনিশ্চিতের কবল থেকে, ব্রাজিলে গিয়ে আমার ভাগ্য পরিবর্তন—বারে বারে পেয়েছি ঈশ্বরের অনুগ্রহ তবু অঙ্গ আমি। নির্বোধ—একবারও মুখ ফুটে উচ্চারণ করি নি—হে ঈশ্বর, তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তুমি আমাকে কত দুঃখের হাত থেকে বারবার রক্ষা করেছ! সে সব আমার পাপের দিন। আমি পাপী! তাই বারেকের জন্যে মুখ ফুটে উচ্চারণ করতে পারি নি ঈশ্বরের করুণার কথা। আজ পারি। আজ বুক ভরা আমার অনুত্তাপের জ্বালা। বলি তাই—প্রভু আমার অপরাধ নিও না। আমি অঙ্গ ছিলাম তখন। আমাকে দয়া কর।

সেদিন আর আজ। আমি অবাক হয়ে ভাবি সেই কথা। না বুঝে পেয়েছি তখন ঈশ্বরের করুণা, আজ বুঝতে পারি অক্ষরে অক্ষরে। আমার জীবন সার্থকতায় পরিপূর্ণ হয়। দুঃখ ভরে ঢেলেছেন প্রভু তাঁর করুণা এই নির্জন নিরালায়। আমার জীবন ধন্য।

তা বলে পূর্ণ হয়েছে কি পাপের ভার? হয়ত না। এখনো বাকি আছে অনেক কিছু। এখনো অনেক দুর্ভোগ আমাকে ভুগতে হবে। অনেক ক্ষমা অনেক অনুগ্রহ চাইতে হবে এখনো দীর্ঘদিন। আরো কত অলৌকিক প্রত্যক্ষ করতে হবে আমার জ্ঞানা নেই। অলৌকিকই বলব একে। কেননা কী যে ঘটতে পারে আমার ভাগ্যে তা তো এই মুহূর্তে বলতে পারা যায় না। যেমন অলৌকিক এখানে আমার অস্তিত্ব। এই বিজ্ঞে তো কত কিছু হতে পারত আমার! থাকতে পারত হয়ত কত নরখাদক। আসা মাত্র আমি তাদের কবলে পড়তাম। থাকত হয়ত অসংখ্য বাধ কি সিংহ কি অন্য কোনো স্বাপদ। মুহূর্তে এক গ্রাসে তাদের উদরস্থ হতে পারতাম। কিংবা হয়ত থাকত কোনো বিষাঙ্গ জীব। ক্ষুধার তাড়নায় তাদের যাংস ভক্ষণ করে আমার জীবন দীপ নির্বাপিত হত। কিন্তু তার কোনোটাই হয় নি। আমি এখনো সুস্থ স্বাভাবিক এবং জীবিত। এটা কি সত্যই অলৌকিক নয়!

মোটমাট জীবনে দুঃখ যে আমার একেবারে নেই, একথা বলব না। কিন্তু দুঃখের চেয়ে

দয়ার ভাগই বেশি। দয়া এবং করুণা। তাতে দৃঢ় মুন হয়ে যায়। ব্যথা করে। জীবন লাভ করে এক স্বর্গীয় তত্ত্ব। আমি আপাতত সেই তত্ত্ব নিয়েই বেঁচে আছি।

যদিও বহু জিনিসেই টান পড়তে শুরু করেছে।

কালি এনেছিলাম জাহাজ থেকে। সেটা এখন শেষ। জল মিশিয়ে বাড়াতে শুরু করেছিলাম আধাআধি সময় থেকে। ফের জল, ফের জল, চলেছিল এইভাবেই। ইদানীং এমনই দাঙ্গিয়েছে তার রং তাতে সাদা কাগজে লিখলে কোনো কিছু আর বোঝা যায় না। সব সাদা। ফলে লেখা বক্ষ করতে হয়েছে। সেটা আমার অত্যন্ত বেদনাদায়ক। লিখে প্রকাশ করতে পারতাম এতাবৎ মনের নানান অবস্থার কথা। এখন শুধু ভাবনা। আর নিজের সঙ্গে অনবরত কথা বলা। এইভাবেই নিজেকে এখন প্রকাশ করতে শুরু করেছি।

ভাবতে ভাবতে নানান কথাই মনে পড়ে। মিল পাই আনেক কিছুর। যেমন বাবার আদেশ অগ্রাহ্য করে আমার সেই হুল-এ পলায়ন। তারিখটা স্পষ্ট মনে আছে। একই তারিখে জলদস্যদের হাতে আমি পড়েছিলাম। দুয়ের মধ্যে আশ্চর্য মিল।

প্রথম জাহাজ ডুবির পর যেদিন ইয়ারমাউথে গিয়ে উঠলাম, সেটাও সেই একই তারিখ। অবাক কাণ্ড, যেদিন পালালাম জলদস্যদের কবল থেকে হিসেব করে দেখেছি সেটাও সেই একই তারিখ।

আমার জন্মও ঐ দিন অর্থাৎ ৩০শে সেপ্টেম্বর। দ্বিতীয় বার ঝাড় ঝাপটার তাড়নায় সঙ্গী সাথীদের হারিয়ে যেদিন এই দ্বিপে এসে উঠলাম, সেটাও ঐ ৩০ তারিখ। অস্তুত এক সামঞ্জস্য আছে এই ঘটনালোর মধ্যে। একথা এতদিন আমার মনে উদয় হয় নি। আজই প্রথম আমি বুঝতে পারলাম। বিস্কুটও সব ফুরিয়ে গেছে। বলব কি সে যেন আমার জীবনের এক চরম সংকটের মুহূর্ত। শেষ হবার অনেক আগে থেকেই আমি হিসেব নিকেশ করে খরচ করতে শুরু করেছি। একটা মাত্র বিস্কুট সারাদিনে একবার। তা—ও কি থাকে! একবছর এইভাবে চালাতে চালাতে দেখি সম্পর্ক শেষ। এদিকে চাষবাসেও তখন তেমন সুবিধে করে উঠতে পারি নি। চলল সেইভাবে আরো একটা বছর। তারপর ফসল ঘরে তুললাম। সে যা আনন্দ আমার! এই একটা বছর তো বলতে গেলে শুধু মাঠসের উপরই চালাতে হল।

পোশাকেরও চরম দুরবস্থা। কটা চেক কাটা জামা শুধু আছে—জাহাজে একটা বাস্ত্রের মধ্যে পেয়েছিলাম। আর সব ছিন্ন ভিন্ন। এগুলো আর ভয়ে পরি না। খালি গায়েই থাকি। যাবে মাবে মনে হয়, কী আর দরকার আমার পোশাকে, একলা তো মানুষ। যদি নগু অবস্থায় ঘোরাফেরা করি কে আর আমাকে দেখতে আসছে। সেইভাবে কদিন চেষ্টাও করেছিলাম। কিন্তু পারি নি। রোদের যা তাত! পিঠ যেন একটু পরে পুড়তে শুরু করে।

পিঠের চামড়া দু চার জায়গায় ঝলসেও গেছে। তখন ঠিক করেছি, খালি গায়ে আর থাকব না, যেমন তেমন হোক, একটা জামা গায়ে রাখতেই হবে। তাতে রোদের তাপ থেকে অব্যহতি তো পাবই উপরন্তু হাওয়া চলাচল করে শরীর জুড়িয়ে রাখবে। একটা টুপিরও দরকার। খালি মাথায় থাকলে দেখি একটু পরেই মাথা ধরে যায়। এটা কদিন ধরে খুব টের পাচ্ছি। কিন্তু করব কী—টুপি যে আমার নেই।

তখন শুরু হল ভাবনা। ছিল যে ছেঁড়া ঝোড়া কাপড় চোপড়, বসলাম তাই নিয়ে। জ্যাকেটও একটা বানাতে হবে। তাতে জামাটা রক্ষা পাবে। তা সে যা সেলাইয়ের হাত আমার! শেষাবধি যা তৈরি হল তাকে বাস্তব অর্থে জ্যাকেট কিছুতেই বলা যায় না। কিন্তু তকিমাকার একটা জিনিস। হোক গে। আমার তাতে কী যায় আসে! দেখতে তো আর

কেউ আসছে না। কাজ চললেই হল।

টুপির প্রয়োজনটা মেটালাম একটু অন্যভাবে। জীবজন্তু এতাবৎ যত মেরেছি চামড়া তো ফেলি নি একটারও, শুকিয়ে রেখেছি রোদে। সে একেবারে খটখটে শুকনো যাকে বলে। ভাঁজ করতে গেলে মড়মড় করে আওয়াজ হয়। তো তাই দিয়েই বানাতে বসলাম টুপি। হল কিন্তু ভারি চমৎকার। ঘন্ট বিশাল তার আকৃতি। লোমের দিকটা উপরে। তাতে বৃষ্টি ভিজলে কোনোক্ষমে জল দাঁড়াবার উপায় নেই, পিছলে পড়ে যেতে সময় লাগবে না। মেটামাট খুশি আমি আমার নিজের কাজে। শেষে আত্মবিশ্বাস এমনই বাড়ল, চামড়া দিয়েই বানিয়ে ফেললাম একটা ছেটো মাপের কোট আর পরনের একজোড়া সরু পা প্যান্ট। গোড়ায় ভেবেছিলাম খুব গরম হবে। পরার কিছুক্ষণের মধ্যেই না খুলে পারব না। পরে দেখি রোদের তাপে শরীর এতে ঠাণ্ডাই থাকে। সে ভারি আরাম। রোদ বৃষ্টি দুয়ের হাত থেকেই যাকে বলে পরিপূর্ণ অব্যাহতি।

এবার বসলাম একটা ছাতি বানাতে। ছাতির খুব দরকার। টুপি পরলে মাথায় রোদ লাগে না ঠিকই, কিন্তু সে হাঁটাচলা করার সময়। এক জায়গায় বসে কাজ করতে করতে তাপে মাথা গরম হয়ে যায়। তাছাড়া বৃষ্টির হাত থেকে শরীর সম্পূর্ণ বাঁচাতে ছাতি একটা অত্যন্ত দরকার। এটার কিছু কিছু কাজ আমি জানি। দেখেছি তো ব্রাজিলে। রোদের তাপ সেখানেও কিছু কম নয়। ছাতি সেখানে প্রায় সকলের সঙ্গেই থাকে। এখানে গরম আরো বেশি। তা দু দুটো বরবাদ করে তিন নম্বরটা মেটামুটি প্রয়োজন মাফিক তৈরি হল। তা-ও আবার ঝঝঝট—তাকে পারা যায় না বৰ্ক করতে। এমন ছাতি নিয়ে কি আর যত্নত্ব যাওয়া যায়। শেষে অনেক হিসেব নিকেশ করে অনেক কারিগরি বিদ্যে খাটিয়ে সেরকমও একটা বানাতে পারলাম। ছাউনিতে সেই জন্তুর ছাল। তার উপরটায় লোম, ফিলে বৃষ্টি এলে চালের উপর থেকে জল পড়ার মতো সব জলই পড়ে যায়। তখন ভারি খুশি আমার। যেখানে যেতাম ভাঁজ করে ছাতিটা নিয়ে যেতাম বগলের নিচে। বলতে গেলে কালে দিনে আমার বাহন হয়ে দাঁড়াল।

এবৎ এইভাবেই এই দ্বীপে আমি বিঁচে বর্তে আছি। পাঠক বুঝতে পারছেন কত সুবৃহি আমি, কত তত্পু। এর পিছনে আগাগোড়াই তো ইস্বরের দয়া। শুধু কথা বলার লোক পাই না এই যা দুঃখ। তা ও জয় করি ভাবনা দিয়ে। নেই তো কী, আমি নিজেই তো আছি। এই তো মন আমার। এর সঙ্গেই নয় কথা বলি।

তখন সেইভাবে নিজেই প্রশ্ন করি নিজেকে। নিজেই দিই জবাব। কথায় কথায় এসে পড়ে ইস্বরের কথা। অমনি মন আমার প্রফুল্ল হয়ে উঠে। একাগ্রচিত্তে তাঁকে স্মরণ করতে শুরু করি।

এর পর পাঁচটা বছর বলতে গেলে নিরুন্তাপ নিরুন্তিগ্নি দিনধাপন। অস্তুত অপ্রাকৃত আর কিছু ঘটে নি বা ঘটবার সুযোগও হয় নি। অর্থাৎ নৈমিত্তিক যে সব কাজ আমি করি তাই নিয়েই নিজেকে রাখি ব্যস্ত। যেমন ধরন সকালে বন্দুক কাঁধে বেরিয়ে পড়া, কি অবসর সময়ে চাষবাসের কাজ—সেখানে জমি তৈরি থেকে শুরু করে বীজ বোনা, ফসল ফলানো, ফসল কাটা, ফসল ঝাড়া বাহ্য—সব কিছুই আছে মোটের উপর গতানুগতিক যাকে বলে। ব্যতিক্রম হিসেবে সেই ডোঁঙা তৈরি আর তাকে জলে ভাসাবার অনন্ত প্রচেষ্টা। ডোঁঙা যে তৈরি করেছি সে কথা তো আগেই আপনাদের জানিয়েছি। জল অন্ধি নিয়ে যাওয়ার যাবৎ প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হল তখন মরিয়া হয়ে খাল কাটতেই শুরু করলাম।

ঠিক খাল বলা যায় না, নালা আর কি। ছ ফুটের মতো প্রশস্ত, চার ফুট গভীর। দৈর্ঘ্য ধরুন প্রায় আট মাইল। একে বোধহয় অসাধ্য সাধনই বলা উচিত। গোড়ায় ডোঙা তৈরির পর নানারকম কসরৎ করেও যখন পরলাম না তাকে জলের কাছে নিয়ে যেতে, তখন হতাশ হয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু হাল ছাড়ি নি। জেদ চেপে গিয়েছিল। তাই দুটি বছর একটানা খাটুনির পর নালার জল ঢুকিয়ে যখন তাকে সত্যি সত্যি ভাসাতে ভাসাতে জলে এনে নামালাম—সে কী আনন্দ আমার, কী খুশি।

আর অবাকও। এত ছোটো আমার নাও! এত ক্ষুদ্র! বুঝি নি তো এতদিন! জলের বিশালতার মধ্যে পড়ে তার ক্ষুদ্রত্ব নজরে পড়েছে। একে নিয়ে কীভাবে বেরব আমি সমুদ্র যাত্রায়! আগে ভাগেই তো আর নদী পার হয়ে ওপাশের জমিতে উঠছি না, আগে ঘূরে ঘূরে দেখতে হবে চারপাশ! কী আছে না আছে সেটা বাইরে থেকে আগে জরিপ করার প্রশ্ন। তারপর তো গিয়ে ওঠা। কিন্তু প্রায় চালিশ মাইলের মতো পথ টহল দেওয়া এইটুকু



ভেসে পড়লাম একদিন দ্বিতীয়ের নাম করে

#### ডিঙ্গিতে কি সম্ভব!

তখন ছোট একটা মাসুল খাটোলাম। তাতে জুড়ে দিলাম পাল। এখানে আছে তো মজুত আমার কাছে। জাহাজ থেকে আনার পর থেকে তাঁবু তৈরি ছাড়া তো অন্য কোনো কাজে লাগে নি। পাল খাটিয়ে তবে খানিকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

কটা ছোটো খাটো খাটো বাল্লাম। দেরাজের মতো। তাতে থাকবে আমার প্রয়োজনীয় নানান সামগ্রী। খাদ্য দ্রব্য থেকে শুরু করে বন্দুক, গোলা বারুদ— সব। এগুলোকে জলের বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচিয়ে শুকনো রাখাটাই সবচেয়ে বেশি দরকার। বন্দুক রাখার জন্যে অবশ্য আলাদা একটা জায়গা করলাম। খোলের খানিকটা চেরা মতো। ঠিক বন্দুকের মাপে মাপে তৈরি। সেখানে ঢুকিয়ে সামনে কাঠের ফালি দরজাটা আটকে দিলে সাধ্য কি জল ঢেকে!

ছাতাটাকেও খুলে মাসুলের সঙ্গে আটকে দিলাম। ভালোই হল। ছায়া পাব সর্বদা। রোদের তাপ যে ইদানীঁ একদম সহ্য করতে পারি না। মোটমাট সব রকম ভাবেই আমি

এখন প্রস্তুত। এবার পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন। ভেসে পড়লাম একদিন ঈশ্বরের নাম করে। কিন্তু সে এমন দূরে নয়। কাছেই। আসলে আমার দরকার ডোঁগা কেমন চলে সেটা একটু খতিয়ে দেখ। ফিরে এলাম কূলের কাছে। তারপর থেকে রোজই একটু একটু করে এগোই। দৈনন্দিন কাজের মধ্যে এই নতুন কাজটাও ঢুকে গেছে। কদিন পরে মনে হল—তাইত, ঘুরে দেখে আসি না একদিন নিজের সাম্রাজ্যটা। কখনো তো একনাগড়ে পুরোটা দেখা হয় নি। তখন দু উজ্জন মতো কৃটি নিলাম সাথে—আমারই নিজের হাতে তৈরি, এক কলসী চাল ভাঙা নিলাম,—এটা খাই খুব, আমার খুব ভালো লাগে। আর এক বোতল পানীয়, আধখানা ছাগলের প্রমাণ মাংস, কিছু বারুদ, দুটো বাড়তি চামড়ার কেট—রাতে গায়ে দিয়ে ঘুমোবার জন্যে দরকার হবে। ব্যাস। আর কী। এবার রওনা হলেই হয়।

নভেম্বর মাসের সেটা ছ তারিখ। দ্বীপে আসার ছ বছর পর। এই ছ বছর সময়কে আপনারা বলতে পারেন নির্বাসন বা বন্দীত্ব। আমি বলি আমার রাজ্য শাসনের ছ বছর। সে যাই হোক, ভেসে পড়লাম। দ্বীপ তো বড় নয় তেমন, ঘুরে দেখতে বেশি দিন লাগল না। পুর প্রান্ত ধরেই চলেছি। খানিকটা এগিয়ে দেখি দ্বীপের পাহাড়টা সিধে নেমে এসেছে সমুদ্রে, কিছুটা অংশ ভাসমান, কিছুটা জলে ডোবা। এগিয়ে গেছে অনেকটা দূর। তা প্রায় ক্রেশ খানেক তো বটেই। মাঝে খানিকটা আবার বালির চড়া মতো। তারপর ফের পাহাড়। বেশ উচু। তারই পায়ের নিচ দিয়ে চলে গেছে সমুদ্র। তখন সেই বালির চড়ায় নোঙ্গর ফেললাম।

নোঙ্গর অর্থে সত্যি সত্যি যেমনটি দেখা যায় সচরাচর তা নয়। লোহার একটা চাই। তার সঙ্গে ভারী কয়েকটুকরো পাথর বাঁধা। লোহাটুকু আমি জাহাজ থেকে নিয়ে এসেছিলাম। আর পাথর তো দ্বীপে কিছু কমতি নেই। দুয়ে মিলে নোঙ্গর।

তারপর বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম অঞ্চলটা ভালো ভাবে জরিপ করে দেখতে।

উঠলাম গিয়ে সেই পাহাড়ের মাথায়। দেখা যায় অনেক দূর অব্দি। পাহাড়ের এদিকে স্রোত প্রবল। চলেছে পুবের দিকে। অনেকক্ষণ ধরে স্রোতের গতি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করলাম। কেননা ফিরে যদি আসি এই পথ ধরে তবে এই স্রোতের টানে আমাকেও পড়তে হবে। সেক্ষেত্রে ডোঁগা বেতাল হয়ে সমুদ্রের দিকে চলে যাবার আশঙ্কা। দ্বীপে ফিরে আসা তখন মুশকিল। তবে বিস্তর হিসেব করে দেখলাম সমুদ্রের দিকে যাবার সম্ভাবনা কম। প্রথম স্রোতের ধাক্কায় যদিও বা খানিকটা চলে যাই। বাতাসে ঘূর্ণির টান আছে। তাতে ডোঁগা আমার ফের কূলের দিকেই ফিরে আসবে।

তবু দুদিন সেখানেই নোঙ্গর করে অপেক্ষা করতে হল। বাতাস উঠেছে। দক্ষিণ পূর্ব দিক থেকে ছুটে আসছে ঝড়ের বেগে। এ অবস্থায় ভেসে পড়ার ঝঝট অনেক। পারব না বাতাস কাটিয়ে পার হয়ে যেতে। এবং একটু বেচাল হলে সঙ্গে সঙ্গে ডোঁগা উলটে যাবারই সম্ভাবনা।

তিনি দিনের দিন দেখি শাস্ত ভাব। সমুদ্র প্রায় স্থির। নোঙ্গর তুলে রওনা দিলাম। বলব কি, দাঢ় বাইতে না বাইতে দেখি এক দমকে ডোঁগা চলে গেল অনেকটা দূর। জল সেখানে রীতিমতো গভীর। আমি তো থ। নির্ধার কোনো চোরা স্রোতের মুখে পড়েছি, তাকে এড়ানো আমার সাধ্যের বাইরে। হায় হায়, এখন উপায়! যত বাই দাঢ়, যত কূলের দিকে ফিরে আসার চেষ্টা করি—সব ব্যর্থ। পারি না এতটুকু এগোতে। বরং সরতে সরতে গভীর সমুদ্রের দিকেই এগিয়ে চলেছি। সে অবস্থায় আমার তো মৃত্যু অনিবার্য। হাজার হাজার

মাইল ব্যাপী সমুদ্র। জানি না কোথায় পাব কূলের রেখা। ডুবে মরার ভয় নেই। কেননা সমুদ্র দর্পণের মতো শান্ত। ভয় অনাহারে মরার। কি আছে আমার সঙ্গে খাদ্য! মাত্র কয়েকটা ঝটি, চাল ভাজা, এক কলসী জল আর একটা কাছিম। এটা সাম্প্রতিক সংযোজন। নোঙ্গর করে থাকা কালীন হাতের গোড়ায় পেয়ে তুলে নিয়েছি নৌকোয়। এমন একটা বড় নয়। এই সামান্য রসদ নিয়ে যদি ভেসে পড়ি তবে তাতে কদনি চলবে আমার।

তখন কী আক্ষেপ আমার! নিজের প্রতি নিজেরই কী প্রচণ্ড জ্ঞেধ! হায় হায় কত অবিবেচক আমি! সৈক্ষণ্যের দেওয়া সুখের আশ্রয়—আমি অবহেলা করে খুঁজতে চলেছিলাম নতুন দেশ। দেশই তো বলব, না কি দ্বীপ! সব রইল পিছনে পড়ে। আমার ঘর, বাড়ি, আমার চাষের জমি, গৃহ, গৃহপালিত পশ্চ—এখন সামনে শুধু অনিশ্চিত আর অজানা। দ্বীপটাকে আমি যে ভালবেসে ফেলে ছিলাম। ছ ছটা বছর যে কাটিয়েছি ওখানে। ঐ তো এখন আমার স্বদেশ। সব ফেলে কেন যে বেরিয়েছিলাম রাজ্য জয়ের আশায়। সৈক্ষণ্যের দানে অর্ধাং আমি সম্ভুষ্ট হতে পারি নি। ভিতরে ভিতরে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছিল অসন্তোষ। আমি পাপী। আমার তো শাস্তিই প্রাপ্য।

মোটমাট তখন আমি হাল ছেড়ে দিয়েছি। আর কী লাভ চেষ্টা করে। পাল, তখন গোটানো। খোলা থাকলে হয়ত আরো কত দূরে চলে যেতাম তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে তখন আমি হাত গুটিয়ে বসে আছি। বেলা তখন প্রায় দুপুর। মধ্য গগনে সূর্য। একটু একটু করে পশ্চিমের দিকে হেলতে শুরু করেছে। হঠাৎ বলব কী, যেন দক্ষিণ পুর দিক থেকে এক দমক বাতাস এসে আমার মুখে চোখে ঝাপটা মারল। আমি তো থ! একি সৈক্ষণ্যেরই অরেক করুণা! নাকি আমার মনের ভুল। তখন উঠে দাঢ়ালাম দেখি সত্যি সত্যিই হাওয়া। রীতিমতো জোরে জোরে বইতে শুরু করেছে। অমনি পাল খাটালাম। হাতে নিলাম দাঢ়। শেষ চেষ্টা এবার করতে হবে। যেমন করে পারি কূলে পৌছতেই হবে।

চলেছি পূর মুখো। স্বোত তেমন নেই, হাওয়াই ঠেলে নিয়ে চলেছে আমায়। খানিক দূর এগিয়ে দেখি পাহাড়ের একটা অংশ জলে প্রায় ডোবা। তার উপর দিয়ে তর তরিয়ে বয়ে চলেছে জলরাশি। বলতে গেল প্রচণ্ড বেগ সেই জলের। দুমুখে ভাগ হয়ে ভেঙে পড়েছে দুদিকে। একটা চলেছে দক্ষিণের দিকে। আরেকটা উত্তর মুখে। আর সেখানে ভীষণ ঘূর্ণি। ঘূরতে ঘূরতে প্রবল তোড়ে জল চলেছে এগিয়ে।

আমার অবস্থাটা একবার চিন্তা করুন। মই বেয়ে উঠছিল একটা মানুষ। সরে গেছে মহাটা পায়ের নিচ থেকে, অনিবার্য তার পতন এবং মৃত্যু—এহেন অবস্থায় সে আকস্মিক ভাবে রক্ষা পেল। কিংবা ধরন ডাকাতের হাতে পড়েছে একজন। খুন করবে তাকে তারা—সে যে কোনো কারণেই হোক, নিষ্ঠার পেল আমি যেন সেই রকমই একজন। কোন্ অজানা অনিশ্চিতের পানে একটু আগে চলেছিলাম ভাসতে ভাসতে, এখন ফিরে এলাম। আমার আর দুচিন্তার তেমন কোনো কারণ নেই। কী যে আনন্দ সেই মুহূর্তে! পাল তুলে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলেছে ডোঞ্চ। মদু মন্দ বাতাস। আর তর তরিয়ে এগিয়ে যাওয়া স্বোত। আমি কূলের দিকেই ফিরে চলেছি।

তবে যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম ঠিক সেই দিকে নয়। সেটা পূর্ব। চলেছি কোনাকুনি। প্রায় সেখান থেকে মাইল পাঁচক দূর দিয়ে। উত্তর মুখো। কূল এখনো অনেক দূর।

তবু চেষ্টার তো কামাই নেই। লক্ষ্য কিন্তু সেই পাহাড়ে ফিরে যাবার দিকে। দাঢ় বাইছি

সমানে। একটু পরে দেখি সব নির্বৎক। সাধ্যের বাইরে আমার। কূল থেকে এখন প্রায় ক্রোশ খানেক দূরে। অবাক কাণ। দুদিকে বয়ে চলেছে দুই ভিন্ন মুখী স্নোত। একটা দক্ষিণে একটা উত্তরে। মাঝখানে খানিকটা অঞ্চল স্নোতহীন। নিস্তরঙ্গ স্থির দর্পণের মতো। বইছে ঘনুমন্দ বায়ু। পালে লাগছে তার ঝাপট। দুহাতে টেনে চলেছি দাঢ়। ডোঙা সেই তরঙ্গহীন জলের উপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

বেলা তখন প্রায় চারটে। দেখি মাইলখানেক দূর যদিও তখন কূল, সেই পাহাড়ের একটা অংশ জলের নিচে ডোবা অবস্থায় এদিকেও এগিয়ে এসেছে। তার ধারে ধারে অসংখ্য ঘূর্ণি প্রবাহ। আর স্নোত। একটু এগিয়ে জলের উপর মাথা তোলা পাহাড়। ইঠতে ইঠতে সেখান থেকে স্বচ্ছন্দে ডাঙায় গিয়ে ওঠা যায়। ডোঙা এনে তারই গায়ে ভেড়ালাম। তারপর নেমে পড়লাম এক লাফে।

অমনি ইটু গেড়ে দৈর্ঘ্যের প্রার্থনা। এটা আমার প্রথম কাজ। তারই দয়ায় আমি জীবন ফিরে পেলাম। আমি ঘোর পাপী।—প্রভু আর কোনোদিন আমি এমন অপরাধ করব না। তোমার পরিত্র দান অগ্রহ্য করে হাত বাড়াব না অনিচ্ছিতের পানে। দয়া কর প্রভু, দয়া কর।

তারপর ডোঙাটাকে বেঁধে ফেললাম মন্ত্র একখণ্ড পাথরের সাথে। শরীর আর যেন বয় না। অসীম ক্লান্তি গেছে সারাদিন। এবার চাই বিশ্রাম। আর ঘুম।

ডোঙার মধ্যেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

উঠে দেখি সকাল। ব্যক্তিক করছে রোদ। আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই আছি। শুধু মনের গভীরে বাড়ি ফিরে যাবার একটা প্রচণ্ড তাগিদ। বাড়ি অর্ধে আমার সেই অস্তানা। কিন্তু যাব কীভাবে? আবার যে স্নোতের মুখে ভেসে পড়ব তাতে ভয়। ফের যদি যাই অজ্ঞানার দিকে ভেসে। যদি স্নোত ফের আমাকে টেনে নিয়ে যায়! হেঁটে কূলে গিয়ে ওঠার যৈ কথটা ভেবেছিলাম সম্ভব হবে, তাও দেখছি এখন আর সম্ভব নয়। এগিয়ে পাহাড়টা পুরোপুরি জলের নিচে। সেখানে ভীষণ স্নোত। এ অবস্থায় ডোঙা নিয়েই আমাকে যেতে হবে। সেটা একমাত্র পশ্চিম কূল ধরেই সম্ভব। কূলের ধারে ধারে বেয়ে যাব ডোঙা, তাতে জলের তোড়ে ভেসে যাবার কোনো আশঙ্কা নেই। যেতে হবে অবিশ্য বেশ খানিকটা দূর। তা হোক। তবু নিরাপদ তো।

এগোলাম সেই ভাবেই। পথে পড়ল একটা ছেট্ট নদীর মুখ। সেখানে গবগবিয়ে জল ঢুকছে ভিতর দিকে। পেরিয়ে গেলাম। দেখি ভারি চমৎকার একটা খাঁজ মতো। সেখানে টেউ মোটে নেই। ডোঙা স্বচ্ছন্দে রাখা যেতে পারে। যেন ছোটোখাটো একা পোতাশ্রয়। সেখানে ডোঙা ঢুকিয়ে বেঁধে রাখলাম। উঠলাম ডাঙায়। নিশ্চিন্ত এখন। ইঠতে ইঠতে চললাম বাড়ির দিকে।

রোদ ততক্ষণে চড়েছে। ভীষণ তাপ। ছাতি আর বন্দুক তো আমার সারাক্ষণের সঙ্গী। খুলে ফেললাম ছাতি। আরো খানিকটা এগিয়ে সামনে পড়ল সেই টঙ্গ। আমার নিরালা বিশ্রামের কুঞ্জ। যেমনটি ফেলে রেখে গিয়েছিলাম সেইরকমই আছে।। আর এমনই কাণ, দেখামাত্র এমন ক্লান্তি এসে ভিড় করল শরীরে, এমনই ঘুম ঘুম ভাব। সিড়ি বেয়ে উপরে উঠে গা ঢেলে দিলাম বিছানায়। তারপর ঘুম।

আচমকাই ভেঙে গেল ঘুম। বলব কী সে যা বিশ্যয় আমার, যা চমক! আমার অবস্থায় পড়লে জানি না আপনারাও কতটা অবাক হতেন। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি কে যেন ডাকছে আমার নাম ধরে—রবিন, রবিন কৃশ্ণা, তুমি কোথায়? কোথায় ছিলে এতদিন?

ରବିନ...

ସୁମେର ଯେଟୁକୁ ଚଟକ ଛିଲ ଶରୀରେ ମୁହଁରେ ତୋ ସବଇ ଉଧାଁଓ । ଆମି ଥ । କେ ଡାକେ ଏମନ କରେ ଆମାକେ ଏଖାନେ !—ରବିନ, ରବିନ ଜୁଣୋ, ତୁମି କୋଥାଯ ? କୋଥାଯ ଛିଲେ ଏତଦିନ ?... ସମାନେ ଡେକେ ଚଲେହେ ଆର ଏକଟୁ ଏକଟୁ କରେ ଜୟ ନିଜେ ଆମାର ମଧ୍ୟ ଭୟ । ଏ ଆବାର କୀ ଧରନେର ବିପଦ ରେ ବାପୁ ! କେ ଆବାର ଏଲ ଆମାର ସୁମେର ଘରେ ଆଶ୍ଵନ ଜ୍ଞାଲାତେ । ମୋଟମାଟ ହତବିହଳ ଆମି । ମେହି ଅବସ୍ଥାତେଇ ଘାଡ଼ ତୁଲେ ଚୁପି ଚୁପି ଉକି ଦିଲାମ । ଦେଖି ପୋଲ । ଆମାର ମେହି କାକାତୁଯା । ଆମାର ବିଛାନାର ସାମନେ ପାଯେର କାହେ ବସେ ଘାଡ଼ ତୁଲେ ସମାନେ ବଲେ ଯାଛେ ଏକଇ କଥା । ଆମାରଇ ଶେଖାନୋ ବୁଲି ସବ । ଆର ଗଲା ଘୁରିଯେ ଘୁରିଯେ ଆଡ଼ ଚୋଖେ ଆମାକେ ଦେଖଛେ ।

ତବୁ ଧାତସ୍ତ ହତେ ଅନେକଥାନି ସମୟ ଲାଗଲ । ମାନୁଷ ନୟ ଏ ଯେ ଆମାରଇ କାକାତୁଯା ଏଟା ଆମାର କାହେ ବିରାଟ ସାନ୍ତ୍ରନାର ବ୍ୟାପାର । କିନ୍ତୁ ଏଲ କୀ କରେ ଏତଥାନି ପଥ ? ଓର ତୋ ଥାକାର କଥା ଶୁହାରଇ ଆଶେ ପାଶେ । କେମନ କରେ ଖୁଜିତେ ଖୁଜିତେ ଏତଦୂର ଏଲ ! ପୋଲଇ ତୋ ନା ଅନ୍ୟ କୋନୋ କାକାତୁଯା ? ତଥନ ଡାକଲାମ ନାମ ଧରେ । କାହେ ଏଲ ; ଶୁଟି ଶୁଟି ଉଠେ ବସଲ ଆମାର ହାତେର ଉପର । ତଥନ ଫେର ମେହି ଡାକ—ରବିନ, ରବିନ ଜୁଣୋ, ତୁମି କୋଥାଯ ? କୋଥାଯ ଛିଲେ ଏତଦିନ ?

ତଥନ ବୁକେ ଜଡ଼ିଯେ ଧରେ ଧୁବ ଏକଚୋଟ ଆଦର କରଲାମ ।

ଫିରେ ଏଲାମ ବାଢ଼ିଲେ । କଦିନ ଧରେ କୋନୋ କାଜେଇ ମନ ବସାତେ ପାରି ନା । ଘୁରେ ଫିରେ କେବଳ ମନେ ପଡ଼େ ସମୁଦ୍ରାତ୍ମାର କଥା । ତାର ବିପଦ, ତାର ଆତମକ । ତୋଲପାଡ଼ କରେ ବେଡ଼ାଯ ତାଇ ସର୍ବଦା । ଆର ଏମନ କାଜ ଭୁଲେଓ ନୟ । ଭାବତେଓ ଶରୀର ଆମାର ହିମ ହୟେ ଆସେ । ହାତ ପା ଯେନ ଶୈଧିଯେ ଯାଯ ପେଟେର ଭିତର । ଏହି ସୁଖ ସ୍ମାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଝିଶ୍ଵରେର ଦେଉୟା ଏହି ଏତ କିଛୁ—ସବ ଛେଡ଼େ ଛୁଡ଼େ ଆମି ଅବୋଧ ଭେସେ ପଡ଼େଛିଲାମ କିନା ଅଜାନାର ଟାନେ । ଡୋଙ୍ଗଟା ପଡ଼େ ଆଛେ ଏଥିନୋ ଏକଇ ଅବସ୍ଥା । ଥାକ । ଆନାର କଥା ଭାବତେ ପାରଛି ନା । ଫେର ଯଦି ମେହି ଭାବେ ଭେସେ ଯାଇ । ଦରକାର କୀ ଆମାର ଆର ଡୋଙ୍ଗାଯ । ଏହି ତୋ ବେଶ ଆଛି ।

ଏକଟା ବଚର ବଲତେ ଗେଲେ ଠାୟ ବସା । ଚାକରି ଥେକେ ଅବସର ନିଯେ ଯେ ଭାବେ ମାନୁଷ କାଟିଆ ଦିନ । ଦୈନିନି ଖାଦ୍ୟ ଅବସରେ ଟିହଲଦାରୀ, ଫୁଲ ଫଲାବାର ପ୍ରୋଜନୀୟ କାଜ, ରାନ୍ଧାବାନ୍ମା —ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆମାର କାଜ । ଏର ବାଇରେ ବଲତେ ଗେଲେ କୋନୋ ପରିଶ୍ରମେର କାଜେଇ କରି ନା ।

ବସେ ବସେଇ କାଜେର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନିଯେ ଖୁଟଖୁଟ କରି । ଏଟା ଓଟା ବାନାବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ! ଦେଖି କଦିନେର ମଧ୍ୟେଇ ଦୁଟୋ ବ୍ୟାପାରେ ବେଶ ପାରଦଶୀ ହୟେ ଉଠେଛି । ଏକ ହଲ କାଠେର ଜିନିସ ତୈରିର କାଜ, ଆରେକଟା ମାଟିର ବାସନ ବାନାବାର କୌଶଳ ।

ଶାଟି ଦିଯେ ଏଥନ ଆମି ସବଇ ପ୍ରାୟ ବାନାତେ ପାରି । କୁମୋରେର ଚାକା ବାନିଯେ ନିଯେଛି ଏକଟା । କାଠ ଦିଯେ । ତାଇ ଘୁରିଯେ ଘୁରିଯେ ତୈରି କରି ଯାବତୀଯ ଜିନିସ । ଅନେକ ସୋଜା ଏଥନ କଲସୀ କି ଇାଡ଼ି କି ଅନ୍ୟ କିଛୁ ତୈରି କରା । ତାମାକ ଖାଓଯାର ଏକଟା ହୁକୋଓ ବାନିଯେଛି । ପାଇପ ଯାକେ ବଲେ । ତୈରି କରତେ ମେ ଯା ନାକାଳ । କିଛୁତେ ପାରି ନା ଗୋଛ କରେ ଆନତେ । ଶେଷେ ତୈରି ଯଥନ ହଲ ମେ ଯା ଆନନ୍ଦ ! ପୁଡ଼ିଯେ ନିଲାମ ଆଶ୍ଵନେ । ଆର ଚିନ୍ତା କିମେର । ଦିବିୟ ତାମାକ ପୂରେ ଖୋଶ ମେଜାଜେ ଟାନି । ତା ଏରକମ ପାଇପ ଜାହାଜେଓ ହିଲ ଅନେକଶଲୋ । ଇଚ୍ଛେ କରେଇ ଆନି ନି । ତଥନ ତୋ ଜାନତାମ ନା ଦ୍ଵୀପେ ଏତ ଅଜସ୍ର ତାମାକ ଗାଛ ଆଛେ । ମୋଟମାଟ ଏତଦିନ ପରେ ନେଶା କରାରେ ଏକଟା ଉପାୟ ହଲ ।

ଝୁଡ଼ି ବୋନାର କାଜେଓ ବେଶ ପାରଦଶୀତା ଅର୍ଜନ କରଲାମ । ଝୁଡ଼ି ତୋ ନିଜେର ଗରଜେଇ ବୁନ୍ତେ ହୟ । ଲାଗେ ଯେ କାଜେ । ଏଟା ରାଖା ଓଟା ରାଖା—ଦିନେ ଦିନେ ଜିଃସ ଯେ କ୍ରମଶହି ବାଡ଼ଛେ ।

বুনিও নানার আকৃতির। তাতে হাতল লাগাই। বয়ে নিয়ে যাবার যাবার তাতে সুবিধা হয়। ছাতি আর বন্দুক বাদে দৈনন্দিন টহলে আমার বেরোবার সময় এরকম একটা বুড়িও থাকে এখন আমার সঙ্গে। হয়ত ছাগল মারলাম একটা। তাকে অমনি শুলিয়ে ফেললাম কোনো গাছের ডালে। ছাল ছাড়লাম। মাস কেটে বুড়িতে রাখলাম। নিয়ে এলাম বাড়িতে। তাতে অতবড় গোটা ছাগলটা বয়ে নিয়ে আসার পরিশূল থেকে অব্যাহতি। কাহিম ধরলে আরো সুবিধে। গোটা কাহিমটা আর বাড়ি অঙ্গি বয়ে আনতে হয় না। কেটেকুঠে ডিম কটা বের করে নিই, সঙ্গে দু-এক টুকরো মাস। বাকিটা দিই ফেলে। বুড়িতে করে নিয়ে আসি। মোটামুটি খাটুনি আগের চেয়ে অনেক কম।

বাবুদ কিন্তু কমতে শুরু করেছে। কতদিন আর চলে। সব জিনিসেই শেষ বলে একটা কথা আছে। আর এ এমনই এক পদাৰ্থ। যা আমি দ্বীপে মাথা খুঁড়ে মরলেও পাব না। তখন উপায়! যদি বাবুদ না থাকে তবে কী করে মারব ছাগল? কী করে খাদ্য সংগ্ৰহ কৰব? অর্থাৎ বিকল্প ব্যবস্থা আমাকে ঠিক করে নিতে হচ্ছে। যদি এখন থেকেই শুরু কৰি পশুপালন। পশু খাবার বলতে যা বোঝায় আর কি। একটা দুটো নয়, চাই আমার অগণিত। অর্থাৎ ছেলে, তার ছেলে, তার ছেলে এইভাৱে ক্রমশ বৃক্ষ বৃক্ষ হবে। আমারও চিৰদিনের মতো সমস্যা মিটিবে।

এখানে আসার বছর তিনেকের মাথায় এরকম একটা প্রচেষ্টা নিয়েছিলাম। একটা বাচ্চা এনে পুৰেছিলাম। মাদী। দেখতে দেখতে চোখের সামনেই বেশ বড় সড় হয়ে উঠল। তা একটা মদ্দা যে চাই। নইলে বৃক্ষ বৃক্ষ যে হবে না। কিন্তু সে আর জোটানো সম্ভব হল না। আমারই চোখের সামনে সে বৃড়ি হল। কতবাৰ ভেবেছি লাভ কী একে বাঁচিয়ে রেখে, মেরে ফেললেই তো সব চুকে যায়। পারি নি মারতে। হাত আমার ওঠে নি। শত হলেও মায়া যে। শেষে এই গত বছর মৰল নিজে থেকেই।

অর্থাৎ ওভাৱে হবে না। নতুন পথ্য আবিষ্কাৱ কৱতে হবে। দেখতে দেখতে দশটা বছর পার হল। এগাৱ বছর চলেছে এখন। বাবুদ বলতে গেলে তলানিতে এসে চেকেছে। নতুন পথ আবিষ্কাৱ না কৱলে আমার সম্ভূত বিপদ। শেষে ভেবেচিস্তে ফাদ পাতৰ বলে ঠিক কৱলাম।

ফাদে ধৰা পড়লে সুবিধে এই জ্যান্তই পাব শিকাৱ। হাতে পায়ে একটু হয়ত চোট খাবে। সেটা এমন কিছু নয়। মোটমাট চাই আমার মাদী মদ্দা দুৱকমই ছাগল। তবন গৰ্ত খোঁড়া শুরু কৱলাম।

সে মন্ত বড় বড় গৰ্ত। ওৱা যেখানে ঘাস টাস খেতে আসে তাৰই আশেপাশে। উপৱে লতাপাতা দিয়ে বুজিয়ে দিলাম। যব গাছের ডগা ওদেৱ খুবই প্ৰিয় খাদ্য। দিলাম তাৰ কিছু বিছিয়ে। তা কদিনে দেখি গাছ টাছ সব উধাও। কখন এসে কায়দা কৰে খেয়ে গেছে। কিন্তু গৰ্তে পড়ে নি। তখন ধৈৰ্য ধৰে অপেক্ষা ছাড়া আৱ কী উপায় থাকতে পাৱে! শেষে ফল পাওয়া গেল। দেখি দুটো গৰ্তে ধৰা পড়েছে মোট চারটে ছাগল। একটা রাম পাঠা। সেটা পড়েছে একটা গৰ্তে। আৱেকটায় সৰ্বমোট তিনটে বাচ্চা। তাৰ মধ্যে দুটো মাদী আৱ একটা মদ্দা।

বাপৱে বাপ, গাঠামশাহেৱ সে কী তেজ! উঠতে তো পাৱে না, আমাকে উকি মারতে দেখে সে যা তৰ্জন গৰ্জন। শিং উচিয়ে পাৱলে যেন তখনি গুড়িয়ে পেট ফুটো কৰে দেয়। তা সব জাৱিজুৱি পারি আমি এক নিমেষে বঙ্গ কৰে দিতে। একটি মাত্ৰ শুলিই তাৰ জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু তা তো আমার মনোবাসনা নয়। আমি চাই জ্যান্ত ধৰে নিয়ে যেতে। কিন্তু

একে নিয়ে গিয়েই বা কী লাভ। যদি এই ভাবে আমাকে সদা সর্বদা আক্রমণ করার চেষ্টা করে, কী করে একে আমি পোষ মানব ! তখন ভিতরে খানিকটা ঘাটি ফেলে দিলাম। সেই ঘাটির উপর ভর দিয়ে উঠে গর্তের বাইরে বেরিয়ে সে যা দৌড় তার ! দিঘিদিক জ্ঞান শূন্য অবস্থা বলতে যা বোঝায়। বেদম ভয় পেয়ে গেছে। একটু পরে দেখি জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল।

চোর পালালে মানুষের যেমন বুদ্ধি বাড়ে, আমারও তখন ঠিক সেই অবস্থা। সে কী হা হৃতাশ আমার ! ধরা পড়ল ফাঁদে আর আমি ভালোমানুষ করে ছেড়ে দিলাম ! মানত না কি পোষ ! আলবাং মানত ! সিংহকে মানায না পোষ ! সে ক্ষেত্রে চারদিন স্বেফ তাকে কুটেটুকু না খেতে দিয়ে ঐ ভাবে গর্তে ফেলে রাখ। চারদিন পরে যখন ক্ষিধেয় তেষায় প্রাপ্ত যায় যায় হাল হবে তখন দিতে হবে খাবার। তা-ও পেট-পোরা নয়, একটুখানি ! সেই সাথে এক আঁজলা জল। এইভাবে দু চারদিন করলে, পোষ না মেনে উপায় কী !

দড়িদড়া বেঁধে তিনটে বাচ্চাকে টানতে টানতে বাড়িতে নিয়ে এলাম।

প্রথম প্রথম সে তো নাজেহাল অবস্থা আমার। যা দিই খেতে কিছুই খায় না। তখন



আমাকে উকি মারতে দেখে সে যা তর্জন গর্জন

বুদ্ধি করে কয়েক মুঠো যব ছড়িয়ে দিলাম। অমনি এগিয়ে এসে খেতে শুরু করল। মিটি যে খুব খেতে ! পোষ মানল একটু একটু করে। আমার তো মনে সর্বদা ভয়, পাছে জংলীদের দলে গিয়ে ভেড়ে। গেল না কেউ। ছেড়ে দিলেও দেখি নিশ্চন্তে তাঁবুর আশে পাশেই ঘুরে বেড়ায়। ধীরে ধীরে বড় সড় হল। তারপর আর কী—একের পর এক সন্তান প্রসব ! দেখতে দেখতে ছোটো খাটো খামার হয়ে উঠল আমার তাঁবু।

তখন প্রমাদ গলাম। আর তো এভাবে রাখা যায় না। এবার একটা পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করা দরকার। কোনোক্রমেই এদের জংলীগুলোর ধারে কাছে ভিজ্যে দেওয়া ঠিক হবে না। অর্ধাৎ প্রকৃত অর্থে আমাকে খামার বানাতে হবে। চারপাশে দেব বেড়া। তার জন্যে চাই মোটামুটি সমতল একখণ্ড জমি। সেখানে প্রচুর ঘাস ধাকবে। আর খোপবাড় জাতীয় বিস্তর গাছ। খাদ্য তো দিতে হবে নিয়মিত। প্রাকৃতিক খাদ্যের উপর যতটা নির্ভর করা যায় ততই মঙ্গল। আর ঘর তুলে দিতে হবে একধারে। রোদ বাড়লে সেই ঘরে গিয়ে

থাকবে।

আপনারা হয়ত ভাবছেন, এ আর এমন কী। সারা দ্বিপটি তো আমারই দখলে। যে কোনো একটা জ্ঞানগায় ওদের খামার করে দিলেই হল। কিন্তু সে যে কী বকমারি আমি বলে বোঝাতে পারব না। জমি বিস্তর অঙ্গীকার করি না। তাতে ঘাসও অচেল, আর আছে খোপ আর প্রয়োজনীয় জল সরবরাহের জন্যে ছেটো নালা। কিন্তু ঘর যে আমাকে বানাতে হবে। চারপাশে তুলতে হবে পাঁচিল। হাত তো মোটে দুখানা। যে হারে এদের সন্তান সন্ততি জন্মাতে শুরু করেছে তাতে দুইমাইল কেন, দশ মাইল এলাকা নিলেও আমার মনে হয় তবিষ্যতে জ্ঞান কম পড়বে। এবং এর চারদিকে ঘাটি গেঁথে পাঁচিল তোলা—এ কি এক দু দিনের কাজ।

অনেক ভেবেচিস্তে ঠিক করলাম বেশি বড় না করে দেড়শ গজ লম্বা একশ গজ চওড়া এক ফালি জমি আপাতত ঘিরে নেই। তাতে সবাই এটে যাবে। পরে যেমন যেমন বাড়ছে আমিও দেয়াল গাঁথতে গাঁথতে এগিয়ে যাব।

সময় লাগল মোট তিন মাস। তবু বলব কাজ আমার নিপুণ। স্বচ্ছন্দে ঘূর ফিরে বেড়ায় সবাই। ঘাসগাতা খায়। মাঝে মাঝে ছড়িয়ে দিই দু দশ মুঠো যব বা ধান। গলার দড়ি সবার খুলে দিয়েছি। সে যা অপূর্ব লাগে দেখতে। আমি যখন যবের ধূড়ি নিয়ে ভিতরে ঢুকি বাঁক বেঁধে আমার চতুর্দিকে এসে ভিড় করে। অবোধ শিশুর মতো ব্যা ব্যা করে ডেকে আমাকে খাবার দেবার আবেদন জানায়।

তা দুবছরে তিনজন থেকে বেড়ে হল তেতাল্প্রিশ জন। অর্থাৎ জীবিত এখন এরাই। মাঝে যে কত মেরে খেয়েছি তার তো সীমা সংখ্যা নেই। সব মিলে ষাট পঁয়ষষ্টি তো হবেই।

আরেক কাণ্ডও শুরু করেছি ইদানীং। এটা বলতে পারা যায় আমার খাদ্য সংক্রান্ত বিষয়ে নবতম সংযোজন। দুধ দোয়াই। সব মিলিয়ে গ্যালন দুই তো হয়েই। আমার একার তুলনায় বলা যায় অচেল। এত দুধ তো আর খাওয়া যায় না। তাই পনীর বানাই আর মাখন। সে মহা বকমারি প্রথম প্রথম। কিছুতে পারি না সঠিক জিনিসটি তৈরি করতে। নষ্ট হয়ে যায় সব। শেষে পারলাম। কাজ করতে করতেই যে শেষে মানুষ। আমার আর চিন্তা কীসের।

আর ঘুরে ফিরে মনে পড়ে ইস্বরের করুণার কথা। দুহাতে টেলে দিয়েছেন তিনি সব কিছু। এই বিশাল পথিকীর খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব তাঁর। চতুর্দিকে তাঁর নজর। চরম দুঃখকে তিনি করে তোলেন অনন্ত সুখ। নির্জনতার ঘণ্ট্যেও ঘুগিয়ে দেন বহু আনন্দ। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বক্ষ করেন ক্ষুধার্ত মানুষকে। এর কি কোনো তুলনা আছে!

থেতে যখন বসি, পরিবার পরিজন সমেত সে এক দেখবার মতো দৃশ্য। রাজা আমি, আমি সম্ভাট। এই বিশাল সাম্রাজ্য আমার পদতলে। এখনকার যাবতীয় জীবের জন্ম মৃত্যু আমার করায়ত। তা বলে কাউকে আমি অসুবী বা অত্যন্ত করে রাখি নি। মুক্তভাবে বিচরণের অধিকার দিয়েছি। আমার রাজ্য সর্বদা শান্তি বিরাজমান। প্রজায় প্রজায় কখনো কোনো বৈরীভাব খবর আমার কানে আসে নি।

খাবার সময় সেটা বলতে গেলে চোখের গোড়াতেই প্রত্যক্ষ করি। পোল আমার সবচেয়ে প্রিয়। সে আমার টেবিলের একধারে বসে থাকে। বেশির ভাগ দিনই আমার ভান দিকে। যেন প্রভূর খাদ্যাখাদ্য তদারকের দায়িত্ব তারই। পায়ের কাছে বসে থাকে আমার কুকুর। বুড়ো হয়েছে ইদানীং, গায়ের লোম প্রায় সবই উঠে গেছে। ওর বংশ বৃদ্ধি হয় এমন

কোনো জীব আমি সারা দীপে খুঁজে পাই নি। আর থাকে দুটো বিড়াল। টোবলের দু ধারে দুজন। সবাইকে কিছু না কিছু খেতে দিই। এটা তাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকার বাইরে উপরি পাওনা। সকলেই যথেষ্ট সন্তোষ বোধ করে।

বিড়াল দুটোর ব্যাপারে কিছু বলে নিই এই ফাঁকে। জাহাজ থেকে নিয়ে এসেছিলাম যাদের তারা এই দুজন নয়। তাদের মতু হয়েছে। তাবুর অনতিদূরে আমি নিজের হাতে তাদের সমাধিস্থ করেছি। এরা তাদেরই বৎশধর। দীপে বিড়াল আছে সেকথা আগেই বলেছি। প্রথম দিকে অবস্থা এমনই দাঢ়াল, পিলপিল করে পঙ্গপালের মতো বাড়তে লাগল বিড়ালের সংখ্যা। আমি তো খালাপালা প্রায়। শেষে কটাকে তাড়িয়ে দিতে বাধ্য হলাম। যায় কি আর তাতে! দেখি রাখে এসে এটা ওটা খাবার চুরি করে নিয়ে যায়। শেষে মারলাম কটাকে গুলি করে। তাতে ভয় পেয়ে বাকিরা পালিয়ে গেল। পরে দেখি এই দুটো এসে ফের ঠাই নিয়েছে। তা এদের আমি আর তাড়াবার চেষ্টা করি নি।

বলতে গেলে আছি বেশ, তবু ঐ যে বলে এক ছটফটানি আমার। ভিতরে ভিতরে অশাস্তি ভাব। মন যে কিছুতেই ধিতু হতে চায় না। ডোঙটার কথা বারবার মনে পড়ে। তাইত, অত কষ্ট করে অত খেটেখুটে বানালাম —সে কি অমনি ফেলে রাখার জন্যে! তা-ও অত দূরে। ইচ্ছে হয় যাই একবার পাহাড়ের মাথায়। দেখি কেমন চলছে স্নোত, কী তার গতি প্রকৃতি। স্নোত সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলে ডোঙা স্বচ্ছন্দে ধারে কাছে এনে বৈধে রাখা যাবে। তাতে কোথাও যাই কি না যাই এই মুহূর্তে সেটা বড় কথা নয়, অস্তত চোখের গোড়ায় তো রইল জিনিসটা। পরে সময় সুযোগ বুঝে খানিকটা বেড়িয়ে আসতেও পারব।

অনেক দিন ধরে যাব কি যাব না, যাব কি যাব না করতে করতে শেষে একদিন মরিয়ার মতো বেরিয়ে পড়লাম। বলা বাহুল্য পদব্রজে। যাব অনেকটা পথ পেরিয়ে পাহাড়ের মাথায়। সে যা সাজ পোশাক আমার! পোশাকের যা বাহার! মাঝে মাঝে নিজেই তো নিজেকে আমি জরিপ করি আয়নায় বা নদীর স্বচ্ছ জলে। হাসি পায়। মনে মনে ভাবি, যদি এই চেহারায় এই পোশাকে ইয়র্কশায়ারের রাস্তা দিয়ে আমি ইটতাম তবে কী দ্রশ্যই না হত! ভিড় জমে যেত আমার পিছনে। সব ফিলিয়ে বর্ণনাটা এই রকম।

মাথায় আমার পেঞ্চাই এক টুপি। ছাগলের চামড়া দিয়ে তৈরি। তার অন্তু চেহারা। পিছনে আবার ঝুল ঝুল করে মন্ত এক ফালি চামড়া। সেটা দিয়ে আমি পিঠ ঢেকে রাখি। রোদ তো খুব। তাছাড়া বৃষ্টিরও কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। যখন তখন ঝরবার করে খানিকটা ঝরিয়ে দিলেই হল। আমার আবার বৃষ্টি একদম সহ্য হয় না। শরীর খারাপ হয়।

গায়েও ছাগলের চামড়া দিয়ে তৈরি একটা জ্যাকেট। তার প্রায় ইটু অদি ঝুল। আর পরনে ঘোড়সওয়ারের যেমন চুন্ত পাঁচলুন থাকে, আমারও ঠিক তাই। সেটাও ছাগলের চামড়া দিয়ে তৈরি। উপরে তার লোম। লোমশ পাঁচলুন। সে এক বিস্ময় বটে। মোজাতোজার বালাই নেই। জুতোও নেই। অর্থাৎ জুতো অর্থে আপনারা যা বোবেন সেরকম কিছু নয়। চামড়া দিয়ে তৈরি একটা আচাদনী মতো। তাতে দুটো পা-ই চাকা পড়ে। মোটমাট আমার টুপি বা জ্যাকেট বা পাঁচলুন—সব কিছুর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই জুতো জোড়া তৈরী।

কোমরে বেশ্টও আছে। ভাববেন না সেটা আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। ছাগলের চামড়া দিয়ে তৈরি। একটু চওড়া। তাকে কটি-বন্ধনী হিসেবেই আমি ব্যবহার করি। পূরনো দিনের রাজা রাজড়া বা যোদ্ধারা যেমন করত। তবে হ্যাঁ, তাদের কটি-বন্ধনীতে ঝোলানো থাকত তলোয়ার, আমারটায় থাকে কুড়ুল আর একখানা করাত। দুটো দুদিকে। আরো একটা

বেল্ট আছে। সেটা কম চওড়া। গলায় পরা থাকে। তাতে কোলানো থাকে আমার পাইপ  
আমার তামাক এবং আর এক ধারে একটা খাপে বাবুদ। পিঠে থাকে ছোট্ট একটা ঝুড়ি।  
সেটাও এই বেল্টের সঙ্গে বাঁধা। তাতে থাকে আমার বন্দুক। ছাতিটা বাঁধা থাকে আর  
একদিকে। তার এফনই কায়দা, হাওয়া বাতাস তেমন জোরদার না থাকলে সাধারণ ভাবে  
তাকে খুলে রাখা যায়। আমার আলাদা করে হাত দিয়ে ধরবার প্রয়োজন পড়ে না। নতুন  
করে ছাতির বর্ণনা এখানে আর দিলাম না। আগেই বলেছি একবার। গায়ের রঞ্জের কথা  
একটু বলি। বিশেষ করে মুখের রঞ্জ। সে ভারি বিচিত্র। মা কালো আর বাপ ফর্সা হল তার  
ছেলেমেয়ের সচরাচর যে রঞ্জ হয়, না কালো না সাদা—দুয়ের অস্তুত সম্বৰ্য। আর হবে  
না কেন, ন ডিগ্রী দ্রাঘিমা রেখায় অবস্থিত আমার রাঙ্গ্য। রোদ তো এখানে কাউকে ছেড়ে  
কথা বলবে না। আর তেমনই দাঢ়ির ঘটা। বাড়তে বাড়তে একবার প্রায় ফুট খানেক  
হয়েছিল। প্রথম দিকে খেয়াল করি নি। পরে খেয়াল হতে আমি তো থ। অমনি কাঁচি আর  
ক্ষুর নিয়ে বসে গেলাম। জাহাজ থেকে এনেছিলাম সাথে করে। তা তেমন তো অভ্যেস  
নেই। হল আধ খ্যাচড়া কিন্তু কিমাকার ক্ষেত্রী। চিবুকের কাছে খানিকটা রইল, আর  
মোচটা আমি ইচ্ছে করেই কামলাম না, কিছুটা ছেঁটে রেখে দিলাম। অনেকটা তুর্কিদের  
মতো। চিবুকের কাছের অংশটা ক্রমশ বাড়ছে। বাড়ুক, তাতে আমার কোনো চিন্তা নেই।  
আরো খানিকটা বাড়লে নয় ওতে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখব আমার টুপি। আর সেই অবস্থায়  
যদি গিয়ে পড়ি ইংল্যান্ডের কোনো অঞ্চলে তবে ঘটানাটা কী দাঢ়াবে আমি ভেবেও কোনো  
কূল পাই না।

তবে এখানে বেপরোয়া। কীসের চিন্তা আমার! কে-ই বা আসবে দেখতে! আমার  
যেমন ইচ্ছে তেমন করব, যেমন ইচ্ছে নিজেকে সাজাব। আমি কি কারুর ধার ধারি না কি  
বলবে তাই নিয়ে এতটুকু লজ্জা পাই! এ তো আমারই সাম্রাজ্য। একপাল জীবজন্তু পারি  
আমার প্রজা। কোনো প্রজা রই এমন সাহস নেই যে রাজাকে নিয়ে ব্যস করে, মজা করে।

চলেছি এই পোশাকে নিজেকে সাজিয়ে ইঁটতে ইঁটতে। অনেক দূরের পথ। পাঁচ ছ দিন  
তো এরই মধ্যে বলতে গেল পার হয়ে গেল। গোড়ায় সমুদ্রের ধার দিয়ে হেঁটেছি। লক্ষ্য  
সেই খেয়ানে ডোঁড়া বেঁধে রেখে গিয়েছিলাম সেই জায়গাটা। কাছেই সেই জলে ডোবা  
পাহাড়। এক অংশ তার উচু। তা পৌছে দেখি, জল ডিঙিয়ে সেই পাহাড়ের টঙে গিয়ে  
চড়বার আর দরকার নেই। কাছে পিঠে জমি বেশ উচু। বলতে গেল পাহাড়ের মাথারই  
প্রায় সমান সমান। উঠলাম সেখানে। সবই নজরে পড়ছে। এই তো আমার ডোঁড়। আর ঐ  
সেই বিপজ্জনক এলাকা। সেই মহামারী স্মৃত সেখানে কেবল ঘূরপাক খায় আর নিজের  
ইচ্ছের বিরুদ্ধে নৌকো পাঠিয়ে দেয় দূর সমুদ্রের পানে। এখন সবই শাস্ত। এ এক আশ্চর্য  
ব্যাপার। নেই কোনো স্মৃত, কি ঘূর্ণি, কি হাওয়া। যেন শাস্ত একফালি দর্পণ। এখনি গিয়ে  
ডোঞ্চয় উঠে বসতে ভারি ইচ্ছে হচ্ছে।

দমিয়ে রাখলাম ইচ্ছে। আরো পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন আছে। এখানে দু একদিন  
থাকতে হবে। দেখতে হবে সবকিছু। সেই ভাবেই মন ঠিক করলাম। দেখি চমকদার সব  
ব্যাপার। স্মৃত যা আসে সব পশ্চিম দিক থেকে। গিয়ে মেশে এক নদীর সঙ্গে। নদীটা  
বিশাল। হাওয়ার গতিও পশ্চিম থেকে উত্তর মুখী। সব মিলে ধাক্কা খায় সেই পাহাড়ের  
গায়ে। তখন ওঠে বিপরীত মুখী স্মৃত। তারই দমকে নৌকো যায় দূর সাগরের দিকে  
ভেসে। সঙ্গে অঙ্গি বসে বসে এই সবই দেখলাম। বাতাস আর স্মৃতের মরণ খেলা শুরু  
হয় বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে। সঙ্গে লাগতে সব আবার শাস্ত। তখন বাতাসের তাড়না

নেই। প্রোতঙ্গীন নির্মল নিষ্ঠুরস জল। এবং এটাই আমার পক্ষে ডোঙা নিয়ে ভেসে পড়ার উপযুক্ত সময়।

পরের দিনও একই ঘটনা পর্যবেক্ষণ করলাম। নিপুণ মাঝি হতে গেলে স্বোত্ত তো চিনতেই হবে। মনের দিক থেকে আমি এবার আমার সিদ্ধান্তে স্থির নিশ্চিত। কিন্তু ভয় যে খুব। যখনই ভাবি যাই, এবার গিয়ে ডোঙায় উঠে বসি—অমনি ভয়ে সারা শরীর সিটিয়ে আসে। সেই বিপদের কথা মনে হয়। কাঁটা দেয় প্রতিটি লোম কূপে। কিছুতে আর পা উঠতে চায় না। যদি ফের হয় সেই একই অবস্থা! তখন অনেক ভেবেচিস্তে নতুন এক সিদ্ধান্ত নিলাম। ধাক এটা এখানে যেমন আছে। আমি বরং আরেকটা ডোঙা বানিয়ে নেব।

কিন্তু বানাব বললেই তো আর হয় না, তার জন্যে সময় দরকার। অত সময় আমি পাই কোথায়! আমার যে এখন অগাধ কাজ। যেমন ধূমুন, দু দুটো ক্ষেত্র আমার। একটা গুহার কাছে। গায়ে গায়ে লাগানো বলা যায়। গুহাও তো আর সে গুহা নেই। তাকে বড়



তো চলেছি এই পোশাকে নিজেকে সাজিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে করেছি। একটার পর একটা ঘর এখন গুহার ভিতর। ঢুকবার বেরবার দু দুটো দরজা। একটা ঘর তার মধ্যে সবচেয়ে শুকনো। সেখানে আমি দরকারী সব জিনিস রাখি। যেমন বীজ এবং শস্য। অগুণতি ঝূঁড়িতে থেরে থেরে সাজানো শুধু ধান আর যবের দানা। এগুলো নষ্ট হবার বা পচে যাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। প্রয়োজন মতো দৈনন্দিন খাদ্য শস্য আমি ঐ ঘর থেকেই নিয়ে আসি।

ক্ষেত্রের ব্যাপারে যা বলছিলাম। সে ভারি চমৎকার এখন। সব কিছুই সুশৃঙ্খল। বেড়া দিয়েছিলাম চারপাশে গাছের ডাল দিয়ে। কিছু কিছু তার মধ্যে গুল্ম জাতীয় গাছ। সেগুলো এখন বেশ বড় বড় হয়েছে। সে আবরণ ভেদ করে বাইরের কোনো জীবের ভিতরে ঢোকার সম্ভাবনা নেই। নিজের ইচ্ছেমতো জমিতে চাষ করি। যে বছর কম শস্য পাই, তার পরের বছর প্রয়োজন মতো খানিকটা জমি বাড়িয়ে নিই। তাতে আগের বছরের ঘাটতি পূরণ হয়ে যায়।

আর একটা ক্ষেত্র একটু দূরে। আমার সেই টঙ্গের কাছে। এটাকে আমি বলি

বাগানবাড়ি। ক্ষেত্র এখানে প্রধানত ফলের। আঙুরই বেশি। প্রয়োজন মতো শাস্যের চাষও হয়। তবে সে কদাচিৎ। গাছ গাছালিতে ঘেরা সে এক অপরূপ শাস্তির পীঠস্থান। সব গাছই এখন বেশ বিশাল বিশাল হয়ে উঠেছে। ডালপাতায় মাচার ঘর এখন চারধারে ঢাকা। আর যা মিটি ছায়া! সিডি বেয়ে উঠে বিছানায় গা ঢেলে দিতে পারলে সে এক স্বগীয় শাস্তি। একটা আরাম কেদারাও বানিয়েছি। ছাগলের চামড়া আর লোম দিয়ে। বসলে শরীর প্রায় আধখানা ডুবে যায়। মাঝে মাঝে সেখানে বসে দূরে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিতে বড় অপূর্ব লাগে।

এরই লাগোয়া আমার পশ্চ খামার। হয়ত একটু বাড়িয়ে বলা হল, কেননা অত বিচ্ছ্র ধরনের পশ্চ আমার নেই। না গরু না মোষ। থাকার মধ্যে শুধু একপাল ছাগল। চারধারে মাটির দেয়াল। তুলতে আমাকে রীতিমতো পরিশৃম করতে হয়েছে। বাইরে থেকে দু একটা চুকলে বরং আমার লাভ, কিন্তু বেরিয়ে গেলে যৈ ক্ষতি। কেমন করে সে ক্ষতি আমি পূরণ করব! তাই তো দেয়াল। তাই তো অঙ্কুষ্ণ পরিশৃম। দেয়ালের বাইরে আবার শুল্ক জাতীয় গাছের টানা বেড়া। তাতে সুরক্ষার ব্যাপারটা জেরদারই হয়েছে বলা যায়। আরেকটা বৃষ্টির মাত্র অপেক্ষা। ঘোপগুলো বেড়ে এমন হবে যে আমি চির নিশ্চিন্ত হতে পারব।

অর্থাৎ আপনি যে বলবেন আমি কুড়ে, আমি শুয়ে বসে দিন কাটাই, ঘোটেও তা নয়। রীতিমতো খাটতে হয় আমাকে। যাকে বলে গাধার খাটুনি! পশুপালন থেকে শুরু করে তাদের দুধ দোওয়া, সেই দুধে ছানা পনীর মাখন তৈরি, তারা যাতে বেঁচে বর্তে সুস্থ শরীরে বহাল থাকে সেদিকে নজর রাখা—এ কি চান্তিখানি কাজ!

কতদিন থাকতে হবে এখানে তার তো কোনো ঠিক নেই। সে বিশ বছর হতে পারে, চাহিশ বছরও হতে পারে। চাহিশ এই কারণে বলছি—কেননা ঘোটামুটি ধরে নিয়েছি আমার আশু খুব বেশি হলে আর চাহিশ বছর। সেই সময় সীমার জন্যে প্রয়োজনীয় রসদের সরবরাহ আমাকে তো অব্যাহত রাখতেই হবে। এছাড়া আর উপায় কী!

আঙুরের চাষটাও উল্লেখের দাবী রাখে। বলতে বিধা নেই আমি অন্য সব চাষের চেয়ে এদিকে একটু বেশি নজর দিয়ে থাকি। কিসমিস আমার অতি প্রিয় খাদ্য। মুখরোচক তো বটেই, শরীরে বল সঞ্চয়ের প্রয়োজনেও এর অবদান কম নয়। দৈনন্দিন খাদ্য তালিকার মধ্যে কিসমিস আমার বিলাসের পর্যায়ে পড়ে।

এই সব কাজের সঙ্গে বর্তমানে যুক্ত হয়েছে নতুন আরেকটি কাজ। প্রায়ই একবার করে ডোঁঙাটা গিয়ে দেখে আসা। আছে যে সেই অবস্থায় এটাই আমার কাছে সাম্রাজ্য, এমন নয় যে সব মালপত্র আমি ডোঁঙা থেকে নিয়ে এসেছি বা নিয়ে আসার কোনোরকম ইচ্ছে আমার আছে। ডোঁঙা নিয়ে ফের ভেসে পড়ার সঙ্কল্প বর্তমানে ত্যাগই করেছি। অবশ্য ভয়টাও একটু একটু করে মন থেকে মুছে যেতে শুরু করেছে। দীপের কোনো ব্যাপারেই ইদানীং আমি আর ভয় পাই না। এমনকি ভূমিকম্প হলে ফের যে পাথর পাহাড়ের মাথা থেকে গড়িয়ে নামতে পারে তা নিয়েও বিন্দুমাত্র চিন্তিত বা ভীত আমি নই। এখন জীবনের ধারা আমার সম্পূর্ণ পালটে গেছে। এটা আমি নিজেও স্পষ্ট টের পাই।

জানি না হয়ত এই গতিতেই চলত আমার জীবন। এই যেমন গড়িয়ে গড়িয়ে চলা, হয়ত এই নিয়েই আমি বেঁচে থাকতাম। কোনো ব্যতয় হত না কোনোখানে। এতটুকু বিভ্রান্তি বা অস্বস্তি বোধ করতাম না। যদি না ভারি অস্তুত ভারি অবাক একটা ঘটনা ঘটত।

ঘটনাটা তবে গোড়া থেকেই বলি।

একদিন দুপুরবেলা। আমি চলেছি ডোঁঙা দেখতে। যেমন মাঝে মাঝে যাই। হঠাৎ দেখি

কুলের কাছে বালিয়াড়ির উপর মানুষের পায়ের ছাপ। একটা নয়, অনেকগুলো। আমি তো থ। হঠাত সামনে বাজ পড়লে মানুষ যেরকম চমকে যায়, অবাক হয়, আমি ঠিক তাই। মানুষ ! তার পায়ের ছাপ ! আমি ভুল দেখছি না তো চোখে। চকিতে চারদিকে চোখ বোলালাম। কই কেউ তো নেই আশে পাশে ! এগিয়ে গেলাম। মানুষের অবস্থিতির অন্য কোনো নজিরও নেই। আবার দেখলাম ছাপগুলো। না, অন্য কারো নয়, মানুষেরই। গোড়ালি, পায়ের চেটো, আঙুল সব নিপুণভাবে কেটে বসেছে বালির উপর। কিন্তু এখানে এ ছাপ কেমন করে এল ! বুকে তখন রীতিমতো ঝড় বইতে শুরু করেছে। টিপচিপুনির শব্দ বাইরে থেকে শুনতে পাচ্ছি। ত্রস্ত শক্তি ভয়ার্ত আমার চোখমুখ। কত কীই না ভাবলাম ! যেন ছবির মতো এক একটা চিঞ্চ। মনে উদয় দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে যায় আবার শূন্যে বিলীন হয়ে। তবু ভয় মোটে কমে না। সে যা অবস্থা ! এক পা দু পা করে আমি আতঙ্কে অঘনি পিছু হটতে শুরু করেছি। তারপর তো ছুট। সব অগ্রাহ্য করে জঙ্গল গাছপালা ভেদ করে শুধু দৌড় আর দৌড়। আর মাঝে মধ্যেই থমকে পড়ি। পিছন দিকে দেখি। কেউ ভাড়া করছে না তো ! যেতে যেতে প্রতিটি ঝোপবাড়ি তন্ম তন্ম করে বুজি। আমার জন্যে কেউ ওজ পেতে নেই তো ! ভয়। আর আতঙ্ক। আর ত্রাস। আমি বলতে গেলে দিঘিদিক জ্ঞান শূন্য।

বাড়িতে ঢুকে স্বত্ত্বির নিষ্পাস ফেললাম। কীভাবে ঢুকেছিলাম ভিতরে সে আর এখন মনে নেই। মই বেঞ্চে উঠেছিলাম না কি এক লাফে দেয়াল ডিঙিয়ে পড়েছিলাম এধারে—কিছুই এখন আর সুরণ করতে পারি না। শুধু এটুকু মনে আছে ভীষণ ভয় আমার আঞ্চেপ্লাঞ্চে। তাড়া খাওয়া হরিপুরের মতো অবস্থা। কিংবা ভীতু খরগোশের মতো। যে কোনো ভাবে চাইছি নিজেকে আড়াল করতে। সেই ভয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে।

তবুও কি ভয় কাটে ! ভয়ের ধর্মই যে এই। ঢুকল একবার মনে তো সহসা যাবে না। সারারাত আমি নির্ধূম। চোখের পাতা ঘেটে পারি না এক করতে। কেবলই ঘুরে ফিরে পায়ের ছাপ কটা মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। আর নানারকম কল্পনা করতে শুরু করি। আজ্ঞা, কে ঐ পায়ের অধিকারী ? কী করে সে এখানে এল ? কেনই বা এল ? সে কি নরখাদক ? জানতে পেরেছে কোনোভাবে আমি এখানে আছি ? এখনো কি লুকিয়ে আছে এই দ্বীপে ? কোথায় ? আমি দেখা পেলাম না কেন ? তবে কি মানুষ নয় সে, আত্মা ? কোনো পিশাচ বা ঐ জাতীয় কিছু ? পিশাচেরা শুনি যে কোনো মৃত্যুতে যে কোনো রকম আকার ধারণ করতে পারে। তবে কি আমাকে তার উপস্থিতি সম্বন্ধে সজাগ করার জন্যেই রেখে গেল পায়ের ছাপ ? জানে আমি ঐখান দিয়ে ডোঁড়া দেখতে যাই। তাই কি বিশেষ করে ওখানকার বালিতেই ছাপ রেখে যাওয়া ! কিন্তু জল বাড়লে ঐ ছাপ তো মুছে যেতেও পারত। কিংবা হাওয়া উঠলে বালি যেত উড়ে। ছাপ তচনছ হয়ে যেত। সেক্ষেত্রে এটা শয়তানের অভিসন্ধিমূলক প্রচেষ্টা বলে ভাবতে অসুবিধে হয়। তবে কার ছাপ ! সত্যি সত্যি কি কোনো মানুষের ?

এরকম রাশি রাশি অগুণতি চিঞ্চা। অনগ্রল। ভাবতে তো আর কোনো বাধা হয় না। শুরু করলে প্রোত্তের মতো একের পর এক ভাবনা আসতে শুরু করে। শেষ হয় অজ্ঞাত অপরিচিত কোনো মানুষে। সেই বর্ষৱ মানুষ। নরখাদক। থাকে ঐ ওধারের দ্বীপে। আমি যেখানে যাব বলে ডোঁড়ায় চেপে রওনা দিয়েছিলাম। কিন্তু অতখানি পথ পার হয়ে এখানে এসে ওঠা তো চাট্টিখানি কথা নয়। পারল কীভাবে। মিশ্যাই বাতাসের গতি প্রকৃতি আমার চেয়ে অনেক ভালো বোঝে। সমুদ্রও চেনে আমার চেয়ে ভালো। তাই পেরেছে স্বচ্ছন্দে চলে

আসতে। আমি পারি নি।

তবে পারি নি যে সেটা আমার পক্ষে মঙ্গল। এখন বুঝতে পারি। সে-ও ইশ্বরেই দয়া। গেলে শুদ্ধের হাতে পড়ে আর কি রক্ষা থাকত! সে সন্তাননা এখনো কম। কেননা ওরা যদি আমার হৃদিশ পেয়ে থাকে, তবে ফের আসবে। ডোঙাটা হয়ত দেখতে পেয়েছে। সেক্ষেত্রে এর পর আর একলা একজন আসবে না, আসবে দলবল সমেত। আমাকে ধরে নিয়ে যাবে। তারপর বলি। আমার জীবন শেষ। আমার ক্ষেত্র দেবে ধৰণ্স করে। আমার ছাগল নিয়ে যাবে। যদি সে অবস্থায় কোনোভাবে আমি আত্মরক্ষা করতেও পারি, তবে তা-ও মরারই দাখিল। থাকবে না ফসল, থাকবে না ছাগলের পাল—আমি কি খেয়ে কীভাবে বেঁচে থাকব!

অবাক কাণ্ড, ভয়ের তাড়ায় মন থেকে মুছে গেল আমার ধর্মচিন্তা। ইশ্বরে আর কোনো আস্থাই যেন নেই। এই যে, এত কিছু দিয়েছেন তিনি আমায়—জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলবার জন্যে নানানভাবে সাহায্য করেছেন—কেবলই মনে হয়, আর বোধহয় এসব রক্ষা করতে পারব না। আমার পক্ষে তো সম্ভব নয়ই, হয়ত ইশ্বরের পক্ষেও না। আর ধিক্কার জন্মায় মনে অন্বরত। নিজের উপর। জীবনটাকে এতদিন সহজ সরল ভাবেই নিয়েছি। তার মধ্যে যে জটিলতা আসতে পারে, আসতে পারে নানান দুঃখ, কখনো বারেকের জন্যে ভুল করেও ভাবি নি। তবে কি আর যেটুকু দরকার শুধু সেটুকু শস্য চাষ করতাম! জমিয়ে রাখতাম গোলা ভরা ধান, বসে তাই বেতাম। আমাকে আর এই ভয়ের মধ্যে তাহলে অমর্চিন্তায় বাহিরে বেরতে হত না কিংবা না খেয়ে মরতেও হত না।

অস্তুত ব্যাপার—মানুষের জীবনের এই আশ্চর্য গতিপ্রকৃতি। দেখি আর বারে বারে নতুন করে অবাক হই। আজ যা মানুষ ভালবাসে কাল তাকেই দেয় দুপায়ে ঠেলে। আজ্ঞ যা চায় কাল তাকেও করে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান। নিজেকে দিয়েই তো সব মিলিয়ে নিতে পারছি। সত্য জগৎকে এখন আমি সত্যি সত্যি ভয় পাই। অর্থাৎ এই আমি—যখন প্রথম এলাম এই দ্বীপে, চারপাশে অগাধ জলরাশি আর ঘন অরণ্য—আমি ভীষণ একা—কী বিশ্রীহ না লাগত! নির্জনতা কী প্রচণ্ড ভাবে আচ্ছেপ্তে আকড়ে ধরত আমায় আর এতদিন পর,—মানুষের পায়ের ছাপ দেখে আমি চমকে উঠি। ভয়ে আতঙ্কে হাত পা সৌধিয়ে যায় বুকের ভিতর। জ্যান্ত মানুষ তো দূরের কথা, জানি না হয় তো তার ছায়া দেখলেও আমি সন্ত্বাসে স্থবির হয়ে যাব।

সে যে কত চিন্তা মনের গভীরে, কত জ্ঞপনা কল্পনা! বিশ্বয়ের প্রথম ধাক্কাটা ততদিন সামলে উঠতে পেরেছি। তবু ইশ্বরে বিশ্বাস আর কোনো ভাবেই আসে না। আসবে কী করে, আমি যে শেষের প্রহর গুনতে শুরু করেছি ততক্ষণে। আর কি নিষ্ঠার আছে আমার! এই তো শেষ। এ-ও এক ধরনের শাস্তি। ইশ্বরের দেওয়া দানে পারি নি সম্ভুষ্ট হতে। অপরাধ করেছি। আগ বাড়িয়ে দেখতে গিয়েছিলাম নতুন সাম্রাজ্য। এ তারই প্রতিফল। যিনি দেন, তারই তো আছে শাস্তি দানের অধিকার। এ শাস্তি আমাকে মাথা পেতে গ্রহণ করতে হবে।

পরক্ষণেই নতুন এক চিন্তা উদয় হল মনে। তাইত, শাস্তি পাব নয় ধরেই নিলাম, নয় মৃত্যুই হবে তার শেষ পরিপতি। কিন্তু তাই বলে এখন থেকে জীবনের সব আশা ভরসা ত্যাগ করব, এ তো হয় না। তাহলে তো জীবন যাবে স্থবির হয়ে। আশাহীন ভাবে কি বেঁচে থাকা যায়। আমার কাজ হবে দৈনন্দিন অভ্যাসের মধ্য দিয়ে দিনযাপন করা। ইশ্বরের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা। তারই মধ্য দিয়ে আগামীতে যে পরিণতি

আসে তিলে তিলে সেই দিকে এগিয়ে যাওয়া।

এই চিন্তাই তোলপাড় করে তুলু মন। দিনের পর দিন মাসের পর মাস শয়নে স্বপনে জাগরণে আমার এই একই চিন্তা। ভাবতে ভাবতে হঠাৎই একদিন সকাল বেলা—বিদ্যুৎচমকের মতো মনে ভেসে উঠল বাইবেলের সেই অনবদ্য নির্দেশ—বিপদের দিনে আমায় সুবৃশ করো, আমি তোমার আতা, তুমি গৌরোবর্ষিত করবে আমাকে।

বলব কী, যেন এক বলক মিঠে বাতাস, অপরূপ তার আমেজ, অনবদ্য তার স্নিগ্ধতা। হৃদয় মন যেন জুড়িয়ে দিল আমার। আমি বিছানা ছেড়ে এক লাফে উঠে বসলাম। আহ, শান্তি! শরীরে যেন অস্তুত এক ক্ষমতা পাচ্ছি। অমনি তড়িত্বিত্বি প্রার্থনায় বসলাম। —হে বিধাতা, আমায় ক্ষমা কর। আমি পাপী। আমি অপরাধী। বাইবেল খুললাম। চোখে পড়ল সেই আশ্চর্য নির্দেশ : ঈশ্বরে আস্থা স্থাপন কর। হৃদয় প্রফুল্ল কর। তোমার মনে তিনিই যোগাবেন শক্তি। ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ। .... সে যে কী শান্তি কী সান্ত্বনা আমি ভাবায় প্রকাশ করতে পারব না। সব প্রশ্নের জবাব আমি পেয়ে গেছি। আমার মনে আর কোনো জিজ্ঞাসা নেই। বই নামিয়ে রাখলাখ। হৃদয় যেন আনন্দে ভরে উঠেছে।

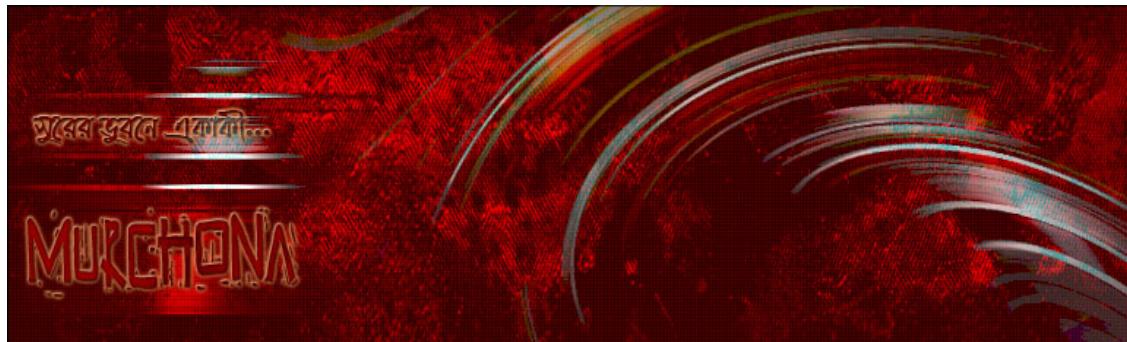
পাঠক, বুঝতে পারছেন, নতুন উদ্যমে নতুন উৎসাহে আমি আবার শুরু করেছি আমার জীবনযাত্রা। সব আবার আগের মতো। পায়ের ছাপের একটা যুক্তিও নিজের মনে ছাড়া করেছি। হয়ত আমারই পায়ের ছাপ। সেই যেদিন ডোঙায় চেপে গিয়েছিলাম সেদিনই হয়ত পড়েছে বালির উপর। বাকিগুলো গেছে জলের ঝাপটে মুছে। কোনোভাবে কয়েকটা হয়ত রক্ষা পেয়েছে। ভেবে অব্দি সে কী আনন্দ আমার! কোনো পালটা যুক্তিই আর মনে স্থান পায় না। নিজেকে নিজেই করি উপহাস। নিজেকে বোকা ঠাওরাই। বোকা ছাড়া আর কী! নইলে এমন তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে এত জল ঘোলা করি।

মোটমাট সাহস আমার একটু একটু করে ফিরে আসছে। একটু একটু করে আমি আবার বাড়ির সীমানা ছেড়ে বেরতে শুরু করেছি। তিন দিন তিন রাত তো বলতে গেলে বিছানা ছেড়ে না গঠা। এদিকে ঘরে ব্যবারের টান। থাকার মধ্যে আছে শুধু একটু জল আর কটা যবের মশু বিশেষ। দুধ নেই। তিনদিন ধরে দোয়াই না এক ফেঁটা, থাকবে কীভাবে! আর সে বেচারিদেরও তো কষ্টের সীমা পরিসীমা নেই। নির্ধার প্রচণ্ড যেদনা হচ্ছে বাঁটে। বলা যায় না, হয়ত কারো কারো দুধ এর মধ্যে শুকিয়েও গেছে।

তখন বেরলাম চৌহানি ছেড়ে। দেয়াল ডিঙিয়ে ফের নামলাম এধারে। নতুন লাগছে সব কিছু। গেলাম হাঁটতে হাঁটতে আমার বাগান বাড়িতে। তারই পাশে কিনা ছাগলের খোঘাড়। দুধ দোয়ালাম। তয় কিন্তু একেবারে কাটে নি। হাঁটি কয়েক পা, বারবার পিছন ফিরে তাকাই। আসছে না তো কেউ পিছন পিছন! কোথাও নেই তো লুকিয়ে চুরিয়ে! পাতা পড়ার শব্দ হলে অব্দি চমকে উঠি। দু একবার তো দুধের বালতি ফেলে পালাব কি পালাব না সে চিন্তাও এল। মোটমাট আতঙ্কের ভাবটা এখনো পুরোপুরি যায় নি।

তবে দু চার দিন চলাফেরা করতে করতে সাহস আরো খনিকটা বাড়ল। কোনো কিছুই যে চোখে পড়ে না। আমার যাবৎ জল্পনা কল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়। তখন সাহস করে একদিন সেই ছাপটা যেখানে দেখেছিলাম সেখানে গেলাম। নিজের পা ফেলে মাপলাম সেই ছাপ। মিলল না। আমার চেয়ে বেশ বড় সেই পা। দ্বিতীয়ত অনেক ভাবনা চিন্তা করেও আমি যে ডোঙা নিয়ে ঐখানে গিয়েছিলাম, এটা কিছুতেই যুক্তি বুক্তি দিয়ে মেলাতে পারলাম না। তাহলে! বুকটা অমনি থর থর করে কেঁপে উঠল। মেরুদণ্ড বেয়ে বয়ে গেল একটা শীতল স্নোত। সে যে কী তয় কী আতঙ্ক! দিঘুদিক জ্বান শূন্য হয়ে ছুটালাম আমি

# Robinson Crusoe by Danial Difo



For More Books & Music Visit [www.MurchOna.com](http://www.MurchOna.com)

MurchOna Forum : <http://www.murchona.com/forum>

Suman\_ahm@yahoo.com

suman\_ahm@walla.com

s4suman@yahoo.com